

মূল্যায়ন

মূল্য

মূল্যায়ন

মূল্যায়ন

* সোভিয়েত
নর্জোয়া
আন্দোলনে
চেতনার ব
* আচার্য
দুই বিপ্লব

~~নবম্ব, ১৯৫৮ ; ১৯৫৬~~
~~নবম্ব ; ১৯৫৪~~
~~নবম্ব, ১৯৫৮ ; ১৯৫৫~~

গাতীয়
প্রমিক
নারী
সংগে
দুগের

নবম্ব

১৩৯৩

দাম : পাঁচ টাকা

মূল্যায়ন

বর্ষ ২২

নববর্ষ

১৩৯৩

- সূচী	পৃষ্ঠা
ভারতে শ্রমিক আন্দোলনে বিপ্লবী সচেতনতার সমস্যা/গোবিন্দ কাঁড়ার	১
মাস্তজাতিজ্ঞ ক্ষেত্রে নারী চেতনার ক্রমজাগরণ ও তার বিকাশ/আর্য্যাত গঙ্গোপাধ্যায়	১৬
সোমদত্তগবংগীতা ও আদি যুগের দুই বিপ্লবী/জীবন মন্থোপাধ্যায়	৩০
‘বালটোল’ স্টাডিজ’ প্রসংগে/দীপিকা বসু	৪৩
‘চাষ’ চিবেন্দীর শিক্ষা চিন্তা/দীপিকা মজুমদার	৫০
ভারতে শ্রমিক আন্দোলন ও চিত্তরঞ্জন/অশোক মন্ডল	৬২
সাতীশ ব্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক/নরহরি কবিরাজ	৬৭
গাড়িয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নতুন কর্মসূচী : আন্তর্জাতিক তাৎপর্য/রণধীর দাশগুপ্ত	৭৭
শুভক পরিচয়	৯৮

সম্পাদক : নরহরি কবিরাজ

উপদেষ্টামণ্ডলী :

সত্যেন্দ্রনারায়ণ ঘোষদাস, সুনীল জানা,

নির্মলা বাগচী, রণধীর দাশগুপ্ত

প্রবন্ধ : সুবোধ দাশগুপ্ত

সমীক্ষা প্রকাশনীর পক্ষে রণধীর দাশগুপ্ত কর্তৃক কালাত্তর প্রেস,

৩০/৬ কাউন্সিল রোড, কলিকাতা—১৭ হইতে মুদ্রিত ও

১০ বন্ডেল রোড, কলিকাতা—১৯ থেকে প্রকাশিত ।

নিবন্ধাবলী গ্রাহক সংক্রান্ত

নববর্ষ সংখ্যা পাঁচ টাকা
শারদীয় সংখ্যা দশ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা
বক্তরের যে-কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়
ডাক খরচ আমাদের ।

এজেন্সী সংক্রান্ত

কমপক্ষে ৫ কপি নিতে হবে ।
কমিশনের হার শতকরা ২৫ টাকা ।
পত্রিকা ভি, পি, তে পাঠানো হয় ।
ডাক খরচ আমাদের ।

যোগাযোগ করুন :

কর্মাধ্যক্ষ

মুন্সীপাল কার্যালয়

১০, ব্রডল রোড

কলিকাতা-১১

জাতীয় সংহিতিকে সুদৃঢ় করুন

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সম্মান আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য। বর্তমান ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে এই চিরায়ত সম্মান এক নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। বিভিন্ন ভাষা, জাতি এবং বিবিধ সংস্কৃতির মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির কন্ধনকে দৃঢ়তর করাই আজকের সবচেয়ে বড় কাজ। দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মৌলনীতিকে রক্ষা করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের সকলকেই সচেতন হতে হবে।

কমতার অভিকেন্দ্রীকরণের প্রবণতা যাতে বৃদ্ধি না পায় তার জন্য সতর্ক থাকতে হবে আমাদেরই। আসুন সবাই এক হয়ে আমরা দেশের একতা ও সংহিতিকে সুদৃঢ় করার কাজে রত হই।

২৬ জানুয়ারি, ১৯৮৬

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই, সি, এ, ১০৮৫/৮৬

মূল্যায়ন পত্রিকার আলিকানা ও অন্যান্য বিবরণী
(৪ নং ফর্ম)

১। প্রকাশ স্থান—১০, বন্ডেল রোড, কলিকাতা-১৯

২। প্রকাশের সময়—ত্রৈমাসিক

৩। মূল্য—রংঘীর দাশগুপ্ত

জাতীয়তা—ভারতীয়

ঠিকানা—১০, বন্ডেল রোড, কলিকাতা-১৯

৪। প্রকাশক—রংঘীর দাশগুপ্ত

জাতীয়তা—ভারতীয়

ঠিকানা—১০, বন্ডেল রোড, কলিকাতা-১৯

৫। সম্পাদক—নরহরি কবিরাজ

জাতীয়তা—ভারতীয়

ঠিকানা—১০, বন্ডেল রোড, কলিকাতা-১৯

৬। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—সমীক্ষা প্রকাশনী

ঠিকানা—১০, বন্ডেল রোড, কলিকাতা-১৯

আমি, রংঘীর দাশগুপ্ত, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিলিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তার ১০/৪/৮৬

রংঘীর দাশগুপ্ত
প্রকাশক

॥ আপনার পারিবারিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন ॥

পরিবারের প্রত্যেকটি বিবাহ অবশ্যই রেজিস্ট্রী করান দরকার। কারণ, অধুনা বাস্তবিক জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিবাহের প্রমাণপত্র একান্ত প্রয়োজন।

আপনাকে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন কিভাবে সাহায্য করিতে পারে তাহা দেখুন :—

- ১) বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির দিনে রেজিস্ট্রী বিবাহে খরচ অতি সামান্য।
- ২) ইহা জঘন্য পণ-প্রথা নিবারণে সাহায্য করে।
- ৩) সম্পত্তি সংক্রান্ত বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য দাবী নিষ্পত্তিকরণে বিবাহ সার্টিফিকেট এক অতি মূল্যবান দলিল।
- ৪) খোরপোশের দাবী, দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষতিপূরণের টাকা, ব্যাংক, ইন্সিওরেন্স, প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভৃতি গ্যারান্টি সূত্রে প্রাপ্য টাকা ভোলায় ব্যাপারে বিবাহ সার্টিফিকেট আপনার বিশেষ প্রয়োজন।
- ৫) পান্ডাপোর্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়।
- ৬) বহুবিবাহ এক নিষিদ্ধ-বিবাহের মত প্রাচীন সামাজিক কু-প্রথা দূরীকরণে রেজিস্ট্রী বিবাহের গুরুত্ব অপরিহার্য।
- ৭) রেজিস্ট্রী বিবাহ দাম্পত্য জীবনের অধিক নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়।

এ ব্যাপারে বিশদ বিবরণের জন্য নিকটস্থ সাবরেজিস্ট্রী অফিসে অথবা কলিকাতার মহাকরণের ৫ নং ব্লকের নীচতলার, রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ বার্ষিক ডেফেন্স এ্যান্ড ম্যারেজিসের অফিসে যোগাযোগ করুন।

!

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

আই, সি, এ, ১৩৮৭/৮৬

পরিবারের প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু অবশ্যই নিবন্ধভুক্ত করান

ব্যবহারিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই জন্ম বা মৃত্যুর প্রমাণপত্র একান্ত প্রয়োজন।

- ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তির সময়, চাকুরীর দরখাস্তের জন্য, পাশপোর্ট করাবার ক্ষেত্রে, জীবনবীমা করার জন্য জন্মের প্রমাণপত্র লাগবেই।
- ঠিক তেমনি বীমা ও পেনসন সংক্রান্ত গোলযোগের নিষ্পত্তি ঘটাতে কিংবা সম্পত্তিঘটিত দাবীর নিষ্পত্তির জন্য মৃত্যুর তারিখ ও প্রকৃতি সঠিকভাবে প্রতিপন্ন করতে মৃত্যুর প্রমাণপত্র আবশ্যিক।
- প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু নিকটবর্তী রেজিস্ট্রেশান কেন্দ্রে জানাতে হবে।
- শহর হলে পুরসভা বা কর্পোরেশন অফিস এবং গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা মুর্যাল পাবলিক হেলথ সার্কেলে জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্ত করাতে পারেন। শহরে জন্মের সাত দিন ও মৃত্যুর তিন দিনের মধ্যে, গ্রামাঞ্চলে জন্মের চৌদ্দ দিন ও মৃত্যুর সাত দিনের মধ্যে তা নিবন্ধভুক্ত করা আবশ্যিক।
- সময়মত নিবন্ধভুক্ত করালে সার্টিফিকেটের একটি কপি বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।
- মনে রাখবেন পরিবারের প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধভুক্ত করা বাধ্যতামূলক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই, সি, এ, ১০৪৬/৮৬

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনে বিপ্লবী সচেতনতার সমস্যা

—গোবিন্দ বাঁড়ার

মাক্স এঙ্গেল্‌স্‌ লেখিতেনর ঐতিহাসিক শিক্ষা

“অদ্বাৰ্ধ মানবসমাজের সকল ইতিহাস হলো শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস,” শোধক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর অবিরাম সংগ্রামের ইতিহাস। আজ থেকে ১০৭ বছর পূর্বে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মানবসমাজের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস চর্চা করে কার্ল মাক্স ও ফ্রিড্‌রিক এঙ্গেল্‌স্‌ ‘কমিউনিষ্ট ইন্ডাহায়ে’ একথা লিখে যান। দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে সূর্য্য করে আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজেও এই শ্রেণী সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে। আর এই শ্রেণী সংগ্রামের অন্তর্নিহিত মূল কারণ হচ্ছে প্রচলিত সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ও পদ্ধতি। উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে বন্ধ। উৎপাদিকা শক্তির স্বাভাবিক ও ক্রমান্বয় বিকাশে এই বন্ধও তীব্র থেকে তীব্রতম হয়ে ওঠে। উৎপাদিকা শক্তি পুরান চালু উৎপাদন সম্পর্কে ভেঙ্গে এগিয়ে যায়, নতুন উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠে, নতুন এক সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থায় গুণগত এই পরিবর্তনকেই বলা হয় সমাজ বিপ্লব। যুগে যুগে এভাবেই এক একটি সমাজের মৌলিক গুণগত পরিবর্তন হয়ে আসছে। আর এই গুণগত পরিবর্তন ঘটে ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে। কোন মানুষের বা শ্রেণীর ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর এটা নির্ভরশীল নয়। বাস্তব পরিস্থিতি ও স্বাভাবিক গতি ও প্রক্রিয়ার এটা ঘট। সমাজ বিকাশের এই ধারাটি হলো মাক্স ও এঙ্গেল্‌স্‌দের এক অনবদ্য আবিষ্কার।

মাক্স ও এঙ্গেল্‌স্‌ দুনিয়ার শোষিত, নিৰ্ব্বাচিত, শ্রমজীবী মানুষের জন্য আরেকটি অমূল্য উপহার দিয়ে যান। তাঁদের সমগ্র চিন্তা ও কার্যক্রমে সম্পূর্ণ এক নতুন বিষয় উত্থাপন করেন যা এর পূর্বে কোন দার্শনিক বা মানবপ্রেমীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মাক্স ও এঙ্গেল্‌স্‌ শৃঙ্খলায় প্রাচীন ইতিহাস ও সমকালীন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেই ছেড়ে দেননি, সমাজকে বদলাবার সক্রিয় কৃমিকা গ্রহণের আহ্বান দিয়ে যান ও তার পথ নির্দেশও করেন। বিশেষ করে

সমকালীন দেন্তান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থায় শোষণের চরম নমুনা চিত্র তুলে ধরে দেখান শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলার এক শক্তিশালী উপাদান এই সমাজই তৈরী হয়। ক্রমাগত শিল্প ও কলকরখানা বেড়ে যাওয়ার সাথে পুঞ্জীকৃতি ও বৃদ্ধোঁরা শ্রেণীর যেমন ক্রমান্বয়ে শ্রীবর্ধিত হতে থাকে, তেমনি এই সমাজে নতুন এক শ্রেণী সংখ্যাগত ও গুণগতভাবে অনিবার্যভাবে বাড়তে থাকে। এই নতুন শ্রেণী হল শ্রমিক শ্রেণী। সমাজে নিঃস্ব মানুষের ক্রমাগত সংখ্যাবর্ধিত ও চরম সৈন্যের সুযোগ নিয়ে, উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানা কব্জা করে বৃদ্ধোঁরা শোষণকণ্ঠ দিনের পর দিন মানুষের শ্রমশক্তিকে বাজারের পুণ্য পরিণত করে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের কাছে থেকে উদ্ধৃত শ্রমের উদ্ধৃত মূল্য তৈরী করে। আর এই উদ্ধৃত মূল্যের সবটুকু ব্যক্তি মালিক বৃদ্ধোঁরা শোষণ আত্মসাৎ করতে করতে মুনাকার পাহাড় তৈরী করে। এই শোষণের শেষ কোথায়? “কমিউনিষ্ট ইচ্ছাহারা” এর জবাব আছে। “অতএব এইভাবে বৃদ্ধোঁরা শ্রেণী তার নিজের কবর খননকারী তৈরী করে। এর পতন ও সর্বহারার শ্রেণীর বিজয় সমানভাবেই অনিবার্য।”

মানব সমাজের বিকাশের দ্বারায় শোষণ শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর সংগ্রাম চলে এসেছে, সমাজবদলও হয়েছে, কিন্তু শোষণের অবসান হয়নি, কিন্তু বর্তমান দেন্তান্ত্রিক সমাজে এমন এক নতুন শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছে, যে শ্রেণী মানবসমাজের এই ‘চিরন্তন’ শোষণের অবসান করবে। সেই শ্রেণী হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী। এই শ্রেণীই অন্য যেকোন শ্রেণীর চেয়ে প্রত্যক্ষ শোষিত, একই স্থলে বা শিল্পে সংগঠিত; অন্য যেকোন শ্রেণীর তুলনায় অনিবার্য বাস্তব কারণে অধিকতর লক্ষ্যলা পরামর্শ, অধিকতর সচেতন ও অগ্রগামী চিন্তাসম্পন্ন। একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই পারে শোষণ, অন্যায়, অত্যাচার ও নিষাভনের বিরুদ্ধে সমাজের অন্যান্য নিষাভিত্ত, উৎপাদিত শ্রেণীর মানুষকে নেতৃত্ব দিতে। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সত্ত্রায়ে বর্তমানে শ্রমিকশ্রেণী হোল মূল চালিকা শক্তি।

কার্ল মার্ক্স ও এঙ্গেলসের এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও শিক্ষাই হলো বর্তমান যুগের বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীদের কাছে আসল পাথর। রুশ সোভিয়েট কমরেড লেনিন এই পাথর অবলম্বন করে অত্যন্ত দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও নিরলসভাবে সংগ্রাম করে যান সফলভাবে ও দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষকে উপহার দেন “নতুন যুগের বিপ্লব।” দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করলেন এক শোষণহীন সমাজ। মার্ক্স ও এঙ্গেলসের তত্ত্ব ও শিক্ষাগুলি বাস্তবে রূপায়িত করে সফল হয়েছে। জিতেন্দ্র রায়চৌধুরী এক জটিল মতামত বাক্য সোজা বিশ্লেষণ

পরিদৃষ্টান্তে সমাজ বিজ্ঞানের মানবীয় তত্ত্ব ও শিক্ষাকে যথাযথ ও সঠিক প্রয়োগের অসামান্য পারদর্শিতা দেখান কমরেড লেনিন। তাই বাস্তব ক্ষেত্রে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও কমরেড লেনিনের শিক্ষাগুলি আজকের দিনের বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীদের কাছে বিশেষ উপযোগী। শব্দমাঠ 'কি করিতে হইবে' নিবন্ধটি নয়। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ধর্মঘট সংগ্রাম, লক্‌ আউট প্রভৃতি ঘটনাবলীর উপর কমরেড লেনিনের অসংখ্য নিবন্ধ ও বক্তৃতা রয়েছে। এইগুলি একত্রে সংকলন করে মস্কো থেকে 'অন্ ট্রেড ইউনিয়নস্' নামক একটি পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে। শব্দমাঠ তত্ত্বের পান্ডিত্য কচকচানি নয়, শ্রমিক জীবনের দৈনন্দিন বহুবিধ ও সাধারণ সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা, আন্দোলনের বাস্তব রূপরেখা রচনা ও তার প্রয়োগ মাধ্যমে শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে যাওয়া। অন্যদিকে সাথে সাথে ক্রমাগত শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক ও আদর্শগত শিক্ষার কাজ চালায়ে যাওয়া। এর কোনটিকে অগ্রহেলা করলে চলবেনা। শব্দমাঠ প্রথম কাজটি করলে বা তার উপর বিশেষ জোর দিলে তা হবে নিছক অর্থনীতিবাদ, 'বুটিশ' ট্রেড ইউনিয়নবাদ। আর শব্দ শেষের কাজটি করলে শ্রমিকদের ব্যাপক অংশকে ঐক্যবদ্ধ ও সমবেত করা যাবে না সংগ্রামের ক্ষয়নানে। তা হবে নিছক পান্ডিত্যপন্থা। এই দুটি কাজ একই সাথে করে যেতে না পারলে শ্রমিকশ্রেণী ছড়াও মূর্খি অর্জনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেনা। মার্ক্স, এঙ্গেলস্, লেনিনের এটাই মূল শিক্ষা ও নির্দেশ বলা যেতে পারে।

বিপ্লবী ও সংস্কারবাদী শ্রমিক আন্দোলন :

উৎপাদনের উপায়গুলির ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রেখে, মধ্যবৃগের সামন্ততান্ত্রিক ও বর্তমান দৈনিক উৎপাদন ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণী সাময়িক কিছু অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করতে পারলেও আখেরে শ্রমিকের মূর্তি হবে না। জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতাও আমাদের এই শিক্ষাই প্রতিনিয়ত দিচ্ছে। গ্রেট ব্রিটেনের শ্রমিকরা বহুদিন পূর্বে থেকেই অনেক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করে আসছে। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে সেদেশে সর্বপ্রথম ট্রেড ইউনিয়ন স্বীকৃতির আইন চালু হয়। সারা ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি উন্নত দৈনিক দেশে শব্দ নয়, আমাদের মত সম্প্রতি মূর্তিপ্ৰাপ্ত 'আধা উন্নত' দৈনিক দেশেও শ্রমিক শ্রেণী অনেক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করেছে। এর দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর মূর্তিতো হয়নি, বরং শোষণ

তীব্রতম হচ্ছে, বেকারি, দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে, অর্জিত সুবিধাগুলি ধ্বংস করা হচ্ছে, কাজের নিরাপত্তা বিপন্ন হচ্ছে। তাই মার্ক্স, এঙ্গেলস্, লেনিনের শিক্ষা ও ভবিষ্যদ্বাণী শৃঙ্খল নয়, বাস্তব জীবনের ঘটনাবলী প্রমাণ করে দিচ্ছে নিম্নতর অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক স্ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলনের দ্বারা। তা সে যতই ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হোক না কেন, প্রাথমিক শ্রেণীর চূড়ান্ত মূল্য অর্জন হয়না, হবে না।

একথা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে বর্তমান দুনিয়ার ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সামগ্রিক ভাবে শ্রেণী হিসাবে বুজোরি শ্রেণীর আর কার্যকর ফলপ্রসূ ভূমিকা থাকছে না। বিশাল ক্রমশক্তিমান উৎপাদিকা শক্তিকে সামান্য দেওয়ার ক্ষমতা শ্রেণী হিসাবে সে হারিয়ে ফেলেছে। এঙ্গেলসের ভাষায়, 'বুজোরি শ্রেণী একটি নিঃপ্রয়োজনীয় শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে' (মার্ক্স, এঙ্গেলস্ সিলেক্টেড্ ওরক্স্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪২)। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে সামগ্রিকভাবে শ্রেণী হিসাবে বুজোরি শ্রেণী সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে, বিংশ শতাব্দীর শেষপর্বে বুজোরি শ্রেণীর সে-ভূমিকা আর থাকতে পারে না। বিশ্বের কোন কোন পশ্চাদপদ দেশে যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থার এখনও আদিম, ক্ষুদ্র উৎপাদন পদ্ধতি চালু আছে, সেসব দেশের ক্ষেত্রে সামগ্রিক কিছু ব্যতিক্রম হলেও সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বুজোরি শ্রেণী চালিকার ভূমিকা নিতে পারে না। বিংশ শতাব্দীতে 'মরণোন্মুখ পুঞ্জিবাদের পতনের যুগে' বুজোরি শ্রেণী সম্পর্কে এতদুই মোহ থাকলে প্রথমিক আন্দোলনের মারাত্মক ক্ষতি হতে বাধ্য। প্রথমিক শ্রেণীর একটাই লক্ষ্য সর্বহারার বিপ্লব সম্পাদন করে ক্ষমতা দখল করা, সামাজিক বিরোধগুলির অবসান করা, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে পথ করে দেওয়া, সমাজের সামগ্রিক প্রগতি ও বহুলানকে সুনিশ্চিত করা। এটাই হোল কৈম্যানিক সমাজবাদ। এঙ্গেলসের ভাষায়, "চিরন্তন যুদ্ধের এই কাজটি সম্পাদন করাই হলো আধুনিক সর্বহারার শ্রেণীর ঐতিহাসিক লক্ষ্য" (ঐ, পৃঃ ১৪২)।

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বাভাবিক ও অনিবার্যভাবেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অদ্ভুতপূর্ব অগ্রগতির সৌন্দর্যে উৎপাদিকা শক্তি যখন বর্তমান উৎপাদন সম্পর্ক ভেঙ্গে প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে যেতে চাইছে, প্রথমিক শ্রেণীও যখন বিশ্বের এক তৃতীয়াংশে রাষ্ট্রক্ষমতা কল্পা করে সমাজবাদ কার্যে করেছে, সংখ্যার ও গুণগতভাবে অনেক শক্তিশালী শ্রেণী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, তখন উন্নত

ও আধা উন্নত দেশের বহুজাতিক সংস্থার সংগঠিত ও তাদের সহায়তায় বৃহৎ ও একচেটিয়া ব্যুজোরী শ্রেণী পুঁজির উৎপাদন ব্যবস্থা বজায় রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কোটি কোটি মানুষকে দারিদ্র্য ও বেকারির চরমতম দুঃসহ অবস্থার মধ্যে রেখে সমাজের অগ্রগতিতে পেছনে টেনে রাখার মরিয়া চেষ্টা করছে। ওদের দিন যে ফুরিয়ে আসছে, লোনিদের ভবিষ্যৎশ্রী ওরা 'প্রাঞ্জ দেয়ালে স্পষ্ট অঁকারে' দেখতে পাচ্ছে। তাই তো রোগন, খ্যাচারদের পারমানবিক, নক্ষত্র বৃক্ষের এই বেপরোয়া আরোহণ। সমগ্র মানবজাতি ও এতদিনে গড়া সভ্যতাকে একনিমেষে ধ্বংসের এই ভয়াবহ জঘন্যতম ষড়যন্ত্র। সোভিয়েট ইউনিয়নের ও দলমত নির্বিশেষে বিশ্বমানবের আবেদনও তাই আজ ওদের এতটুকু স্পর্শ করে না। এই পরিস্থিতিতে মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকেই সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে বৃক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিরক্ষার সংগ্রামে। প্রতিটি মুহূর্তে অন্য সকল কাজ ও সংগ্রামের সাথে এর জন্য নির্দিষ্ট কাজগুলি করে যেতেই হবে। এক্ষেত্রে সামান্য অকস্মিক মারাত্মক ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এ এক জটিল সংকট পূর্ণ মুহূর্ত।

এরূপ জটিল সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণী আসল মৌলিক বিষয়টি একমুহূর্ত ভুলতে পারে না। এই সংকট সৃষ্টির জন্য দায়ী যারা, যতদিন তারা এই সমাজে অবস্থান করবে, সমাজের রাষ্ট্রকর্মতার তারা টিকে থাকবে, ততদিন এই সংকট তীব্র থেকে তীব্রতম হবে। ধ্বংসাত্মক বৃক্ষের আশঙ্কা ও বিভীষিকা বজায় থাকবে, একঘাটিও তো সত্য। শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিতে এবিষয়টিও যদি না থাকে শ্রেণী হিসাবে সে কি তার 'ঐতিহাসিক কর্তব্য' পালন করবে?

সমাজ বিকাশের বর্তমান দারায় প্রধান ঝন্ড হচ্ছে : সাম্রাজ্যবাদ বনাম সমাজতন্ত্র। এই ঝন্ডের অবসান হবে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস ও সমাজতন্ত্রের উত্থান বা অগ্রগতির মধ্যে। এই ঝন্ডকে তরান্বিত করবে শ্রমিক শ্রেণী অন্যান্য মেহনতি মানুষের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে। শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা দখলের মাধ্যমেই এই ঝন্ডের চির অবসান হবে। এই বিপ্লবী লক্ষ্য একমুহূর্ত ভুলে গেলেও মারাত্মক বিচ্যুতি হবে। তাই শৃঙ্খলিত বৃক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তির জন্য আন্দোলন করলেই বিপ্লবী লক্ষ্য পৌঁছান যাবে না। ক্ষমতা দখলের জন্যও শ্রমিক শ্রেণীকে অহরহ কাৰ্যক্রম চালাতে হবে। ঐতিহাসিক কারণে বর্তমানে "নিঃস্রোজনীয়" ব্যুজোরী শ্রেণীর বিকল্প সংগঠিত স্বেচ্ছাশ্রম,

অগ্রগামী শ্রেণী হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীকে এখন দেশ ও সমাজের সামনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুভূতি থাকা অবশ্য প্রয়োজন। এটা না থাকলে অনিবার্যভাবে সংস্কারবাদের বন্ধ জলাশয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়তে হয়। আমাদের দেশসহ পৃথিবীর বহু দেশেই শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে এরূপ সংস্কারবাদী কোঁক দেখা যায়। সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়াইএর নামে অতিবিপ্লববাদ, হঠকারি কোঁকও দেখা যায়। এ দুটি কোঁকই শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষতি করে, বুর্জোয়া ও শোখক শ্রেণীকে সাহায্য করে, অগ্রগতি বাহত করে। ফলে শ্রমিক শ্রেণী তার বহু সম্ভাব্য মিথকেও হারায়। সংস্কারবাদ ও অতি বিপ্লববাদ এই দুই ভ্রান্ত কোঁকের বিরুদ্ধে সর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলন :

আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তার সাধারণ কার্যক্রম ও লক্ষ্য সম্পর্কে রূপরেখা দিতে গিয়ে মার্ক্স, এঙ্গেলস্, লেনিন ব্যারে ব্যারে বলেছেন, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও লক্ষ্য ঠিক রেখে এক একটি দেশের শ্রমিক শ্রেণী নিজ নিজ দেশের নির্দিষ্ট বিশেষ সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে। তা সর্বক্ষেত্রে একই ধরনের হবে না। মার্ক্সবাদ হলো একটি বিজ্ঞান, যা সৃজনশীল। এক একটি দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে এই বিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ করে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করাই হল প্রকৃত বিপ্লবীদের কাজ।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য নিয়ে মার্ক্সস্, এঙ্গেলস্ ও লেনিনের মৌলিক শিক্ষাগুলি আমাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রয়োগের চেষ্টা চলে আসছে। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষাও হয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বেও হয়েছে, স্বাধীনতার পরেও হচ্ছে। ভারতের প্রাচীনতম সম্রাট শ্রমিক সংগঠন এ-আই-টি-ইউ-সির ৬৫ বর্ষ পূর্তিকালে ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ৬০ বর্ষ পূর্তিতে একথা আজ স্বীকার করতেই হবে যে ভারতের বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী ও নেতৃবৃন্দ এদেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের বিনিয়াদি শিক্ষাকে ষথায়থ ও সঠিক প্রয়োগে সক্ষম হতে পারেননি। দেশের মুষ্টিসম্রাটে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী বহু সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু সে সংগ্রামের নেতা হতে পারে নি। বুর্জোয়া শ্রেণীই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নেতৃত্বের ভূমিকা নেয়। স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরেও শ্রমিক শ্রেণী তার অর্থনৈতিক সংগ্রামে ও ট্রেড্ ইউনিয়ন সংগঠনে অনেক বেশী

সংগঠিত হলেও সারা দেশেও সমগ্র জাতির নেতা হয়ে উঠতে পারেনি। শত বার্ষিকতা ও সংকট সত্ত্বেও বৃজ্জোয়া শ্রেণীই যেভাবে হোক সারা দেশ ও জাতির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকছে। এই ঘটনাটি কি স্বাভাবিক ও অনিবার্হ? প্রকৃত বিপ্লবী এটা স্বাভাবিক ও অনিবার্হ বলে মেনে নিতে পারে না। সমগ্র প্রক্রিয়ার মধ্যে আমাদের দেশে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোথাও একটা ফাঁক, একটা বিচ্যুতি থেকে যাচ্ছে। পরিপূর্ণ প্রাণখোলা আত্মসমালোচনার মনোভাব নিয়ে, নূনতম দায়িত্বকতার প্রণয় না দিয়ে খুঁজে বার করতেই হবে, বিচ্যুতিটা কোথায়। বৃজ্জোয়া শ্রেণীর চরম ব্যর্থতা বারে বারে প্রমাণিত ও স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিক শ্রেণী কেন একটা বিকল্প শক্তি গড়ে তুলতে পারছে না?

এর কারণ অনুসন্ধান করতে মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী দৃষ্টিতে ভারতের বিশেষ পরিস্থিতি ও শ্রমিক আন্দোলনের গতিধারা আলোচনা করা প্রয়োজন। শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী কর্মীদের সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে একাঙ্ক করতেই হবে। গতানুগতিক ট্রেড ইউনিয়নের তথাকথিত কাজ ও আন্দোলনে শৃঙ্খল নিমগ্ন থাকলে চলবে না। এদেশেও শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত মুক্তির জন্য শেষপর্যন্ত বৃজ্জোয়া শোষক ও শাসকদের উৎখাত করে স্বাধীনতা দখলের লড়াইটা এক মুহূর্ত গোণ হতে পারে না।

পারিস্থিতির বৈশিষ্ট্য :

বণিকের বেশে ইংরাজরা যখন এদেশে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে সারা দেশটি দখল করে, সাম্রাজ্য বিস্তার করে প্রায় আড়াইশো বছর পূর্বে, তখন এদেশে কোন শিল্প কলকারখানা, রেলপথ গড়ে ওঠেনি। খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন, অসংযুক্ত বিদ্যুৎ সামন্ত নৃপতিজ্ঞা দেশটি শাসন করত। বায়েম ছিল পুরাপুরি একটা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। ইংরাজ শাসকবর্গ তাদের শোষণের স্বার্থে ধীরে ধীরে এদেশে স্টিমশক্তি, চট্টশিল্প ও অন্যান্য শিল্প, রেলপথ গড়ে তুলল। এদেশেও জন্ম নিল আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী। এইসব শিল্পের মালিক ছিল তখন ইংরাজরা। ভারতের বণিক শ্রেণী প্রথম দিকে ব্যবসায় বণিজ্যে লিপ্ত থেকে অর্থ সঞ্চয় করলেও পরবর্তীকালে তাদের একটি অংশ শিল্প ও কলকারখানা প্রতিষ্ঠায় পুঁজি নিয়োগ করে। শ্রমিক শ্রেণীর সাথে ইংরাজ ও দেশীয় মালিকদের বিরোধ তখন থেকেই দেখা যায়। এক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে উজ্জ্বল মালিকের সমন্বার্থও থেকে যায়। আবার বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী ও এদেশীয় মালিক শ্রেণীর সমন্বার্থ ছিল

বাক্তব। ইংরাজ শাসকবর্গ এদেশের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শোষণকে বজায় রেখে সামন্ত রাজাদের মিথ করে নিজেদের শাসনক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। এসব সত্ত্বেও ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে বিদ্রোহ ফেটে পড়ে। সমগ্র জাতির অভ্যুত্থান ঘটেতে থাকে।

ইতিমধ্যে বোম্বাই, আহমেদাবাদ, কলকাতায় বহু সংখ্যক কলকারখানা গড়ে ওঠে। প্রধানতঃ ইংরাজরা এসব কলকারখানার মালিক হলেও, ইতিমধ্যে বহু দেশীয় মালিকও তৈরী হয়। শ্রমিকের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। মালিকদের সাথে শ্রমিকদের সংঘর্ষও বাড়তে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলিকাতা, বোম্বাই-এ শ্রমিকগণ অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া নিয়ে ধর্মঘট সংগ্রামেও অবতীর্ণ হয়। এমন কি লোকমান্য তিলকের মৃত্তির রাজনৈতিক দাবীতে বোম্বাই-এর স্তাকল শ্রমিকগণ ধর্মঘট করেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যা পূর্বেই বলা হয়েছে, শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে দেশীয় ও ইংরাজ মালিকদের সম্মিলিত কণা। ইংরাজ শাসকদের সাথে এদেশীয় মালিকদের যেমন সাধারণ বিরোধ ছিল, তেমনি ইংরাজ মালিকদের কিছুটা আনুকূল্যে ও এদেশের শ্রমিকদের শোষণ করেই এদেশীয় মালিকদের একটা অংশের পুঁজি ক্ষত হচ্ছিল। তাই শ্রমিক আন্দোলনের মোকাবিলায় উভয় মালিক ছিল এককাটা। এবিষয়ে পূর্বে থেকে নিজ দেশে এযাপারে হাত পাকিয়ে তোলে ইংরাজ মালিকরা। সূর্য থেকেই অর্থনীতিবাদ ও ট্রেড ইউনিয়নবাদের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীকে মতাদর্শগতভাবে নির্মোক্ত রাখার চেষ্টা হল। উৎপাদনের উপায়গুলির ব্যক্তিগত মালিকানার অবমান করে, সামাজিকীকরণ করে শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত মৃত্তির জ্ঞান লড়াই নয়, বর্তমান সমাজ ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে, কিছু আর্থিক সুবিধা আদায় করতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও তার মাধ্যমে আন্দোলন করেই শ্রমিকদের জীবন-যাত্রার উন্নতি হতে পারবে এই ধারণার সৃষ্টি করা হল। এই উদ্দেশ্যে ভারতের বর্জ্যেয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিকূ গান্ধীজি আহমদাবাদে গড়ে তুললেন শ্রমিকদের সংগঠন “মজদুর মহাজন”। তিনি প্রচার করলেন, “মালিকও থাকবে, শ্রমিকও থাকবে। মালিকদের শোষণ একটু কম করতে হবে, শ্রমিকদেরও একটু বাঁচার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তবে শ্রমিকদের খুব বেশী দাবী করলে হবে না।” একবার গান্ধীজি বললেন, “হাতির খোঁরাক আর পিঁপড়ার খোঁরাক তো সমান হতে পারে না।” হাতি হচ্ছে মালিক আর পিঁপড়া হচ্ছে শ্রমিক, ইংরাজ শাসকদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজির অবদানকে স্বীকার

করেও করতে হবে তিনি ভারতীয় বুদ্ধোন্নতশ্রমিকেরই স্বার্থরক্ষাকারী প্রথমিক শ্রমীর নয়।

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীতেই পরাধীন ভারতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ট্রেডইউনিয়ন ও পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি প্রম আইন (বেতন প্রদান, ক্ষতিপূরণ দান ইত্যাদি) চালু হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের বুদ্ধোন্নত শ্রমী যখন দেশের শাসন ক্ষমতায় বসে, উপরোক্ত ভাবধারা অনুসরণ করে বেশ কিছু প্রম আইন চালু করেন : প্রম বিরোধ আইন, কারখানা আইন, রাষ্ট্রীয় বীমা আইন, প্রভিডেন্টফান্ড আইন প্রকৃতি প্রথমিক আন্দোলনের দ্বারা অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের ন্যায় এসেলেও এসব প্রম আইন চালু হয়। এর মধ্যে লক্ষ্যনীয় যে শ্রমবিরোধ আইনের মাধ্যমে বুদ্ধোন্নত শ্রমী প্রথমিকদের আন্দোলনকে ওয়ার্কস্ কর্মটি, সালিশী, গ্রাইভ্‌নাল, কোর্টের চৌহান্দির মধ্যে আবদ্ধ করতে চাইল। এই চৌহান্দির বাহিরে গিয়ে কোন আন্দোলন করলে তা নিষিদ্ধ হতে থাকল। বর্তমানে ন্যাসা, এস্‌য়া প্রকৃতি প্রত্যক্ষ দমনমূলক আইন করে বুদ্ধোন্নত শাসকবর্গ নয়ভাবে প্রথমিকদের বিরুদ্ধে মরদানো অবতীর্ণ করেছে। পুরান ভাবধারা প্রচার ও আইন দ্বারা যখন প্রথমিক আন্দোলনের অনিবার্য অগ্রগতিকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না, তখন প্রত্যক্ষ দমনমূলক ব্যবস্থা ছাড়া বোধহয় ওদের আর কোন উপায় নাই। অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও শোষণের বিরুদ্ধে প্রথমিক আন্দোলন কখনও কখনও উদ্ভাস ও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠে। এর মূল্য ও তাৎপর্য উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু এসব প্রথমিক আন্দোলনের প্রকৃতি অর্থনৈতিক। কখনও কখনও রাজনৈতিক রূপ নিলেও তা সংস্কারমূলক থেকে যায়, বিপ্লবী হয় না, সমাজ বদলের দিকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে পারেনা অন্যান্য মেহনতি নির্যাতিত শ্রমীদের সাথে জোট বেঁধে।

স্বাধীনতার পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত ভারতে প্রথমিক আন্দোলন মূলতঃ সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও স্বতন্ত্রতার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে আছে। বুদ্ধোন্নত জাতীয়তাবাদী নেতারা ব্রিটিশ কায়দায় প্রথমিকদের এই সীমার মধ্যে রাখতে পেরেছেন। নিজ শ্রমীর স্বার্থে আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা আদায়ের জন্য মরণপন কষ্টদায়ক সংগ্রামও প্রথমিক শ্রমী চালায়। কিন্তু এইসব সংগঠিত শিল্প প্রথমিকদের চেয়ে আরও শোষিত, আরও দুর্দশাগ্রস্ত সমাজের অন্যান্য শ্রমীর জন্য এসেলে প্রথমিক আন্দোলনের বিশেষ ভাবনা চিন্তা কার্যক্রম মূল্যহীন—২

নেই। অর্থ প্রাথমিক শ্রেণী ছাড়া সমাজের অন্যান্য নির্বাচিত শ্রেণীর সুখ-স্বচ্ছন্দ ও কল্যাণের জন্য ভাববে কে? এর জন্য সক্রিয় কার্যক্রম নেবে কে? বুর্জোয়া শ্রেণী তো এদেরও শোষণ করে প্রতাপ ও পরোক্ষ ভাবে। প্রাথমিক আন্দোলনে কর্মিউনিটেরা মাঝে মাঝে এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা কিছু করলেও ধারাবাহিক সক্রিয় কার্যক্রম কোথায়? কর্মিউনিটেরাও কি সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়ন ও স্বতন্ত্রত্বের মধ্যে ভ্রমে বেড়াচ্ছেন না? মুখে ও লেখায় সমাজবাদের ও বিপ্লবের যত কথাই বলা হোক না কেন, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, নানা অজুহাত ও যুক্তিতে কর্মিউনিটেরাও এই বিশেষ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার কোন সক্রিয় কার্যকর ভূমিকা প্রাথমিক আন্দোলনে নিতে পারছেন না। এই অবস্থায় প্রাথমিক শ্রেণী তার ঐতিহাসিক বিপ্লবী দায়িত্ব পালন করতে পারে না। প্রাথমিক আন্দোলন শুধুমাত্র নিজ স্বার্থ নয়, সমাজের অন্যান্য নির্বাচিত শ্রেণীর, সারা দেশ ও জাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্য ভাববে, লড়বে। তবেই তো সমগ্র দেশ ও জাতির নেতার ভূমিকা নিতে পারবে, ঐতিহাসিক বিপ্লবী দায়িত্ব পালনে এগুতে পারবে। প্রাথমিক আন্দোলনের মধ্যে সে কার্যধারা ও প্রস্তুতি কোথায়? প্রাথমিক আন্দোলনে এই সমস্যা চিরকালের বর্তমানে আমাদের দেশেও প্রকট হয়ে জেঁকে খসেছে প্রাথমিক আন্দোলনের বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে। মৌলিক মাস্তাববাদী লেনিনবাদী দৃষ্টভঙ্গীতে প্রাথমিক আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রয়োজন বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম, মতাদর্শগত শিক্ষা। ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সংগঠিত অসংখ্য জংগী ও মুখিয়া প্রাথমিক কর্মীদের ধারাবাহিক নিয়ত মাস্তাববাদী লেনিনবাদী বিনিয়াদি শিক্ষা দিয়ে সচেতন নেতৃত্বের পর্বায়ে তুলতে হবে। শুধুমাত্র কয়েকজন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ট্রেড ইউনিয়ন নেতার দ্বারা সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়ন চালান যেতে পারে, বিপ্লবী প্রাথমিক আন্দোলন গড়ে উঠবে না। ট্রেড ইউনিয়নের বুদ্ধিজীবীনেতৃত্ব দ্বারা নিজেদের বিপ্লবী আন্দোলনের ঘোষা মনে করেন, তাঁরাই তো প্রাথমিকদের শিক্ষিত ও সচেতন করা, সংগঠন গড়ার কাজদুলিও করবেন। তা না হলে অন্যান্য সংস্কারবাদী তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সাথে বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের পার্থক্য থাকে না। বিপ্লবী নাম লওয়ার কোন পার্থক্য থাকে না।

সম্প্রতিকালে প্রাথমিক আন্দোলনে অতিবিপ্লবীপনা বৌদ্ধ ও লক্ষ্য করা যায়। এঁরা প্রাথমিকদের সৈন্যবিন্দন অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন গড়া ও ব্যাপক প্রাথমিকদের সংগঠিত করার কাজদুলি অস্বীকার করেন। প্রাথমিকদের মধ্যে গ্রুপ গড়ে বিপ্লবী প্রচার চালনা ও কখনও কখনও “কিছু এগাওর” কবাক্টে একত্রিত কাজ মনে করেন। এটাও মারাত্মক ও বিপজ্জনক।

ফলে শ্রামিক শ্রমিকদের অংশে বৃদ্ধি পাবে। শ্রমিক ও শ্রমিকদের প্রতিশ্রুতি
শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। শ্রমিক বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে
প্রকৃত বিপ্লবী শ্রমিক শ্রমিক আন্দোলনের এসব মতাদর্শগত ও বাস্তবিক সমস্যার
সমাধান করেই হবে।

জাতি সমস্যা ও ঐক্য সমস্যা :

সুদীর্ঘ কাল ধরে সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসনে ভারতের শ্রমিক
ও অর্থনৈতিক বিকাশ হতে পারেনি। বিশাল ভারতে ইংরেজ শাসনের স্বার্থে
বড়ো বিকাশ হয় তাও অসম। বহু ভাষাভাষী, জাতি উপজাতি, ধর্ম সম্প্রদায়
অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা বিচিত্র এই দেশের কোটি কোটি মানুষ
শোষণ-লাঞ্ছনা-নিপীড়নে জর্জরিত হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতা লাভের চার দশকের মধ্যে শাসন ক্ষমতার অর্ধেক ভারতের
বৃদ্ধি প্রচেষ্টা শিল্প-কৃষি-শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশে জনতান্ত্রিক পথ অবলম্বন
করে। দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি ও বিকাশের জন্য সামন্ততান্ত্রিক শোষণকে
নিষিদ্ধ করে জনসংখ্যার অধিকাংশ কৃষকদের ও কৃষির উন্নতি হলো না। ভারত
ও ব্রিটিশ শিল্পের উন্নয়নযোগ্য বিকাশ হলো তা হল সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট
কিছু রাজ্যে। বিকাশের অসম অবস্থা বজায় থাকল। পঞ্চাশের বিভিন্ন
অঞ্চলের বিকাশের কোন ব্যবস্থা হলো না। বেকারি, দারিদ্র্য এসব অঞ্চলের
মানুষদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলের সাথে কেন্দ্রীয় বৃদ্ধি
শাসকবর্গের সম্পর্ক তীব্র হতে থাকে। ভারতের ঐক্য ও সংহতি নিদারুণভাবে
বিপন্ন হয়ে ওঠে। সামন্ততন্ত্র ও বিদেশী বহুজাতিক বণিক সংস্থার সাথে
আপোষ করে জনতান্ত্রিক পথে দেশ পরিচালনার এটা অনিবার্য পরিণতি।
ভারতের জনগণের সুদীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐতিহ্য ও বৃদ্ধির বিরুদ্ধে
শাস্তির নীতি এখনও বৃদ্ধি প্রচেষ্টা অনুসরণ করে চললেও বিপুল সংখ্যক
জনগণের অগ্রগতি ও কল্যাণ সাধনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সম্প্রতি আবার
বেঙ্গলোরা বৈদেশিক বণ গ্রহণ করে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীদের সাথে
হস্ত করে উন্নত কৃষিক্ষেত্র আমদানী করে শাসকবর্গ এদেশের বেকারি ও
দারিদ্র্যকে চরমে তোলার ব্যবস্থা করেছে। ভারতের স্বাধীন, স্বল্পভর অর্থনৈতিক
বিকাশে কুঠারঘাত করেছে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বও বিপন্ন হয়ে উঠছে।

ভারতের জাতীয় সংহতি ও ঐক্য শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে, সমগ্রজাতি ও
কোটি কোটি মানুষের অগ্রগতি ও কল্যাণের ক্ষেত্রে ভারতের বৃদ্ধি শাসকদের
চরম ব্যর্থতা আজ স্পষ্ট। বৃদ্ধি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসম্পূর্ণ কাজসমূহ

সম্পাদন করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা বৃজ্জেরা শ্রেণী দায়িত্বের। ভারতের প্রমিক শ্রেণীকেই এ দায়িত্ব আজ কাঁধে তুলে নিতে হবে। একমাত্র প্রমিক শ্রেণী যদি সচেতনতা ভাবে এ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। তবেই জাতি সমস্যার সমাধান হবে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষিত হবে। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ নিষিদ্ধ করে কৃষি ও কৃষকের অগ্রগতি হবে। শিল্পের বিকাশ হবে, সমগ্র জাতি অগ্রগতি ও কল্যাণের পথে যাবে। প্রমিক শ্রেণীই একমাত্র অন্যান্য শ্রেণীকে নিয়ে একাজ সম্পাদন করার উদ্যোগ ও নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে পারে। বৃজ্জেরা শ্রেণীরও এক অংশ একাজে প্রমিক শ্রেণীর মিত্র হতে পারে, কিন্তু নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা আর তার নাই।

এক্ষেত্রে আমাদের দেশের প্রমিক শ্রেণীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। বিভিন্ন ভাষা ও জাতি ধর্মের মানুষ নিয়ে এই দেশ। এখানে শিল্প-কারখানা এলাকাগুলিতে বিভিন্ন ভাষা-জাতি-ধর্মের প্রমিক সম্মেলন হয়ে একত্রে কাজ করে, বসবাস করে, সংগ্রাম করে, ঐক্যবদ্ধ ভাবে, সংগঠিত হয় একই ট্রেড ইউনিয়নে। এসব ক্ষেত্রে পরস্পর জাতি-ধর্ম বিষয়ে সেবা যায় না। এখনও এক কথা বলি বলা যায় প্রমিক শ্রেণী হল আমাদের দেশের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির বাস্তব প্রতীক। আমাদের দেশেও এই প্রমিক শ্রেণীই পারে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির বাস্তব কার্যকরভাবে ছাড়িয়ে দিতে। বহু ভাষা ও জাতি অধ্যুষিত রূপ দেশের সচেতন প্রমিক শ্রেণী একাজ করছিল।

প্রমিক আন্দোলনে বিপ্লবী সচেতনতার সমস্যা :

মালিকের শোষণের বিরুদ্ধে প্রমিকের স্বার্থে প্রম আইনগুলি কার্যকরী করতে প্রমিক শ্রেণী লড়ে, লড়বে। এমনকি সরকারি শাসন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে লড়বে। এসব স্বতন্ত্রস্বত্ব লড়াই বা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সার্বকতাও আছে। প্রমিক শ্রেণী এসব লড়াই এর মাধ্যমে অভিজ্ঞতা লাভ করে, শোষকদের নয় চেহারা অনুভব করতে পারে। কিন্তু এসব লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আপনা আপনি প্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী সচেতনতা আসে না। শোষণের উৎস ও তাকে উপড়ে ফেলার শিক্ষা আপনা আপনি লাভ করে না। বাইরে থেকে পরিচালিত ও সংগঠিতভাবে প্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এই বিপ্লবী শিক্ষা ও চিন্তা ধারাবাহিক ভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা চাই। এজন্য প্রমিক শ্রেণীর মধ্য থেকেই অগ্রদূতদের নিয়ে বিপ্লবী সংগঠনও গড়ে তুলতে হয়। একাজে অবহেলা করলে প্রমিক শ্রেণী তার ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক দায়িত্ব পালন করতে পারে না।

স্বাধীনতালভার পূর্বে ইংরাজ আমলে যখন শ্রমিকদের জন্য এত আইন হয়নি, এত সুযোগ-সুবিধা অর্জিত হয়নি, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেরও তেমন প্রসার ও স্বীকৃতি হয়নি, তখন কর্মিউনিট বিপ্লবীরা শ্রমিকদের মধ্যে যৈয ধরে বিপ্লবী শিক্ষা ও সচেতন করার কাজটা জোর দিয়ে করতেন। এই শ্রমিকরাই যতটুকু সচেতন হয়েছিল, তারই ভিত্তিতে শ্রমিক ছাড়াও কৃষক ও অন্যান্য মেহনতি মানুষদের আন্দোলন ও সংগঠন গড়ার সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। জাতীয় ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী শ্রেণী সচেতন শ্রমিককর্মীরা সক্রিয় ভূমিকা নেয়। কিন্তু এই বিশাল অনন্নত দেশে স্বল্পসংখ্যক কর্মিউনিট বিপ্লবীদের একদিকে অভিজ্ঞতার অভাব, অন্য দিকে ভারতের বিশেষ পরিস্থিতিতে মাস্তাবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার সঠিক প্রয়োগে অক্ষমতা শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে জাতীয় নেতৃত্বের পর্যায়ে তুলতে পারেনি।

স্বাধীনতালভার পর পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হয়। বৃজ্জোয়া পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র এদেশে চালু হল। কলকারখানা, শিল্প অনেক বেড়ে গেল। পুরাণ অর্শিক্ষিত, অধর্শিক্ষিত, অদক্ষ শ্রমিকের স্থলে আবির্ভূত হলো নতুন ধরনের শ্রমিক-শিক্ষিত ও দক্ষ। শ্রমিকের অর্থনৈতিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মুখে বৃজ্জোয়ারা অনেক কনসেশনও দিল। নতুন নতুন শ্রমআইন হলো। বৃজ্জোয়া শাসকদল তাদের শাসনকে টিকিয়ে রাখার জন্য ঐক্যবদ্ধ এ-আই-টি-ইউ-সি ডেস্কে নিজস্ব দলীয় আই-এন-টি-ইউ-সি গঠন করল। স্বাধীনভারতে শ্রেণী সংগ্রাম নয়, শ্রেণী সমঝোতা করেই শ্রমিকদের কল্যাণের পথে এগুবার প্রচার চলল। পূর্বেই বলা হয়েছে, মালিশী, ট্রাইবুনাল, ওয়েজবোর্ডের চৌহান্দির মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে আবদ্ধ করা হল। শ্রমিকদের মধ্যেও একদল উচ্চ বেতন ও সুবিধাভোগী গড়ে তোলার চেষ্টা এদেশেও চলল। এদেরই কোন কোন অংশ বর্তমান সমাজব্যবস্থার মধ্যেই বৃজ্জোয়া সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নের কন'ধার হয়ে উঠলেন। এদের জীবন যাত্রা, চাল-চলন ও বৃজ্জোয়া ধারার প্রবাহিত হয়। অনেক অশ্রমিক নেতা ট্রেড ইউনিয়নকেই জীবন ধারণের পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। বর্তমানে কর্মিউনিট বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও নেতাদেরও অনেকে এই আবহাওয়া ও ভাবধারার জাঁড়িয়ে পড়েন। মালিক কর্তৃক ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি ও অন্যান্য বহুবিধ সুযোগ দানের মধ্যদিয়ে এই প্রক্রিয়া বেড়ে চলেছে। একেবারে হাল আমলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এই হচ্ছে বাস্তব চিত্র। স্বাধীন ভারতে বৃজ্জোয়া গণতান্ত্রিক পরিবেশে শ্রমিক শ্রেণীও সাধারণভাবে সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়ন স্রোতধারার প্রভাবে পড়ে গেছে। বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন চিন্তাধারা

থেকে দূরে সরে আছে। দেশ ও জাতির সমস্যা, সমাজের অধিকতর শোষিত, নিপীড়িত মানবের সমস্যা নিয়ে চিন্তা ও কাজ না করে শ্রমিক শ্রেণী আত্মকেন্দ্রিক হয়ে শুধু নিজ শ্রেণীর আপাত স্বার্থের জন্যই আন্দোলন করে। সংগঠিত শিল্পের শ্রমিকগণ যদিও শিল্প ভিত্তিতে মাঝে মাঝে লড়াই করে, কিন্তু সেটাওতো মূলতঃ নিজ শ্রেণীর আশু অর্থনৈতিক দাবীর ভিত্তিতে লড়াই। সংগঠিত শিল্পের বাহিরে অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা বহুগুণ বেশী। এদের জীবন ধারণের মান অনেক নীচে, নিম্নতম সুযোগ সুবিধাও ভোগ করে না, ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত নয়। এদের দুরবস্থা অসহনীয়। পুঁজিবাদী সংকটে হাজার হাজার কারখানা বন্ধ ও বন্ধ হওয়ায় বেকার শ্রমিক প্রুত বেড়ে চলেছে। প্রকৃত ভূমিসংস্কার না হওয়ায়, নতুন কলকারখানা সম্প্রতিকালে আর জেন গড়ে না ওঠার বেকারির সমস্যা তীব্রতায় হয়ে উঠেছে। এসব সমস্যা সমগ্র শ্রমিক আন্দোলন আর কতদিন মূখ্য বৃজে দেখবে? এসব সমস্যা বাদ দিয়ে শ্রমিক আন্দোলন এগুতে পারে না।

শ্রমিক আন্দোলনের এসব অন্তর্নিহিত সমস্যাদুলি খুবই জটিল ও কঠিন। একদিকে অনিবার্য প্রক্রিয়ার শ্রমিক আন্দোলনে সংস্কারবাদ, সুবিধাবাদ চেপে কসেছে, বুর্জোয়া-প্যাটিবুর্জোয়া পরিবেশে বিপ্লবী স্রোতধারার কণীবন্ধ্যা, কর্মউনিষ্ট বিপ্লবীদের ধারাবাহিক পরিকল্পিত ও সংগঠিত বিপ্লবী তৎপরতার অনুপস্থিতি; অন্যদিকে পুঁজিবাদী সংকটের আঘাতে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী ও গোটা সমাজ এক অসহনীয় অবস্থার সম্মুখীন। বুর্জোয়া শাসকবর্গ গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে সুখ ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে। ভারতের এই জটিল সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণীকেই উদ্যোগী হয়ে নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে হবে। সমগ্র দেশ ও জাতির সম্মুখে আর কোন বিকল্প নেই।

শ্রমিক শ্রেণীকে সংস্কারবাদের প্রভাব ও আওতা থেকে বেরিয়ে এসে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণের জন্য চাই নিরন্তর সচেতন বিপ্লবী প্রয়াস ও কর্মতৎপরতা। দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন চলেছে ও চলবে। কিন্তু শুধু মাঠ তার মধ্যে নিকট থেকে থাকলে চলবে না। নিজ শ্রেণীর ব্যাপক ঐক্য গড়ার সাথে সমাজের অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণীর মুক্তির জন্য কর্মপন্থা নিতে হবে, জাতীয় অগ্রগতির জন্য কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে।

শ্রমিক শ্রেণীকে এভাবে প্রস্তুত করার দায়িত্ব কাদের? শ্রমিক আন্দোলনে বিপ্লবী নেতা ও কর্মীদের এ দায়িত্ব নিজেই হবে। যারা সমাজের বিপ্লবী, যারা

অগ্রগামী চিন্তা করেন, তাঁরা ছাড়া শ্রমিক শ্রেণীকে এভাবে বিপ্লবী সচেতন ও শিক্ষিত করার দায়িত্ব আর কেউ নিতে পারে না। এতদিন যে কমিউনিষ্ট বিপ্লবী নেতা ও কর্মীগণ ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনে জড়িত আছেন, প্রধানতঃ ও প্রত্যক্ষভাবে তাঁদেরই এ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতেই হবে। বর্তমানের সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতি সচেতনভাবে পরিচালনের জন্য নিজেদের মধ্যে আত্মদৃষ্টিশীল ও সন্তোষ করতে হবে। মনে রাখা দরকার, অভিজ্ঞতাও শিক্ষা দিচ্ছে যে, যেভাবে ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন চলছে, তার দ্বারা বিপ্লবী লক্ষ্য পৌঁছান যাবে না, শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত মূর্খিও অর্জন করা যাবে না। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে।

শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী কর্মী ও নেতাকগণ যদি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে অগ্রসর হন, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও বিপ্লবী সচেতনতার কাজ সূর্য হবে। শ্রমিকদের মধ্যে অগ্রণী সচেতন কর্মীদের নিয়ে সুদৃশ্বেল বিপ্লবী সংগঠনও গড়ে উঠবে। এই দ্বারা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে শ্রমিকদের মধ্য থেকে অসংখ্য বোম্বা বিপ্লবী নেতাও গড়ে উঠবে যা বর্তমানে প্রায় দেখা যায় না। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ধারাবাহিক প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমে বিপ্লবী সচেতনতা গড়ে উঠবে। একাজ কষ্টদায়ক ও বৈষাঙ্গ্যপূর্ণ। প্রচলিত গতানুগতিক অভ্যাস পাল্টেই এই বিপ্লবী কর্মতৎপরতা চালানার উপরেই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

শত বাধা ও সমস্যা থাকলেও পরিস্থিতি সমগ্রভাবে সম্ভাবনাপূর্ণ। আমাদের দেশে শ্রমিক শ্রেণী যে অবস্থানে রয়েছে, নিজ শ্রেণী স্বার্থে ও জাতীয় স্বার্থে মানসিকভাবে শ্রমিক শ্রেণীকে দায়িত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণ প্রস্তুত করাতে পারলে মৌলিক পরিবর্তনের গতি প্রবল হয়ে উঠবে। যে প্রবল গতিতে প্রতিহত করার কোন সাধ্য বুর্জোয়া শাসকবর্গের থাকবে না। মূলতঃ শ্রমিক শ্রেণীর উদ্যোগে ও নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করা যাবে।

শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী কর্মী ও নেতাদের এবিষয়ে মানসিক প্রস্তুতি ও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার ভাবনা-চিন্তা জরুরী হয়ে উঠেছে।



আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নারী চেতনার ক্রমজাগরণ ও তার বিকাশ

আবুত্ব গজোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক নারীদশক শেষ হয়েছে। নাইরোবি শহরে সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১৫০০০ মহিলার সক্রিয় অংশগ্রহণ নারী আন্দোলনের ইতিবৃত্তে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। কিন্তু বর্তমানে নারীবাদী আন্দোলন বা ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট সম্বন্ধে যে নব নব বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাস সংকলিত ও প্রচারিত হচ্ছে, তার ফলে সমকালীন রাজনীতি সচেতন মানুষের মনে এক বিশ্বাসকূল অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে নারী আন্দোলনের পক্ষে এক নতুন বাহার আশংকাও বাধা তুলেছে, সেটি খুব স্বাভাবিক নয়। সেইজন্যই বিশেষভাবে আজকের পরিস্থিতিতে নারী আন্দোলনকে বিশ্বের প্রেক্ষাপটে নতুন করে দেখবার প্রয়োজন ঘটেছে।

নারীর আত্মস্বাভাব্যতাবোধের সংগ্রাম প্রথম শুরুর হয় পান্ডাতা দেশে-
শ্রেণী রিটেমে। শিল্প বিপ্লবের অব্যবহিত পরবর্তী অবস্থায় যে সামাজিক বিপ্লব
ঘটে গেছে, তার মধ্যে নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সবচেয়ে বেশি
বিপ্লবাত্মক। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মেরী উল্‌স্টোনক্রাফ্ট (Mary Wollstonecraft)
'A Vindication of the Rights of Woman' নামে একটি পুস্তক
প্রকাশ করেন। এই পুস্তক প্রকাশকে অবলম্বন করেই প্রথম নারীর ভোটাধিকার
আন্দোলনের সূচনা। এই আন্দোলন চার্লিষ্ট আন্দোলনের ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে
বার্ষিকতার পর্ববাসিত হয় ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে। পরে আবার বেজামিন ডিসরেল্লীর
সহায়তায় এবং মিসেস এমেলিন প্যাংকহাস্ট (Emmeline Pankhurst) এর
নেতৃত্বে এই আন্দোলন শুরুর হয়। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে ম্যাচেস্টারে প্রথম
Women's Suffrage কমিটি স্থাপিত হয় এবং তার সম্পাদিকা হন এলিজাবেথ
উল্‌স্টোনক্রাফ্ট এলমি (Elizabeth Wolstonecraft Elmy)। ইতিমধ্যে
১৮৬৯ সালে জন স্টুয়ার্ট মিলের বিখ্যাত গ্রন্থ 'On the Subjection of
Women' প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন শহরে এই পুস্তক প্রকাশিত হবার পর
কয়েক সপ্তাহে উঠতে থাকে। পার্লামেন্টে মেয়েদের ভোটাধিকার দাবী করে
প্রায় ০০০০.০০০ মাই সম্মিলিত আবেদনপত্র জমা পড়ে। কিন্তু রানী ভিক্টোরিয়া

মেয়েদের ভোটাধিকার দানের বিপক্ষে অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দেন।
তাসত্ত্বেও ভোটাধিকার অর্জনের আন্দোলন ক্রমেই জোরালো হতে থাকে।
১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে লোকাল গভর্ণমেন্ট আর্ট বিধিবদ্ধ হয়। তাতে ন্যূনতম
ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়; যদিও সর্বসাধারণের ভোটাধিকারের দাবীর ক্ষেত্রে তা
সমানে বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছিল।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রিফর্ম বিল (Reform Bill) মেয়েদের ভোটাধিকার
স্বীকৃত হবে এইরকম আশা ভোটাধিকার আন্দোলনের নেত্রীদের মনে হচ্ছিল।
কিন্তু প্রধানমন্ত্রী গ্র্যাভটোনের বিরোধিতায় তা সম্ভব হয় নি। ইতিমধ্যে
বিভিন্ন সাফেজিস্ট সোসাইটি মিলে ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ উইমেনস্ সাফেজ
সোসাইটিজ National Union of Women's Suffrage Societies স্থাপন
করেন। Millicent Garrett Fawcett এর সভানেত্রী ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে
এমেলিন প্যাংকহাস্ট Women's Social and Political Union স্থাপন
করেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দেয় তাঁর কন্যা Christabel। ১৯০৫ খৃঃ থেকে
এই আন্দোলনে এক নতুন সংগ্রামী চেতনার সৃষ্টি হয়। ম্যাগ্রেটোরএ অনুষ্ঠিত
লিবারাল দলের এক সভার স্যার এডওয়ার্ড গ্রো যখন বক্তৃতা দিতে গুরু করেন,
তখন তাঁকে Christabel Pankhurst এবং Annie Kenmy প্রায় করেন
ভবিষ্যৎ সরকারের নীতি কল্পন হবে? কিন্তু সভার রক্ষকগণ তাঁদের দুজনকে
হাত মুচড়ে দিয়ে ধরে লাথি মেরে তাঁদের বাইরে বের করে দেন। বাইরে জমে
ওঠা জনতার প্রতি তাঁরা তাঁদের বক্তৃতা বলতে চেষ্টা করলে তাঁদের গ্রেপ্তার
করা হয়। পরদিন আদালতে তাঁদের জরিমানা হয়, কিন্তু জরিমানা না দিয়ে
তাঁরা কারাগার বরণ করে নেন। এর ফলে সারা দেশতো বাইে, সারা পৃথিবীতেই
মেয়েদের ভোটাধিকার আন্দোলনের সম্বন্ধে এক ব্যাপক কৌতূহল ও আগ্রহের
সূচনা হল। এই আন্দোলনে মেয়েরা অসাধারণ মনোবল ও সংগ্রামী মনোভাবের
পরিচয় দিয়েছেন। এর পর থেকে বিপুল সংখ্যার অনশন ধর্মঘট, শোভাযাত্রা
ও পিক্টিং হতে থাকে। ১৯১৩ সালে এমিলি ডেভিডসন নামে একজন
সংগ্রামী সাফেজিস্ট ডাব্লিউ রেসের মাঠে ছুটতে ছোড়ার পারের তলার কাঁচ দিয়ে
আত্মহত্যা করেন। এ্যাসকুইথের প্রধানমন্ত্রীর সময় তিনি এক সন্সকার
আইনের প্রস্তাব করেন, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করা হয়, কারণ তাতে মূল দাবীকে
অবিকৃত রাখা হয় নি। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধে মহিলারা অস্বাভাবিক
উৎসাহের সঙ্গে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে
ভোক্তা দলের জর্জ বকন প্রধানমন্ত্রীর গ্রহণ করেন, তখন এক নতুন রিফর্মবিল
বিবাহিতা মহিলারা, মহিলা বাড়িওয়ালী এবং গ্রিন কবসর বা ক্লব কর্তৃক

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট মহিলারা প্রথম ভোটাধিকার পান। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ভোটদানের বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা হয়।

ভোটাধিকার আন্দোলনের এই ইতিহাসের সঙ্গে নারীচেতনার জাগরণের ইতিহাস জড়িত। কেবল ব্রিটেন নয়, আমেরিকায়ও এই ভোটাধিকার আন্দোলন দানা বাঁধে জীভদাস প্রথা বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে। লুক্রেসিয়া মট (Lucratia Mott) এবং এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যানটন জীভদাস প্রথা বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে নারী অধিকার সংগ্রাম আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকেন। ১৮৪৮ খৃঃ এর জুলাই মাসে Women's Rights Convention আহূত হয়। ১৮৫০ থেকে ১৮৬৯ পর্যন্ত সংগঠনের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন চলতে থাকে। এই আন্দোলনের বিশেষত্ব ছিলো যে, এই মহিলাদের দাবী ছিলো, কেবল মেয়েদেরই ক্ষমতা নয়, নিম্নোদেরও ভোটাধিকার চাই। ১৮৬৯ খৃঃ অঙ্গের National Woman Suffrage Association গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিলো সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে মেয়েদের ভোটাধিকারের দাবী স্বীকার করতে হবে। ১৮৯০ থেকে প্রায় ৩০ বছর National American Woman Suffrage Association এই দাবী নিয়ে লড়েছে। গ্রীমতী Stanton ও গ্রীমতী Anthony-র মৃত্যুর পর তাঁদের কাজ চালিয়ে যান Anna Howard Shaw এবং Mrs Carrie Chapman Catt। বিভিন্ন রাজ্যের শাসন কর্তৃপক্ষ ক্রমে ক্রমে এই দাবী মেনে নেন এবং তাঁদের রাজ্যে মেয়েদের ভোটাধিকার প্রদান করেন। ১৯২০ খৃঃ অঙ্গের ১৯শ ভব সংশোধনীতে শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করা হয় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভোটের অধিকার।

উনিশ ও বিংশ শতকের এই সাফল্জিস্ট আন্দোলনই প্রথম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নারী স্বাধীনতার আন্দোলন। এই আন্দোলনের পশ্চাদপটে ছিল শিল্পউৎপাদনের নতুন অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নারীর উৎপাদক ভূমিকার এক নতুন স্বীকৃতির প্রয়োজন। ইতিপূর্বে সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় নারীর যে অনুৎপাদক ভূমিকা ছিল, তার ফলে সমাজে নারীর স্থান ছিল নিতান্তই নিম্নতর, অধীর্ণ-কর। এই ভোটাধিকার আন্দোলনই প্রথম নারীর সচেতন ভূমিকার স্বীকৃতি ঘোষিত হয়েছে। আমেরিকা ও ব্রিটেনের নারী আন্দোলনের কর্মবিভার ক্রমশঃ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের দ্বারা সূচিত হয়। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি নারীকে সম্প্রদায় অধীনস্থত বসেই মনে করে। ভূমি, গোদন ও শ্রী একই পর্যায়ের স্বত্বাধার। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীকে বিক্রয় করা, বন্দক সেওয়ার ব্যাপক

প্রচলন দেখা গেছে প্রাক্ বিপ্লব চীনে, ভারতে এবং অন্যান্য কৃষিপ্রধান দেশে।
 ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে যে বিঘ্নটি উল্লেখযোগ্য তা হল শ্রেণীবিভাজনের নতুন
 ধারা। ধনতন্ত্রের প্রধান উৎপাদক শক্তি মজুরী নির্ভর শ্রমিক। শ্রমিক মালিক
 শ্রেণী সত্ত্বেও সূচনা হয় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতেই। এই ধনতান্ত্রিক সমাজ-
 ব্যবস্থার যে শ্রেণীভেদ সৃষ্টি হয় তাতে নারীর স্থান সর্বদাই নিম্নতম। কারণ
 ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির চেতনার সূচনা হল।
 স্ত্রীকেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অংশ বিশেষ মনে করা হতে লাগল। শ্রেণীগত
 বিচারে নারীর নিম্নগামী ভূমিকার প্রধান উদাহরণ কোনো বিষয়ে চুক্তির সিদ্ধান্ত
 নেবার অধিকার নারীকে দেওয়া হয় না। সামাজিকতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক
 অর্থনীতিতে সর্বদাই নারীর অধিকার পুরুষের বিচার বিবেচনার উপর
 নির্ভরশীল। সেজন্যই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়
 'সকলের সমান সুযোগ', এই ভাবে। নারীর স্বাধিকার ও ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি
 সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতেই প্রথম দেখা গেল। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর
 সোভিয়েত রাশিয়ার নারী প্রগতি ও নারীমুক্তি আন্দোলনের এই অগ্রগতি স্পষ্ট
 লক্ষ্য করা গেল। এর ফলে সারা পৃথিবীতে নারীমুক্তি আন্দোলনের যেরূপ
 এক নতুন জোয়ার এলো। কেবলমাত্র ভোটাদিকার অঙ্গনের আন্দোলনের
 ক্ষেত্রে নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সমান সম্ভাব্য মেয়েদের প্রসূতি স্বৃতি প্রসূতি
 ডাটা ও বেতন আদায়ের সংগ্রামও শুরু হলো বিভিন্ন দেশে। যে বিশেষ কারণ
 নারীকে নিম্নস্তরের বলে মনে করা হয়, তা হ'ল তার সমান ধারণার জন্য সে
 গৃহকোণে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য। সমান প্রতিপালনের প্রধান দায়িত্বও তারই।
 সে জন্য সর্বত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান কাজ ও দায়িত্বকে
 স্বীকার করা হতো না। সমাজতান্ত্রিক দেশে শিশুরক্ষণ ও তার শিক্ষা-দীক্ষার
 সমস্ত দায়িত্বই সরকারের। এই সর্বস্বীন দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক
 সরকার নারীর মৃত্তিকে সহজ ও ফলপ্রসূ ব্যক্তিত্বের সহায়ক করেছে।

শিল্প বিপ্লবের ফলে নতুন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক
 মেয়েদের সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের Lyons এ ৪০০০
 শিল্পীশ্রমিক মহিলার কর্মঘটন হয়। জার্মানীর স্ত্রীকল শ্রমিকদের
 কর্মঘটন হয়। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে বৈজ্ঞানিক পৃথক্কোণ থেকে আহৃত হয় পারী
 শহরে আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলন। এই সম্মেলনে সর্বক্ষেত্রে নারী পুরুষের
 সমান অধিকার দাবী করা হয়। ফ্রান্স জের্টাকন এই দাবী উপস্থিত করেন।
 ফ্রান্স জের্টাকন আন্তর্জাতিক নারীমুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য
 নাম। জার্মানির সঙ্গে নারী আন্দোলনের বিশিষ্ট মিলন। নারীর সামাজিক

সমস্যা এবং নারী পুরুষের বৈষম্যসমস্যার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন। ১৮৭১ এর পারী কমিউনের ইতিহাসে আরো দুটি নাম নারীমুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে স্বাণীকৃত লিখিত আছে। একজন এলিজাবেথ ভির্মিট্রিয়েফ, মাত্র একশ বছর বয়সে তিনি লন্ডনে এসে ১৮৭০ সালে মার্কস পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। মার্কসের অনুরোধে তিনি ১৮৭১ সালের মার্চ মাসে পারীতে আসেন এবং অচিরেই তিনি পারীর বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। লুইজ মিশেলের সহযোগিতায় তিনি পারীর নারী সমিতি গঠন করেন। পারী শ্রমিকের প্রিয় নেত্রী 'লান' কুমারী লুইজ মিশেল ছিলেন এক জমিদারের জারজ সন্তান। পিতৃপরিচর্য বিন্ধ্য লুইজ মিশেল ফ্রান্সের কোনো স্কুলে স্থায়ী শিক্ষকের পদ পাননি। গীর্জা শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়েন বার বার। ১৮৫০ সালের পর থেকে তাঁকে দেখা যায় প্রতিটি অক্টোবরের সম্বন্ধে সারিতে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ঘিটীর কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এ প্রথম আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী নারী সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন গড়ার চেষ্টা হয়। এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা হন ক্লারা জেটকিন। ১৯২০ খৃঃ অব্দে অনুষ্ঠিত হয় ঘিটীর আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলন। এখানে প্রতি বৎসর নারী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৮ই মার্চ এই আন্তর্জাতিক নারী দিবস বলে ঘোষণা করা হয়।

৮ই মার্চ তারিখটি আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে চিহ্নিত করার কারণ হ'ল ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ নিউইয়র্কে দীর্ঘ মহিলাদের আন্দোলন শুরু হয়। দিনে ১৮ ঘণ্টার পরিবর্তে ১০ ঘণ্টা কাজের দাবিতে তাঁরা এই আন্দোলন করেন। আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল এবং কতক পরিমাণে সার্থক হইয়াছিল। এই ঘটনাকে প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঘোষণা করা হয়। এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিলেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা। এই সংগ্রামী মহিলাদের নিজেই League of Women for Peace and Freedom স্থাপিত হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রুশ সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের সাফল্যের পর সরকারী ভাবে ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করার জন্য ঘোষণা করা হয়।

ভোটাধিকার আন্দোলনের প্রথম সৈনিক এমেলিন প্যাংক হার্টের ঘিটীয়া কন্যা সিগলিভরা শ্রমজীবী নারীসমাজের মধ্যে সংগঠন তৈরী করার প্রথম থেকেই আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডক শ্রমিকদের সমর্থনে যে নারী শ্রমিকদের এক অত্যাচারের অভিযান দেখা যায়, তা উল্লেখযোগ্য। সবচেয়ে

উল্লেখযোগ্য হল এই সময়েই সোভিয়েত আন্দোলনের প্রধান বৈশ্বিক ধারাটি শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে এক বিশেষ ও ব্যাপক স্তরে উন্নীত করে। সিলভিয়া প্যাংকহাস্ট Worker's Socialist Federation স্থাপন করেন তিনি উপলক্ষ্য করছিলেন যে, শ্রমিকের মজ্জা সাথিত মা হলে নারীমজ্জা সাথিত হয় না। সে জন্য তিনি শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সত্ত্বে অধিকতর শক্তি নিয়োগ করেন। সোভিয়েত আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের এই সার্থক সহযোগনার ফলে নারী আন্দোলনের যে প্রকৃতি নির্ধারিত হয়েছিল, তার ফলশ্রুতি ঘটেছে বিশ্বনারী সম্মেলন সূচনার। ক্লারা জেটকিন ও অন্যান্য নেত্রীদের সমবেত প্রচেষ্টায় বিশ্বনারী সম্মেলন যথেষ্ট নারী অধিকারের সার্থক উপস্থাপনার উদ্যোগ শুরু হয়। বিশ্বব্যাপ্ত স্পেনীয় বিপ্লবী নেত্রী ডলোরেস ইবারুরি, থাকে লা পাণিওনারা বলা হতো, তিনি বিশ্বনারীসম্মেলনের প্রথম সম্মেলনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।

বিশ্বনারী সংঘ স্থাপনের পটভূমিকা ছিল ষষ্ঠীয় মহাযুদ্ধের সময়কাল ফ্যাসিস্ট আদর্শ ও তার পরিণতি। এই ফ্যাসিবাদের ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের উপর অমানুষিক অত্যাচার হয় এবং লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন হানিও ঘটে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয় ইটালী ও জার্মানিতে উগ্র জাতীয়তাবাদের সূচনার। পরাজিত জার্মানী ও ইটালীর নেতৃত্বদ জাতীয় আন্দোলনের জিগির তুলে এক সুদৃঢ় একনায়কত্ব গড়ে তোলার চেষ্টায় রতী হন। একদা সোস্যালিস্ট মজ্জাদে বিশ্বাসী বের্নটো মুসোলিনী, যিনি ১৯০৮ সালে সুইটজার্ট শহরের সমাজতন্ত্রী কংগ্রেসে অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন, তিনিই প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইটালিতে ফ্যাসিস্ট পার্টি স্থাপন করেন। এই ফ্যাসিস্ট পার্টির প্রধান আকর্ষণ ছিল সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বিরুদ্ধে। এরই পাশাপাশি জার্মানিতে অ্যাডলফ হিটলার ন্যাসনাল সোস্যালিস্ট পার্টি বা নার্সিস পার্টি গঠন করেন। এই দুই পার্টির অভ্যুদয়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের পৃথক এক বিরাট বাধার সৃষ্টি হয়। শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যের পরিবর্তে ভাবাবেগ সমৃদ্ধ জাতীয়তাবাদ প্রচারের মাধ্যমে সুকৌশলে স্থানীয় ইহুদীদের প্রতি তীব্র ঘৃণার উদ্বেগ এই নার্সিস পার্টির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যুদ্ধ বিধবস্ত দেশীয় অর্থনীতির অবস্থার জন্য ব্যবসায়ী ইহুদী সম্প্রদায়কে দায়ী করে যে প্রচণ্ড সম্ভ্রাস ও গণহত্যার ব্যবস্থা হিটলার করছিলেন তার তুলনা ইতিহাসে মেলে না। এই ভাবাবেগ প্রধান জাতীয়তাবাদের জিগির নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিরাট পশ্চাৎপদতার ও সৃষ্টি করেছিল। নারীসমাজ সম্বন্ধে হিটলারের ফতোয়া ছিল, নারীর স্থান কেবল গৃহকোণে এবং সম্ভ্রাস

ধারনেই তার সার্থকতা, (Kinder, Kirche Mveche, Children, Kltchen and Church)। এতদিন পর্যন্ত যে নারী সমাজ প্রমজীবী পুরুষদের এবং বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন, তার উপর যে বিরাট আঘাত হানা হল, তার ফলে নারী আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল বিশেষ ভাবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিশ্বনারী সত্বের প্রথম সূচনা।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা হিটলারের পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে। এর ফলে সারা পৃথিবীতে এক নতুন সংঘর্ষের সৃষ্টি হলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই পর্য্যায়ের সোভিয়েট গ্রাণিয়ার মেয়েরা অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়ে ছিলেন। প্রধানতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। কেবলমাত্র নারী অধিকার স্থাপনের জন্যই নয়, আর যাতে মহাযুদ্ধের ব্যাপ্ত পৃথিবীতে যুগে ডেকে না আসে, তার জন্য সর্বজনীন দায়িত্বও নারী সমাজ তুলে নেন। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির হৃৎস্পর্শ অভিজ্ঞতা পারমানবিক বোমার হিরোশিমা ও নাগাসাকি যুগে। এর বিরুদ্ধে সর্বত্র যে প্রতিবাদের কড় উঠেছিল, নারী সমাজ তার মধ্যে প্রধান, পল্লবতী কালে নারী আন্দোলনের প্রধান ধারাটি নিরন্তরিত হয়েছে এই শান্তি আন্দোলনের পৃথক, কারণ সমগ্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রুরোপের বিধ্বস্ত দেশগুলিতে এমন কোনো পরিবার ছিল না, যেখানে অন্তত একজন পূর্ণবয়স্ক যুবক বা বালক নিহত হয় নি। কেবলমাত্র রুরোপেই নয় আমেরিকায়ও এই শান্তি আন্দোলন শুরু হয় ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর, কারণ এত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে Conscription বা বাধ্যতামূলক ভাবে যুদ্ধে যোগদানের সরকারী নিষেধ প্রতিটি পরিবারের অন্তত একজনকেও মৃত্যুযজ্ঞের শিকার করেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রুরোপে এক নতুন অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছিল। পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে যে সমাজ কল্যাণ মূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি গঠিত হয়েছিল সেখানে নারীসমাজকে উৎপাদনের প্রতিটি ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হইয়াছিল। এর ফলে সমাজের প্রতিক্ষেপেই নারীর অধিকার অসামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম থেকেই নারী পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত থাকার ফলে সর্বত্র নারী-পুরুষ একত্রে অগ্রসর হয়েছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে যে অসুবিধাগুলি থাকার কথা, সেগুলি সরকারি পরিকল্পনার আওতার এসে পড়ায় শিশুপালন, শিশুশিক্ষা ও সমাজকল্যাণের দায়িত্ব সরকার থেকে সোজাসুজি নেতরা হইয়াছিল।

ঘটনা চীনের কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের সফলতা। সোভিয়েত ও চীনের বিপ্লবের পদ্ধতির মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও সমাজগঠন ও সমাজে নারীর স্থান নিশ্চেষ্টের ক্ষেত্রে উভয় দেশই একরকম মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। চীনে মেয়েদের অবস্থা ছিল খুবই কম্বল। পরিবার ব্যবস্থার নারীর দাসীর ভূমিকা ছাড়া অন্য ভূমিকার চিন্তা করাই হয় নি। উচ্চতম স্তরের রাজ পরিবার থেকে শূন্য করে নিম্নতম স্তরের কৃষক বা শ্রমিক পরিবারের সর্বত্র একই অবস্থা ছিল। কিন্তু বিপ্লবোত্তর চীনে মেয়েদের সম্মান অনেক বেশি। ‘অথেক আকাশ তুমি নারী’,—এই বাক্যে নারীচেতনার মৌল অগ্রগতির ধারাটি বোকা যায়। কেবল চেতনার অগ্রগতিই নয়, বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রেও নারীসমাজের শ্রমকে সামগ্রিক শ্রম উৎসের অঙ্গীভূত করে নতুন পরিকল্পনা নেওয়ার প্রচেষ্টা এই স্বীকৃতির প্রধান পরিচায়ক।

১৯৪৭ এ ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর এই উপমহাদেশেও এক নতুন পর্ব্যায় শুরু হয়েছে। দেশ বিভাগের প্রচণ্ড অভিঘাত এই নতুন স্বাধীনতার আনন্দকে আহত করেছে অনেক, সর্বোপরি শাসনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুতর রূপবদল সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। পাকিস্তানের পশ্চিমপাশ্বে ধর্মীয় বিধিনিষেধের বেড়া জাল প্রথমেই মেয়েদের কড়া পর্দার আড়ালে অন্তরীণ করে এক পল্চাপদ ভূমিকার ঠেলে দিয়েছিল। পক্ষান্তরে পূর্বপাকিস্তানে তা সম্ভব হয় নি। পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা উর্দু কে বাংলার বদলে প্রধান ভাষা হিসাবে চালুকরার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বাংলা ভাষা-ভাষী জনসাধারণের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। এই আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন নারীসমাজ। এর অব্যবহিত পরে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধে শানসেনাদের পৈশাচিকতা, নিবিচার ধর্ষণ এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার সত্তার হরোচ্ছল নারীসমাজের মধ্যে। এর ফলে নতুন করে নারীসমাজের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিল।

১৯৬০ এর দশক থেকে আন্তর্জাতিক নারীচেতনার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক নতুন পর্ব্যায় শুরু হয়েছে। অবশ্য ১৮৫০ থেকেই জাতিসংঘ বিশেষভাবে নারীসমাজ সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং আলোচনা শুরু করে। নারীর আত্মচেতনার কর্মবিকাশ এবং তার মধ্য দিয়ে নিজস্ব স্বাভাবিক সৃষ্টির জন্য গড়ে ওঠা সংগ্রাম বর্তমানে সারা পৃথিবীতে women's liberation নামে পরিচিত। এই liberation কেবল মাঠ রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলন নয়। সামাজিক বিধি নিষেধ ও সামাজিক অন্তর্গঠনের বিভিন্ন পর্ব্যায় নারীর ব্যক্তিগত স্বীকৃতির

আন্দোলনই হল এই women's lib movement। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে মেয়েদের যে কর্মক্ষমতা গৃহকোণ অতিক্রম করে সর্বত্র ব্যাপ্ত হল, তার মধ্য দিয়ে নারীর দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, এবং আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে গেল। Simone De Beauvoir এর রচিত যুগান্তকারী গ্রন্থ 'Second sex' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। এই বইখানি নারী স্বাভাব্যবাদী আন্দোলনের প্রধান দলিল। প্রাণিজগতে নারী পুরুষের পারস্পরিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করে লেখিকা দেখিয়েছেন যে ব্যক্তিত্বের দিক থেকে নারী ও পুরুষের কোনো প্রভেদ নেই। যৌনতার দিক থেকেও নারীর যৌনকামনা তৃপ্ত পুরুষের সন্নিবেশপক্ষ, একথা প্রমাণ করা হয়েছে। শারীরিক ও মানসিক উভয় দিকই তুলনা করে লেখিকা দেখিয়েছেন যে যদিও নারীকে চিরকাল 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' আখ্যাত করা হয়েছে আসলে এই 'দ্বিতীয়' কল্পনাটা হল যুক্তির উপর স্থাপিত।

Second Sex প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এবিধরে আরো নানা আলোচনা শুরু হয়। Susan Brown Miller এর রচিত 'Our Bodies, Ourselves,' Germain Greer এর the Female Eunnach' প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশিত হয়। Kate Millet এর Sexual Politics প্রভৃতি পুস্তকে নারী সম্বন্ধে চিরচরিত পুরুষ সমাজের বক্তব্য কতখানি আপত্তিকর এবং নারীকে নীচু করে দেখানো হয়েছে সে সম্বন্ধে প্রবল আপত্তির আলোড়ন উপস্থিত হয়েছে। এই পুস্তকপল্লিতে যে বিস্মৃতি সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে, তা হল নারী পুরুষের পারস্পরিক যৌন সম্পর্কের প্রথাসিক ধারণার বিরোধিতা। লেখিকা Radclyffe Hall প্রথম তাঁর Well of Loneliness উপন্যাসে এই প্রথাসিক ধারণার বিপরীত বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। তখন তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়। সমকামী সম্পর্কের বিরুদ্ধে তখন বিচার সৃষ্টিও হয়েছিল ব্যাপক ভাবে। স্বয়ং অসকার ওয়াইল্ডকেও সমকামিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে আর একে মানসিক বিকৃতি বলে মনে করা হয়না। কিন্তু নারীসমাজে সমকামিতা বা lesbianism আজও সমাজে একটা অস্বস্তি ঘননা ও বিতৃষ্ণার সত্তার করে থাকে। সম্প্রতি এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার শুরু হয়েছে। আবহমান কাল ধরে পুরুষের কামনার স্বেচ্ছাচার সহ্য করে এসে, এখন নারী স্বাভাব্যবোধের এক বিশেষ প্রকাশরূপে lesbianinn সম্বন্ধে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যৌনব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনার দ্বারা নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রধান ধারা মোটেই নয়, বরং একে কলা কেতে পারে

বলার সময় এখনো আসে নি। অবশ্য নারীমুক্তি আন্দোলনকে কেবলমাত্র যৌনাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বলে আখ্যাত করে এক স্বাভাব্যবাদী আন্দোলনের মূল ধারাটিকে অন্য খাতে প্রবাহিত করার জন্য এক ব্যাপক প্রচেষ্টা চলেছে সারা পৃথিবী জুড়ে। এর ফলে বিভিন্ন দেশে শোষণিত নারী সমাজের মধ্যে নারীস্বাভাব্যতার আন্দোলন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এই প্রচেষ্টা নিম্নলিখিত অভিসন্ধি মূলক।

এই স্বাভাব্যবাদী আন্দোলনের পঞ্চাৎপটে একটি মস্ত ঘটনা ঘটেছে, যার তাৎপর্য সুদূর প্রসারী হয়েছে। গর্ভধারণ নারীর পক্ষে অনিবার্য ঘটনা। প্রজন্মের দ্বারা অক্ষম রাখতে তা প্রয়োজনীয়। এই গর্ভধারণের দায়িত্ব নারীকে সর্বদা বেঁধে রেখেছিল তার সঙ্গের সীমানায়, তাকে বাধ্য করেছিল একচার্য্যনী হতে, কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পিতৃপরিচয় অবশ্য প্রয়োজনীয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা ও সম্পদের সূচক ছিল। সেক্ষেত্রে নারীর মাতৃগোষ্ঠীর বন্ধনকে বলে পরিগণিত ছিল। সম্পত্তি ও সম্পদের উত্তরাধিকারের জন্য সন্তানের মাতার একচার্য্য প্রয়োজনীয় ছিল। এই আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই সত্যের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের উপর থেকে পিতামাতার দায়িত্ব ক্রমে রাষ্ট্রের দায়িত্বে পর্ববসিত হলো। ফলে সন্তান সম্পর্কে অধিকার বোধের রূপটাই পরিবর্তিত হয়ে গেল। এ ছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ফলে সন্তানধারণের আবশ্যম্ভাবিত্ব থেকে নারীসমাজ মুক্তি পেল। নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রণালীর ভূমিকা সুদূরপ্রসারী। বাধ্যতামূলক বহুসংখ্যক গর্ভধারণের যন্ত্রণা থেকে নেয়েদের মুক্ত করার জন্য আমেরিকার ডাঃ মার্গারেট স্যাগার ১৯১৭ সালে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেন। প্রবল ও প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখোমুখি হয়ে তাকে কারাবরণ করতে হয়। কিন্তু এই আন্দোলন নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার আন্দোলনের সূচক হিসাবে অদ্যাপি ম্বরণীয় হয়ে রয়েছে। শ্রেষ্ঠাকৃত গর্ভধারণের স্বাধীনতা নারীসমাজের সামনে এক নতুন আত্মপ্রত্যয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। গ্রিন বছর আগেও মেয়েরা সন্তানধারণ শুরু করতে ষোলো-সতেরো বছর বয়স থেকে এবং তা চলত তার চার্লিশ বিয়ার্লিশ বছর বয়স অবধি। ইতিমধ্যে তার জ্যেষ্ঠ সন্তান কন্যা বা পুত্র যেই হোক না কেন, তার সন্তান জন্মতে শুরু করত, ফলে নিজের শিশুদের বড়ো করে তোলার পর পরই নারী-নারীকাদের নিয়ে কাটাতে হতো। এই ভাবে আজীবন গৃহকোণেই কাটাতে হতো মেয়েদের। তার সমস্ত কর্মশক্তি খরচ হতো রান্না, ঘরের কাজ ও মাল্যায়ন—৪

শিশুপালনে। বর্তমানে পরিবার নিয়ন্ত্রণের সুবিধার ফলে ৩৫ বছর বয়সের মধ্যেই সন্তান প্রসবের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়, যারা দেহিতে সংসার করেন, তাদেরও। এর ফলে ৩৫ থেকে ৫০ বছর বয়সের মধ্যে যে মহিলারা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে নতুন করে আগ্রহ সঞ্চারিত হচ্ছে। যে বিপুল শ্রমশক্তি কেবল গৃহকোণে আবদ্ধ ছিলো, তাকে উপযুক্ত ভাবে কাজে লাগাতে পারলে যে কোনো দেশেরই উন্নয়ন ব্যাপক ভাবে ঘটে যেত বাধ্য। ইতিপূর্বে কোনো দেশেই পরিকল্পনা ক্ষেত্রে এই নারী শক্তির উপযুক্ত মূল্যায়ন হয়নি, কিংবা উপযুক্ত পরিকল্পনাও হয় নি। সেজন্যই আজ সারা পৃথিবীতে নারীবাদী আন্দোলন বা ফেমিনিষ্ট মুভমেন্ট এক নতুন পর্ব্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

১৯৫০ এর দশক থেকেই জাতিসংঘে নারীসমাজ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান এবং আলোচনা শুরু হয়। পরবর্তী কালে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারী-পুরুষের সমানুপাতিক অধিকার ও অবস্থার পর্ব্যালোচনা করে জাতিসংঘে নারীসমাজের বিশেষ সমস্যাগুলি সমাধানের প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করা হল। ১৯৭৫ খ্রঃ অংশে মোস্কো শহরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নারীসমাজ সমবেত হন। সেখানে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'The integration of women in the development process as equal partners with men,' অর্থাৎ উন্নয়নের পথে পুরুষের সমান অঙ্গীদার হিসাবে নারীসমাজের সুনিশ্চিত অংশগ্রহণ। এই আলোচনার পটভূমিকার নানাবিধ সমস্যা আলোচিত হয়। বিশেষভাবে আলোচিত হয় যে সমস্যাগুলি, তা হল দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজগুলিতে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের মধ্যে বাধাম্বরূপ যে বিষয়গুলি, সেগুলি প্রায় সবই attitudal বা মনোভাবগত অথবা Conceptual বা ধারণা গত। এই দৃষ্টি বাধাই মারাত্মক, বিশেষ করে অগ্রগতি ও চেতনা বিস্তারের পথে। এই আলোচনার ফলে ১৯৭৫ এর শেষে পরবর্তী দশ বছর ধরে আন্তর্জাতিক নারী দশক ঘোষিত হয়। আন্তর্জাতিক নারী দশকের প্রথম পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হবার পর ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে এ আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হয়। এই নারী সম্মেলনের প্রাক্কালে জাতিসংঘের রিপোর্টে একটি স্বীকৃতি প্রকাশিত হয়, নারীসমাজের বাস্তব অবস্থাকে স্পষ্ট করে তার মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। এই স্বীকৃতি হল, 'Women constitute half the world's population perform namely two thirds of its work hours, receive one

tenth of the world's income and less than one hundredth (1%) of the world's property.'

জাতিসংঘের রিপোর্টে প্রকাশিত এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র পৃথিবীতেই নারীসমাজের সামনে এক নতুন দায়িত্ব এসে পড়েছে। এতদিন ধরে নারীসমাজ তার নিজস্ব জগৎ, অর্থাৎ তার পারিবারিক ভূমিকা নিয়েই বিব্রত ছিলো। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে সমগ্র সমাজে তার সংখ্যাগত স্থান এবং কর্মের স্বীকৃতি ও বক্তব্যের এই স্পষ্ট উল্লেখ নারীসমাজকে তার নিজস্ব প্রাপ্য ও উচিত স্বীকৃতি সত্ত্বেও অগ্রসর করেছে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের নারীসমাজ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবে এবং নারীমুখী সাধনে অগ্রসর হবে। এই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক'র একটি প্রধান সার্বজনীন ভাবে স্বীকৃত সংগ্রাম হল শান্তির সংগ্রাম। বিশ্বের প্রধান শক্তিগুলির অস্ত্রসম্ভার বিরুদ্ধে শান্তির বানী প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছেন ইংল্যান্ড গ্রীনহাম কমন্স এ নারীসমাজের অবস্থান আন্দোলন, ইউরোপের ফ্রেন্সের নির্মাণের কারখানার সামনে অবস্থান আন্দোলন, কানাডার অস্ত্রনির্মাণ কারখানার কাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন, এবং ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক কর্মীদের গৃপ্ত হত্যা এবং গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে মার্কসদের নীরব অবস্থান।

এই শান্তি সংগ্রামের পরেই যে বিশ্বগুলি প্রধান হয়ে উঠেছে, তা হল কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বিভেদ ও মার্কসদের কাজের স্বীকৃতি আদায়। সমান কাজের জন্য সমান মজুরী আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার সর্বসম্মত ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও এই নীতি সর্বত্র মেনে নেওয়া হচ্ছে না। সর্বোপরি পরিবারের চৌহদ্দিতে নারীর সম্মান ও গৃহকর্মের স্বীকৃতির অভাব। পারিবারিক সমস্যাগুলিকে সামাজিক সমস্যা থেকে আলাদা করেই এতকাল দেখা হচ্ছিল। কিন্তু দেখা গেছে যে পরিবার নামক সংস্থাটির মধ্যে নারীর স্বীকৃতির চেহারাটি সামাজিক ক্ষেত্রে তার স্বীকৃতির প্রধান নিয়ামক। বর্তমানে সেজন্য পরিবারের মধ্যে নারীর স্থান নিয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। সমাজতন্ত্র স্থাপনের পর যে ধারণা করা গিয়েছিলো যে, শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে নারীর অধিকারের ক্ষেত্রও প্রসারিত হবে, সে ধারণা কখনো সার্থক হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তার সামগ্রিক সমাধান হয় নি। আজও পরিবারে নারীর স্থান দ্বিতীয় স্তরে। সমাজতান্ত্রিক দেশেও এক্ষেত্রে সার্থক সমাধান কতখানি হয়েছে, তার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট তথ্যাদি নেই। তুলনামূলক ভাবে ধনতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে সমাজে ও পরিবারে যে স্থান দেওয়া হয়, তাতে তার ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ক্ষমতা কম হয়ে থাকে। তার পরিচয় তার বোবন ও সৌন্দর্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে

ধাকে। নারীকে তার নেহের আকর্ষণীয়তার জন্যই বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়ার সর্বজনীন প্রচেষ্টা। ক্রমশঃ জনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে তাকে বিশেষ এক ভোগ্যপন্য রূপে উপস্থাপিত করেছে। বিগত ষাটের দশক থেকেই বিজ্ঞাপন। এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে নারীদেহ। এই অবস্থার বীজ প্রথম উদ্ভূত হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। যখন যুদ্ধস্থান দেশগুলি Total war এর জন্য অসংস্কারীকৃত, সৈনিকদের মনোও মরিয়া মনোভাব। এই মনোভাবই পরে মনোবিকারে পরিণত হয়ে নারীদেহের প্রতি এক বিকৃত আসক্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে।

একদিকে পৃথিবীর একপ্রান্তে সমাজতান্ত্রী রাষ্ট্রের সমবর্তন ও সমানাধিকার অন্যদিকে পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে জনতান্ত্রী রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ উপনিবেশ না হলেও কার্ণাট ফ্রী ট্রেড জোন এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক গোষণ এবং প্রচার মাধ্যমগুলির মাধ্যমে নিরন্তর নারী উপচারের মাহাত্ম্যবর্ণনা। এই দুই ধারায় নারীসমাজের জীবন প্রবাহিত হচ্ছে, এরই সঙ্গে সঙ্গে চলছে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত নৈরাজ্য।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে women's lib বা নারীমুক্তির আন্দোলন দেশভেদে নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কারাংগততার বালি হওয়া মেয়েরা আন্দোলন করছেন, মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে চলছে পর্দাপ্রথা, বহুবিতাহ এবং সম্পত্তির অংশ গ্রহণের অধিকার নিয়ে আন্দোলন। এছাড়া সারা পৃথিবীতেই চলছে নারীর গৃহকর্মের মূল্যায়ন। যে প্রমশক্তি গৃহকর্ম ব্যয় হচ্ছে, তার কোনো স্বীকৃতি নেই অথচ দেশের সামগ্রিক প্রমার্ভানরোগের হিসাবে বিবাহিত জীবনে পরিবারে ব্যয়িত নারীর প্রমশক্তির কোনো হিসাবই করা হয় না।

আন্তর্জাতিক নারীদশকের সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে ১৯৮৫ বৎসরে। জুলাই মাসে নাইরোবি শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এই দশকের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয়। যে-সরকারী সম্মেলনে প্রায় পনেরো হাজার মহিলা যোগদান করেন। এক হাজারেরও বেশী আলোচনাচক্র হয় এবং পৃথিবীর সমস্ত অংশ থেকেই মেয়েরা যোগ দেন। সরকারী সম্মেলনে ৩ হাজারেরও বেশী প্রতিনিধি যোগদান করেন। ৬২ ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনার মধ্য দিয়ে এক আন্তর্জাতিক পারিকল্পনা নেওয়া হয়। এই প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে নারীর গৃহকর্মের স্বীকৃতি এবং সরকারী পারিকল্পনায় তার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করার জন্য দাবি; দেশ ভেদে ভিন্ন হলেও যেগুলি সাধারণ শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত সমস্যা সেগুলির যথাযথ সমাধানের

দাবি, বিশ্বশান্তি স্থাপন এবং সর্বাঙ্গীণ নিরস্ত্রীকরণের দাবি, এগুলিই প্রধান। এছাড়াও এতদিন পর্যন্ত নারী আন্দোলন নিত্যরূপেই সীমাবদ্ধ ভাবে ছিল, এখন তাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে প্রসারিত করার জন্য বিপুল আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে। সামাজিক ভিত্তাসূচক চেতনার বিরুদ্ধে (discrimination) ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবিতে, পুরুষ শাসিত সমাজের শৃঙ্খলাবদ্ধ অস্তিত্ব থেকে মুক্তির দাবিতে, এবং ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের বিপদ বেন আর কোনো দিন পৃথিবীর জলবায়ুকে বিধিবে না তোলে তার দাবিতে, সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে ও সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংযুক্ত হবার দাবিতে নারীমুক্তি আন্দোলন অগ্রসর হয়েছে নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে। প্রস্তুতি শূন্য হয়েছে নতুন এক বিশ্বব্যাপী ভাগিনী সংঘের সামগ্রিক অস্তিত্বের, যেখানে আছে শান্তির আশ্বাস, সহজ, সুস্থ, স্বাধীন মনন ও জীবনের আশ্বাস।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও আদি-যুগের দুই বিপ্লবী

জীবন যুদ্ধোপাধ্যায়

বাংলা তথা সমগ্র ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম বসু দু'টি অবিস্মরণীয় নাম। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল বিহারের মজফ্ফরপুরে তাঁদের দ্বারা নির্ধিক্ত বোমা সমগ্র ব্রিটিশ শাসককুলকে ভীত-সংশ্লিষ্ট করে তোলে। বিপ্লব আন্দোলনের আদি-যুগের এই দুই অগ্রগামী শহীদ যথার্থই গীতার ভাবের ভাবুক ছিলেন।

সমকালীন বিভিন্ন বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের রচনা থেকে শহীদ প্রফুল্ল চাকীর নির্ভীকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, বৈপ্লবিক নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার কথা জানা যায়। ষষ্ঠীন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, প্রফুল্ল চাকীর চোখে-মুখে সবদাই দৃঢ় সংকল্পের ভাব প্রকাশ পেত। তাঁকে দেখলেই মনে হত যে, কোন মহৎ কাজ করার জন্যই যেন তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর দেহ ছিল বলিষ্ঠ, চক্ষু উজ্জ্বল এবং মৃৎমুণ্ডল পরিব্রতা মাথানো।^১ তাঁর আরেক সহকর্মী বিশিষ্ট বিপ্লবী বিভূতি সরকার বলেন যে, প্রফুল্লের নির্ভীকতা, কর্মনিষ্ঠা, দেশসেবার প্রতি যথার্থ আগ্রহ এবং অসাধারণ ষ্টস্টসহিকুতা নেতা ও সহকর্মী সকলেরই মনোবোণ আকর্ষণ করত।^২ প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে, তাঁর মন ও চরিত্র ছিল নিম্নলিখিত। “সে ছিল বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের বালক।”^৩

১৯০৫ সালে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন শুরুর হলে রংপুরেও তার জেট পৌঁছায়। জেলা-শাসক ইমার্সনের আদেশ উপেক্ষা করে স্বদেশী সভায় যোগ দিয়ে যে সব ছাত্র রংপুর জেলা স্কুলকে চিরতরে ‘গুডবাই’ জানান, প্রফুল্ল চাকীও ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এরপরেই স্থানীয় উকীলদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়—ভারতের প্রথম জাতীয় শিক্ষা নিকেতন। প্রফুল্ল চাকী এই জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। জাতীয় আদর্শ ও জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিদের নিরন্তরনাথীনে পরিচালিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে তিনি বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে কাঁপিয়ে পড়েন। প্রধান শিক্ষক ব্রজসুন্দর রায় ছাত্রদের চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত কিছু ছাত্রকে নিয়ে সপ্তাহে দু’দিন গীতা পাঠের ক্লাস খোলেন।^৪ সম্ভবতঃ প্রফুল্ল চাকীর গীতা পাঠের সূচনা

এখানেই। বলা বাহুল্য, জাতীর বিনাশের জ্ঞাপক হিসেবে কখনই তিনি কোন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারেন নি, কারণ বিন্যাসদেবীর আরাধনা অপেক্ষা দেশজননীর মূর্ত্তি সাধনাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। বিন্যাসের ছাত্রাবস্থায় কেবলনাথ প্রকাশ্যে গণ-আন্দোলনেই নয়—জৈতপুরনারায়ণ রায় (পরবর্তীকালে মহানিবাণ মঠের স্বামী মহেশ্বরানন্দ) এবং অবিনাশচন্দ্র রায় পরিচালিত রংপুর গুপ্ত সমিতির কাছেও তিনি ছিলেন অশিরহাব্য। রংপুর গুপ্ত সমিতিতে গীতা স্পর্শ করে দীক্ষা গ্রহণের কোন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না, কারণ এই সমিতির অন্যতম সদস্য সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে, নিজের বুক কেটে তার রক্ত দিয়ে একটি প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করাই ছিল সমিতিতে প্রবেশের আনুষ্ঠানিক নিয়ম। রংপুরের নলিনী কান্ত গুপ্ত (পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের শ্রীঅরবিন্দ আগ্রমের সম্পাদক) জানান যে যথারূপে কালীর পটের সম্মুখে বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করে তিনি অশ্রমশ্রেণী দীক্ষিত হন। সূত্রস্বয়ং রংপুর গুপ্ত সমিতিতে যে গীতা স্পর্শ করে দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল না—তা সূচনিকৃত।

১৯০৭ সালে বারীন্দ্র কুমার ঘোষের আহ্বানে প্রফুল্ল চাকী মুরারীপুকুরের বাগান বাড়ীতে যোগ দেন। প্রথমদিন বারীন্দ্রকুমার তাঁকে বলছিলেন যে, বিপ্লবী দলে দেহ-মন-প্রাণ কিছুই তাঁর নিজস্ব থাকবে না, সমস্ত বাঁচন কেটে অতীতকে ভুলতে হবে এবং প্রতিষ্ঠা যশ বা গৌরব অর্জনের জন্য কোন কাজ করা যাবে না। তিনি হাসিমুখে উত্তর দিয়েছিলেন যে, এসব আঁত ছোট কথা—সংঘের আদেশে যে কোন সময় তিনি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। বিপ্লবী নগেন্দ্রকুমার গুহরায় লিখছেন—“শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রকৃত শিক্ষা তিনি লাভ করিয়াছিলেন মুরারীপুকুরের তপোবনে।” আদিযুগের মহান বিপ্লবীদের সাক্ষিধো নিষ্কাম কর্ম, ত্যাগ, ভাগবত সন্ন্যাস ও আত্মোৎসর্গের শুদ্ধ পরিবেশে এখানেই তাঁর বিপ্লবী জীবন গড়ে উঠতে থাকে। ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে তিনি কলকাতা থেকে অগ্রজ প্রতাপচন্দ্র চাকীকে লিখছেন—“আমার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না, আমি ভালই আছি। আর ব্রহ্মচর্য নির্যাছি। আমি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করি, আর পরমানন্দে দিন কাটাইতেছি।” অগ্রযুগের দুর্ধর্ষ বিপ্লবী এবং পরবর্তীকালের বিখ্যাত জগদগুরু সত্যানন্দ পরমহংস পরিব্রাজকের লেখা থেকে জানা যায় যে, “প্রফুল্ল চাকী ছিলেন একজন চরিত্রবান ব্রহ্মচর্য-পরায়ণ সাধক যুবক।.....বোম্বার বাগানে নীরবে সাধনা করিয়া, আশ্রম ও দেহ-বুদ্ধির নাশ করিয়া, স্বদেশ ও স্বধর্মের জন্য, ঈশ্বর ও মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে সাধকদের নীরব

চেষ্টা চলাছিল প্রফুল্ল চাকী সেই সাধকগণের একজন। সাধনাতে প্রফুল্ল খুব আগ্রসর হইয়াছিলেন। আঁব গাছতলা লিচু গাছতলা ছিল আমাদের সাধনার স্থান। কম্বল বা কুশাসন, কেহবা সংবাদপত্র আসন করিয়া লইয়া তাহার উপর বসিয়া সাধনা করিতেন। তখনকার আহাৰ-বিহার, চাল চলন, খাদ্য সবই ছিল আমাদের সার্বিক রকমের।... ..শয়ন ছিল কম্বল মেঝে-লোমের, বালিশ ছিল বই বা হাত বাহু। পাঠা—নিভা পাঠা পদ্মভক্তের মতো ছিল গীতা ও চণ্ডী, উপনিষদ্।... ..প্রফুল্ল চাকী সাধনা করিতে করিতে এমন মগ্ন হইয়া যাইতেন যে অনেক সময় থালা মারিয়া তাঁহাকে উঠাইতে হইত। তখনকার বোমার মামলার আসামীদের অনেকের অবস্থাই এ রকমের ছিল।”^{১১}

রাস্তাকুমারের লেখা থেকে জানা যায় যে, প্রফুল্ল চাকী ছিলেন ব্রহ্মচারী, নিরামিষাহারী, যোগনাথনার একনিষ্ঠ সাধক ও মৃত্যুভয়হীন বীর। বাগানে তিনি নিয়মিত গীতা ও উপনিষদ পাঠ করতেন।^{১২} বিভূতি সরকারের লেখা থেকে জানা যায় যে, প্রফুল্ল চাকী বাগানে গাছে উঠেও গীতা পাঠ করতেন।^{১৩}

গীতা যে তাঁর ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল এ সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই। নিষ্কাম কর্ম, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং আত্মোৎসর্গের আদর্শ সবই তিনি পেরোছিলেন গীতা থেকে। গীতার আদর্শই তাঁর প্রাণে জুগিয়েছিল আত্মসমর্পণ ও মন্ত্রগদ্যপুত্র অসাধারণ শক্তি এবং বারংবার বিপদসংকুল পথে মৃত্যুর মুখে কাঁপিয়ে পড়ার সাহস ও প্রেরণা। উল্লাসকর দন্ত বলেন যে, সাহসিক ও বিপদসংকুল কাজের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তিনি সর্বদাই উন্মূখ হয়ে থাকতেন।^{১৪} বাংলার নিৰ্বাসিত বৈদ্যবী শ্রীঅমর নন্দীর কাছে প্রফুল্ল সম্পর্কে

তার জ্যেষ্ঠা সহোদরা শ্রীমাতা কুমুমকামিনী দেবীর স্বামী হেমচন্দ্র মজুমদারের একদিনের ঘটনার বিবৃতি থেকে তাঁর ওপর গীতার প্রভাবের কথা জানা যায়। হেমচন্দ্র বলেছেন—“আমি ঐ ঘরটার বসে আছি, প্রফুল্ল এল। দু’টি একটি প্রশ্ন ও সামান্য কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সেদিন হঠাৎ গীতার প্রশ্ন উঠল। আমি ভাবছিলাম, ছেলেমানুষ, ও আবার গীতার আলোচনা আমার সঙ্গে কী করবে? কিন্তু আমার ধারণায় যে কত বড় ভুল ছিল, সেদিন বুঝলাম। প্রফুল্ল ধীরভাবে গীতার আলোচনা আরম্ভ করল। বিশেষতঃ অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম কয়েকটি শ্লোকের সে এ রকম সুন্দর ব্যাখ্যা করে যেতে লাগল, যে ঘটনার পর ঘটা সেই আলোচনার কেটে গেল।... ..আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছি। প্রফুল্ল আত্মবিস্মৃত হয়ে বলে চলেছে। কথা শুনতে শুনতে আমার চোখের সামনে প্রফুল্লের জীবনের একটা অংশের আবরণ যেন খসে পড়ল। বুঝতে

জীবনে একটা কঠোর ব্রত ও গ্রহণ করেছে। সে ব্রত দেশের সেবা। দুঃসহ কষ্টবোধ তার সে নীরবে বহন করেছে। অস্তুর ওয় শক্তি যোগাচ্ছে গীতার ধর্ম।” কিছুক্ষণ পর আবার তিনি বললেন—“মনে কেমন একটা অশান্তি আশঙ্কার ভাব দেখা দিল, ওকে বললাম, ‘প্রফুল্ল যা কর খুব ভেবে চিন্তে করবে।’ ও হেসে উত্তর দিল,—‘এই ত’ বললাম, সব এর মধ্যে ভুলে গেলেন, এখনি ত বলাচ্ছিলাম, আমি যা করব তা কি সত্যিই আমি করব, না আমাকে দিবে করিয়ে নেওয়া হবে? আমি কি আমার কর্মের কর্তা? ‘যথা নিযুক্তহাষি তথা করোমি—’ ভগবান যা করাবেন তাই করব।”^{১১} বলা বাহুল্য, এই ঘটনা প্রফুল্লের আত্মত্যাগের ঠিক দু’মাস আগের।

বারীপেত্রের আহনানে অরবিন্দ ঘোষের যোগ সাধনার গুরু মারাতী সম্যাসী লেলে মহারাজ ১৯০৮ সালে বাংলার আসেন। মুরারীপুকুর বাগানে সাধক প্রফুল্ল চাকীর প্রতি তিনি খুবই আকৃষ্ট হন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হরিন্বারে কৈয়ার উদ্যোগ করেন। এ ব্যাপারে প্রফুল্ল এবং দলনায়ক বারীপেত্রের কোন আপত্তি ছিল না। বিয়বী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাক-পথ থেকে কৌশলে প্রফুল্লকে ফিরিয়ে আনেন। তাঁর অন্তর্দানে লেলে মন্তব্য করেন যে, কোন বাস্তব নিষ্ঠুরই তাঁকে বিপথে নিয়ে গেছে। পরে সব শুনে প্রফুল্ল বলেন—লেলের সঙ্গে লেলে তিনি পথভ্রষ্ট হয়ে দেশসেবা থেকে বঞ্চিত হতেন।^{১২} বলা বাহুল্য, দেশই তাঁর ঈশ্বর, ভগবৎ—সাধনা দেশসেবার একটি অঙ্গমাত্র। ‘সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকম্ শরণম্ ব্রজ’—দেশমাতাই তাঁর একমাত্র আরাধ্যা—এই মাতৃসাধনার জন্যই ব্রংপুর্ থেকে তাঁর মুরারীপুকুরের বাগানে আগমন। এখানেই চলছে জীবন মৃত্যুর সাধনা। দেশহিতে এই মরণকে বরণ করাই তাঁর কামনা। গীতা তাঁকে দিয়েছে মরণকে বরণ করে মৃত্যুঞ্জয়ী হবার শিক্ষা—উন্মুখ হয়ে বারংবার তিনি ঝাঁপ দিয়েছেন মৃত্যুর তরঙ্গে, দীর্ঘ অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি পেয়েছেন মৃত্যুকে সুনিশ্চিত করার শিক্ষা। মৃত্যু মানে তো দেহান্তর গমনমাত্র—আত্মা তো অমর, অচ্ছেদ্য, অদ্রাব্য। মুরারীপুকুর বাগানে পিষ্টল হাতে নিয়ে তিনি প্রায়ই বলতেন—“ধরা পড়লে আমি কিন্তু বেঁচে থাকতে চাইব না, পদাঙ্গের অত্যাচারও সহ্য করব না, কিংবা স্বীকারোক্তির প্রলোভনও কাছে আসতে দেব না—সেখ, এই রকমে দেব নিজেকে শেষ করে”—বলে মৃত্যুর ভেতর পিষ্টলের নলটা ঢুকিয়ে টিগারে চাপ দিতেন। বলতেন—“এই রকমটাই Sure, অন্য রকমে অনেক সময় শুধু নিজেকে আহত করা ছাড়া বেশী বিপদ হয় না—কিন্তু আহত হয়ে বাঁচাই ও বেশী বিপদ।”^{১৩} বলা বাহুল্য, মজুমদারপুর্বে মল্লানন—ও

বোমা বিস্ফোরণের পর ১৯০৮ সালের ২রা মে মোকামাঘাট স্টেশনে এভাবেই ভীষ্মের মত শ্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছিলেন বাংলার দর্শীচি উনিশ বছরের গীতাব্যারী ও গীতার নিস্কাম কর্মের আদর্শে উদ্ভূত বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী। আর কুদিরাম?

আঠার বছরের বীর তরুণ কুদিরামের জীবনে গীতা স্বয়ং মৃত্যু হয়ে উঠেছিল। বাল্যে পিতা-মাতাকে হারিয়ে দূরত্ব স্বভাবের কুদিরাম বেশ-জ্ঞানীকেই আপন করে নিয়েছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন যে, বাল্যকাল থেকেই তাঁর “পরম ও একান্ত নির্ভর” ছিলেন “সর্বোপনিষদ সোম্ভা গোপালনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।” ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে তিনি তাতে কাঁপিরে পড়েন। এ সময় মেদিনীপুর শহরে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বাধীন ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও হেমচন্দ্র দাস পরিচালিত গুপ্ত সমিতিতেও তিনি দীক্ষিত হন। এই সমিতিতে গীতা স্পর্শ করে দীক্ষিত হতে হত।^{১২} সেখানে গীতা, স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী ও নানা বৈদ্যবিক সাহিত্য পাঠ তাঁর বিপ্লবী চেতনাকে নানাভাবে সম্বীর্ণিত করে। স্বদেশী আন্দোলন, মিছিল, পিকিটিং, আত্মের সেবা প্রভৃতি কাজে তিনি ছিলেন সর্বগ্রাস্য কর্মী। স্থানীয় নেতাদের কাছে তিনি অপরিহার্য। স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক অগেই ছুকেছে। দিদি অনুদ্ভূপা দেবীর নামে একটি চিঠি লিখে রেখে তাঁর আশ্রয়স্থল ভূমীপার্শ্ব গৃহ থেকেও একদিন তিনি উধাও হন। চিঠিতে লেখা— “দিদি, আমার ধারা সহজ প্রথার সসোর করা সম্ভব হইবে না। পড়ানু করার ইচ্ছা আমার নাই।.....আমি সম্যাস অবলম্বন করিলাম। ভারতের অভ্যন্তরে দিকে দিকে ভ্রমণ করিব। আত্মের বেদনা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিব।”^{১৩}

মাসখানেক এক পরিপূর্ণ কৃষক পরিবারে কাটের কুদিরাম আবার দিদির আশ্রয়ে ফিরে এলেন। এ সময় তিনি এক পরিবর্তিত মানুস—সাংসারিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন, আত্মীয় স্বজনদের প্রতি পূর্বের সেই আকর্ষণ আর নেই। তাঁর সময় কাটে গীতা-চন্দী প্রভৃতি ধর্মপুস্তক পাঠ ও স্বদেশী আন্দোলন সংক্রান্ত কাজে।^{১৪} স্বদেশী আন্দোলনকালে তিনি স্বদেশী প্রচারের উদ্দেশ্যে ভগবানপুর থানা নিবাসী কীরোদনাথ ভূঞার সঙ্গে কাঁথি, তমলুক ও উড়িষ্যার কিছু অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। এ সময়ও নিত্যব্যবহার্য কিছু জিনিষপত্রের সঙ্গে তিনি গীতা নিতে ভোলেন নি। কুধা-ভুলা, পথভ্রমণ সত্ত্বেও তাঁর মূণ্ডে আনন্দের এক অনিবর্তনীয় জ্যোতি। কীরোদনাথ ভূঞার বিবরণের ওপর ভিত্তি করে তাঁর জীবনীকার ইশানচন্দ্র মহাপাত্র লিখেছেন—“ক্রান্তিহীন স্রাজ্জহীন

যেন এক ভয়ঙ্কর নিভাঁজ সৈনিক জয়যাত্রার পথে সর্ববিধ অন্তরায় ও বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া অভিনব অভিযানে অগ্রসর হইতেছেন।”^{১২১}

১৯০৮ সাল—জরাজীর্ণ নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী দল কলকাতার প্রধান প্রেসেডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিলেন। নিরাপত্তার তাগিদে সরকার তাঁকে বিহারের মজফ্ফরপুরে বদলী করলেন। বিপ্লবীরা এতেও শান্ত হলেন না—প্রফুল্ল চাকী ও মোদীনীপুরের কুদিরাম বসুকে কিংস্‌ফোর্ড হত্যার জন্য মজফ্ফরপুরে পাঠান স্থির হয়। মোদীনীপুরের মৃগুবোড়িয়া অজলে প্রচার কার্যে ব্যাপ্ত কুদিরামকে মোদীনীপুর শহরে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্বের কথা জানালে তিনি সানন্দে রাজী হন।

তিনি খালি পায়েই চলতেন। মজফ্ফরপুর হত্যাকাণ্ডের করেকদিন পূর্বে মোদীনীপুরের একটি সোকান থেকে তাকে জুতো কিনতে দেখে তাঁর জনৈক বন্ধু ও সহপাঠী পূর্ণচন্দ্র রাউত তাঁকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেছে এবং বিরুদ্ধে দিন জুতো না পরলে চলবে না। পূর্ণবাবু এতে বিস্মিত হন কারণ ইতিপূর্বে কুদিরাম বসুবার একথা বলেছেন যে, তিনি কখনই বিরুদ্ধে করবেন না—এমনকি বন্ধু বাম্ববদেরও তিনি সে রকম পরামর্শ দিতেন। বোভাজের দিন ভোজ দেওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, সেটা সম্ভব হবে না, কারণ তাকে ঘর জামাই হয়ে থাকতে হবে।

মরণ পথে ঘাটা করার আগে কি অপূর্ব রসিকতা! মৃত্যুভয় থাকলে এ জিনিষ কখনই সম্ভব হত না। সেদিন তাঁর কথাবার্তা ছিল খুবই স্বাভাবিক। এছাড়া, পূর্ণবাবু জানতেন যে, কুদিরামের ভগ্নী ও ভগ্নীপতি বহুদিন পূর্ব থেকে তাঁকে সংসারী করার চেষ্টা করতেন। সুতরাং কুদিরামের বিরুদ্ধে সম্পর্কে বন্ধুর মনে আর কোন সন্দেহই রইল না।

মোদীনীপুর ত্যাগের আগে তিনি গুরু সত্যেন্দ্রনাথ বসুর গৃহে আহ্বানাদি করেন এবং তারপর হাসিমুখে মোদীনীপুর স্টেশনে গিয়ে কলকাতাগামী ট্রেন ধরেন। সত্যেন্দ্রনাথের ভগ্নী শৈলবালা বসু বলেন যে, তিনি কুদিরামকে সেদিনের মত হাসি-খুশী ও উৎসাহী আর কখনই দেখেন নি।^{১২২}

১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে আটটার সময় মজফ্ফরপুরে বোমা ফাটল। কিংস্‌ফোর্ড নন—নিহত হলেন দু’জন নির্দোষ ইংরেজ মহিলা। ১লা মে ওয়াশিংটন স্টেশনে খবর পড়লেন ভয়ঙ্কর কুদিরাম। বন্দী ধীরকে ট্রেনে করে মজফ্ফরপুরে আনল হল। তাঁকে দেখবার জন্য দলে দলে মানুষ স্টেশনে ছুটে আসছে। একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে পুলিশ-পারিবেশিত হয়ে বের হয়ে এলেন কুদিরাম। মুখে স্মিত হাসি। ধীর

অচঞ্চল পদক্ষেপে স্টেশনের বাইরে অপেক্ষমান একটি ফিটন গাড়ীতে গিয়ে তিনি উঠলেন। অপেক্ষমান জনতার উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বললেন— ‘বন্দেমাতরম’। ১০১৫ বঙ্গাব্দ ২৪শে বৈশাখের (৭ই মে, ১৯০৮) ‘সঙ্গীবনী’ পত্রিকা লিখেছে—সম্ভার সময় কুদিরামকে লইয়া তিনি (পুর্লিশ সুপারিটেণ্ডেণ্ট) মজুমদারপুরে ফিরিয়া আসিলেন। তাহাদের জন্য স্টেশনের বাইরে একখানা ফিটন গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। কুদিরাম দ্রুত পদে সহাস্য বদনে গাড়ীতে আরোহন করিল। কুদিরাম উচ্চৈঃ স্বরে বন্দেমাতরম বলিতে লাগিল—গাড়ী তাড়াতাড়ি স্টেশন হইতে চলিয়া গেল।” ইয়েরেজ সম্পাদিত, ‘স্টেটসম্যান’ (২৫/৫/১৯০৮) লিখেছে—“The Railway station was crowded to see the boy. A mere boy of 18 or 19 years old, who looked quite determined. He came out of a first class compartment and walked all the way to phaeton, kept for him outside, like a cheerful boy who knows no anxiety..... On taking his seat the boy lustily cried Bandemataram.

ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যানের (H. C. Woodman) কাছে প্রবৃত্ত বিবৃতিতে তিনি স্পষ্টই জানালেন যে, অত্যাচারী কিসেফোর্ডকে হত্যার জন্যই তিনি এসেছিলেন। মজুমদারপুরের উকীল এবং ‘বেঙ্গলী’ পত্রিকার সংবাদদাতা শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন যে, পরের দিন ডিষ্ট্রিক্ট-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উডম্যান সব বাঙ্গালী উকীলকে তার একলাসে ডেকে পাঠান। সেখানে হাজির হয়ে তিনি দেখলেন যে, ‘কাঠগড়ার দাঁড়াইয়া রহিয়াছে একটি ১৫/১৬ বছরের প্রিয়দর্শন বালক। এতদূর বাঙ্গালী উকীল দেখিয়া ছেলোট মৃদু মৃদু হাসিতেছে। কি সুন্দর চেহারা ছেলোটের। রঙ শ্যামবর্ণ, কিন্তু মুখখানি এমনই চিন্তাকর্ষক যে দেখিলেই মেহ করিতে ইচ্ছা হয়। কাঠগড়ার একদিকে পুর্লিশ কলার পাতার কিছুর মিস্টার ও এক ঘটি জল এবং গেলাস রাখিয়া গেল। ছেলোট তাহা স্পর্শও করিল না।”

মামলা শুরু হল। আসামীর পক্ষে কোন উকীল নেই এবং মামলা সম্পর্কে তার কোন উৎসাহও নেই। মামলার তৃতীয় দিনে কিসেফোর্ড জবানবন্দী দিতে এলে কুদিরাম একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ‘সঙ্গীবনী’ (১৯০৮, ১৮ই জুন) লিখেছে—“কুদিরাম এ যাবৎ আদালতের কাজকর্মে কোনরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করে নাই। এখনও মিঃ কিসেফোর্ডকে দেখিয়া উৎসুক্যে নেত্র জাহার দিকে তাকাইতে লাগিল।”

২৫শে মে ম্যাজিস্ট্রেট কুদিরামের মামলা দায়রা আদালতে পাঠালেন এবং ৬ই জুন তার দায়রা বিচার শুরু হল।^{১১} এবার তার পক্ষে উকীল দাঁড়ালেন স্থানীয় উকীল কালিদাস বসু এবং রংপুর থেকে আগত কলকমল সেন, নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী এবং সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী।^{১২}

কুদিরাম আদালতে প্রবেশ করলেন—মুখে সামান্যতম কোন চিন্তা বা চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নেই, চোখে-মুখে বিরাজ করছে অপূর্ব এক জ্যোতি ও প্রফুল্লতাময় প্রশান্তি। বিচার চলছিল এক সপ্তাহ ধরে। এ' কদিন সম্পূর্ণ নিঃশব্দভাবে নিতীক ও উদাসীনচিত্তে তিনি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন। কখনও বা তিনি মৃদু মৃদু হেসে উঠতেন। আবার মাঝে মাঝে ঘুমিয়েও পড়তেন। জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িত এ ধরনের মামলা চলাকালে কোন সাধারণ মানসিকতা-সম্পন্ন আসামীর পক্ষে এ ধরনের আচরণ সম্ভব নয়।

রংপুর থেকে আগত কুদিরামের পক্ষ সমর্থনকারী উকীল সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কুদিরামের সংগে কিছু কথা বলার জন্য বিচারকের অনুমতি প্রার্থনা করেন। আসামীর কাঠগড়ায় সশস্ত্র পুলিশ ও বহু উকীল পরিবৃত্ত হয়ে সতীশবাবু তার সংগে কথাবার্তা বলেন। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিতে গিয়ে 'সঙ্গীবনী' লিখেছে—“কুদিরামের মুখে অন্তর্নিহিত তেজোগম্বীর পরিস্ফুট; তাহার কথাবার্তার কোনরূপ কুঠা বা উষ্মের লেশমাত্র নাই।” (১৮/৬/১৯০৮)। অবিচলিতভাবে তিনি কথাবার্তা বলেছিলেন এবং এর কিছু বিবরণও 'সঙ্গীবনী'-তে প্রকাশিত হয়। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়—“তোমার মনে কোন দ্বন্দ্ব আছে কি?” তিনি স্পষ্টভাবে উত্তর দেন—“না, কিছু না।” জেলে তার সংগে কেমন ব্যবহার করা হয় প্রশ্ন করলে তিনি বলেন—“একরূপ ভালই। জেলের খাবারটা খারাপ, আমার সহ্য হয় না, তাতেই আমার শরীর খারাপ হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর কোন খারাপ ব্যবহার করে না। একটা নিশ্চর্যন ঘরে আমাকে দিন রাত বন্ধ করে রাখে; কেবল একবার স্নানের সময় আমাকে বাহিরে আসিতে দেয়। একা থাকিতে থাকিতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে কোন খবরের কাগজ বা বই পাড়িতে দেয় না—পাইলে বড় ভাল হয়।

প্র—তোমার মনে কোনরূপ ভয় হয় কি?

উত্তর—কথা শুনিলে কুদিরাম হাসিয়া উঠিল। হাসিয়া উত্তর করিল—কেন ভয় করিব?

প্র—তুমি গীতা পড়িয়াছ



উ—হ্যাঁ, পড়িয়াছি।

প্র—তুমি কি জান যে, তোমাকে বাঁচাইবার জন্য রপ্তার হইতে আমরা কয়েকজন উকিল আঁশিয়াছি ?

তুমি ও পুত্রেই তোমাকে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করিয়াছ।

নিভাঁক কুদিরাম মন্তক উন্নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন স্বীকার করিব না ?

সকলে ভাষিত হইলেন। সতীশবাবু বলিলেন—“কুদিরাম, ভগবানকে স্মরণ কর।” (১৮/৬/১৯০৮)।

১০ই জুন বিচারক মিঃ কারনডফ দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করতে উঠলেন। আসামী জেনেই গেছেন যে, তাঁর ফাঁসী হতে যাচ্ছে। এ সত্ত্বেও তাঁর মূখে মৃদু হাসি। মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারিত হল—বন্দী বীর সম্পূর্ণ নির্বিকার ও অবিকল। তিনি আগের চেয়েও প্রফুল্ল। জজ বিস্মিত হলেন—মনে করলেন যে, আসামী বোধহয় দণ্ডাজ্ঞা বুঝতে পারেন নি। তিনি কুদিরামকে জিজ্ঞাসা করলেন—“তোমার প্রতি যে দণ্ডের আদেশ হইল তাহা বুঝিতে পারিয়াছ ?”

‘সজীবনী’ লিখে—“কুদিরাম হাস্যমুখে মাথা নাড়িয়া জানাইল—বুঝিয়াছি।”

কুদিরাম এবার বিচারকে বললেন যে, তিনি কিছু বলতে চান। বিচারক জানালেন যে, সময় নেই। কুদিরাম তখন বললেন—“আমাকে যদি বলিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে যেমা কিরূপে তৈয়ার করা হইয়াছিল, সে কথাটা বুঝাইয়া বলিতে পারি।” (সজীবনী, ১৮/৬/১৯০৮)।

মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কি অপূর্ব রসিকতা ! বিস্মিত বিচারক ! বিস্মিত সারা আদালত কক্ষ !

১০ই জুন মজলিসরপ্তর থেকে অমৃতবাজার পত্রিকার সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে—“এক সপ্তাহ পরে মামলার শুনানী অসাধারণ ঐশ্বর্যের সঙ্গে শুনেন আজ তাঁকে ক্লান্ত ও পান্ডুর মনে হাঁচ্ছিল। দিনের পর দিন মামলা শুনেননি নিভাঁক ও উমাসীনীচন্দ্রে। অন্যান্য দিন তাঁকে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়তে দেখা গেছে। কিন্তু আজ তিনি মাঝে মাঝে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনছিলেন, মাঝে মাঝে যেন একবারেই নির্লিপ্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। জজ যখন এসেসরদের ব্যাপারটা বেশ ভালভাবে বোকাবার চেষ্টা করছিলেন তখন একাধিকবার তাঁকে মৃদু মৃদু হাসতে দেখা গেছে। জজ যখন রিডালডার দু’টি উকালের বর্ণনা দিচ্ছিলেন তখন যেন বেশ কৌতুক বোধ করছিলেন। জজ কুদিরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁকে যে দণ্ড দেওয়া হয়েছে তা তিনি বুঝতে পেরেছেন কিনা। কুদিরাম

মাথা নেড়ে জানালেন—বুকেছেন, বলে মৃদু হাসলেন। তাঁর মৃদু উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং তিনি নিরুদ্ভিষ্মচিত্তে দণ্ড মেনে নিলেন।”^{২০}

মৃত্যু-ভাঙ্কাপ্রাপ্ত আসামী হাইকোর্টে আপীল করতে পারে। কুদিরামের উকীলরা তাঁকে হাইকোর্টে আবেদন করার জন্য ধরলেন—বোঝালেন যে, ফাঁসীর বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। কুদিরামের তাঁর আপীল। তিনি মৃত্যুকেই বরণ করতে চান। মৃত্যু তাঁর কাছে নবজীবন। এই মৃত্যুর গানই তো তিনি গেয়েছেন সারা জীবন—এই গানই তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তিনি তো মাঝে মাঝেই আপন মনে গাইতেন তাঁর সেই প্রিয় গানটি—“মরণ দোলায় দুর্লবি কে রে আর.....।”^{২১}

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের কথা শুনে তিনি বললেন—“চিরজীবন জেলে থাকার চাইতে মৃত্যু ভাল।”^{২২} শেষ পর্যন্ত উকীল কালিদাস বাবুকে খুশী করার জন্যই তিনি আপীলে সম্মত হলেন। বলা বাহুল্য, হাইকোর্টের রায় বেরোল—ছিঁহ হল ১১ই আগস্ট তাঁর ফাঁসী হবে।

ফাঁসীর আসামী হিসেবে তিনি প্রায় একমাস কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। এ সময়েও তাঁর মনের প্রফুল্লতা নষ্ট হয় নি। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত গীতা কথামৃত, মহাভারত, বীক্ষ্যচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী এবং ম্যাগসিনী ও গ্যারিবল্ডীর জীবনী পাঠ করে তাঁর সময় কাটত।^{২৩} ফাঁসীর পূর্বদিন উকীল কালিদাসবাবু মৃত্যুপথ্যার্থী এই বীরের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করতে যান। তিনি দেখলেন মৃত্যুভয়হীন হাস্যোৎক্লেশ এক প্রাণবন্ত তরুণকে। পীড়াবশতঃ সামান্য কৃশ ও বিবর্ণ হলেও “তাহার আখ্যা বিদ্যুৎমাণ্ডল্য হইয়া উঠিয়াছে।” কালিদাসবাবুকে তিনি ‘স্বর্গচিহ্নে’ বলেন—“পুত্রাকালে রাজপুত্র রমণীরা যেমন নির্ভয়ে অগ্নিকুণ্ডে কল্প প্রদান পুত্রকে প্রাণত্যাগ করিতেন। আমিও সেইরূপ নির্ভরচিত্তে প্রাণদান করিব।” কালিদাসবাবুকে তিনি জানান যে, ফাঁসীর পূর্বে তিনি চকুচুঁজার প্রসাদ খেতে চান। (সজীবনী ১৮/৬/১৯০৮)।

১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট ভোর দুটোর কুদিরামের ফাঁসি হল। দৃঢ়চিত্তে হাসিমুখে তিনি ফাঁসীর দড়ি গলায় তুলে নেন। অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছে (১২.৮.১৯০৮) —“Khudiram's execution took place at 6 A. M. this morning. He walked to the gallows firmly and cheerfully and even smiled when the cap was drawn over the head”—আজ সকাল ছটোর কুদিরামের ফাঁসী হয়ে গেল। তিনি দৃঢ় পরাক্ষেপে প্রফুল্লচিত্তে ফাঁসীদণ্ডের দিকে হেঁটে গেলেন—এমনকি মাথার টুপিপাঁট যখন টেনে দেওয়া হল তখন তিনি একটু হাসলেনও।

মজুমদারপুত্রের দুই উকীল—ক্ষেত্রনাথ কল্মষাপাধ্যায় এবং উপেন্দ্রনাথ সেন তাঁর ফাঁসীর সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী উপেন্দ্রনাথ ‘কুঁদিরাম’ শীর্ষক এক রচনার লেখক—“একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলাম, কুঁদিরামকে লইয়া আসিতেছে চারজন পুলিশ। কথাটা ঠিক হইল না। কুঁদিরামই আগে আগে প্রত্যাগে অগ্রসর হইরা যেন সিপাহীদের টানিয়া আনিতেছে। আমাদের দেখিয়া একটু হাসিল। যান সমাপন করিয়া আসিয়া ছিল। শেষে শুনিয়াছি, খুব প্রত্যাগে উঠিয়া যান করিয়া কারাবাসকালীন বন্ধিত লোকলি আত্ম দিয়া ক্রিয়া করিয়া নিকটবর্তী দেবমন্দির হইতে প্রহরী কর্তৃক সংগৃহীত চরণামৃত পান করিয়া আসিয়াছিল। আমাদের দিকে আর একবার চাহিল। তারপর দৃঢ়পদবিক্ষেপে মন্দির দিকে অগ্রসর হইরা গেল। মন্দির উপস্থিত হইলে তাহার হাত দুইখানি পিছনে আনিয়া ব্রজবৃন্দ করা হইল। একটি সবুজ রঙের পাতলা টুপি দিয়া তাহার গ্রীবামূল অবধি ঢাকিয়া দিয়া গলার ফাঁসি লাগাইয়া দেওয়া হইল। কুঁদিরাম সোজা দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে ওদিকে একটুও নড়িল না। উদ্ভ্রম্যান সাহেব ঘড়ি দেখিয়া একটি রুমাল উড়াইয়া দিলেন। একটি প্রহরী মন্দির একপ্রান্তে অবস্থিত একটি হ্যাণ্ডেল টানিয়া দিল। কুঁদিরাম নীচের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল কয়েক সেকেন্ড ধরিয়া উপরের দাঁড়িটি একটু নড়িতে লাগিল। তারপর সব স্থির।”

সে-যুগের বিখ্যাত পত্রিকা ‘প্রবাসী’ লিখছে—“সে মরিয়াছে বীরের মত।” ‘প্রবাসী’ এবং ‘মডার্ন রিভিউ’ পত্রিকার পাতার বিচারাত্মক অবস্থায় কাঠগড়ায় দণ্ডারমান কুঁদিরামের প্রশান্ত ও হাস্যোজ্জ্বল মূর্তি সর্বত্রকে বিস্মিত করে।

মৃত্যুর মৃত্যুমুখি দাঁড়িয়ে এমন বীরত্ববাজক আচরণ, এমন নিষ্পৃহতা, মৃত্যুকে বরণ করার জন্য এমন উদগ্র আকাংক্ষা কোন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আশা করা যায় না। তাই বলতে বাধা নেই যে, অসম-যুগের এই বীরেরা গীতা কেবল কণ্ঠস্থই করেন নি—গীতাকে তাঁরা আত্মস্থ করে জীবন-মৃত্যুর ভেদাভেদের উর্ধ্বে উঠে যথার্থই মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছিলেন। বিপ্লবী নারক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলছেন—“বৈপ্লবিক তরুণ বিপ্লববাদকে ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাই তাহার সাধনা। সে জ্ঞানযোগী নয়, ভক্তিযোগী নয়, সে কর্মযোগী। গীতা বলিয়াছেন—“যোগ কর্মসু কৌশলঃ।” বৈপ্লবিকের যোগসাধনা হইতেছে কর্মযোগ। বৈপ্লবিক দলের বিদেশী আমলের গানের মধ্যে একটি কলি আছে,—“কর্মযোগে জাগি পুরুষের মত, পদসেবারত কর উদ্‌যাপন।” এই কর্মযোগের সাধনার স্বত্ত্ব থাকিয়া আমরা প্রথম যুগে

এক বিশেষত্ব ভারত-অপবাদগ্রন্থ বাংলার, একটি নতুন আবছাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। বিশেষীরা এই মনস্তত্ত্ব ব্যক্তিতে পারেন নাই। এ জন্যই রোনাল্ডসে বলিয়াছিলেন—“What made Bengalee students with bomb in one pocket and Geeta in other, turn into a fanatical Gazi.”

তথ্য নির্দেশিকা

- ১। শহীদ যুগল, নগেন্দ্র কুমার গুহস্বায়, ১৩৫৫, পৃঃ ২৩৬।
- ২। ঐ, পৃঃ ২৪২।
- ৩। শহীদ প্রফুল্ল চাকী, কালীপদ বাগচী, ১ম সংস্করণ, তারিখ নেই, প্রচ্ছদে ডঃ উপেন্দ্রনাথ দত্তের কৃত্তিকা।
- ৪। ঐ, পৃঃ ৩০।
- ৫। স্মৃতিকথা, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, পণ্ডিতেরী, ১২৬২, পৃঃ ২৩০-৬১।
- ৬। স্মৃতির পাতা, ১ম, নলিনীকান্ত গুপ্ত, ১৩৭০, পৃঃ ২৮।
- ৭। শহীদ প্রফুল্ল চাকী, কালীপদ বাগচী, পৃঃ ৪১-৪২।
- ৮। শহীদ যুগল, পৃঃ ১৭৫।
- ৯। ভারতের বিপ্লব কাহিনী, ১ম, হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ১৩৫৪, পৃঃ ৩৭।
- ১০। স্মৃতিকথা, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, পণ্ডিতেরী, ১২৬২, পৃঃ ৩৪৬-৪৮ এবং অগ্নিসিঁড়ি ফুদিরাম, মনোরঞ্জন ঘোষ, ১৩৭৭, পৃঃ ১৭-১৮।
- ১১। শহীদ যুগল, পৃঃ ২৫১।
- ১২। ঐ পৃঃ ২৪৬।
- ১৩। শহীদ প্রফুল্ল চাকী, কালীপদ বাগচী, পৃঃ ৪৭।
- ১৪। শহীদ যুগল, পৃঃ ১৭৬-৭৭।
- ১৫। বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ১৩৭২, পৃঃ ৩৭-৩৯, স্মৃতির পাতা, ১ম, নলিনীকান্ত গুপ্ত, ১৩৭০, পৃঃ ৪১। নির্বাসিতের আত্মকথা (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচ্যাবলী, ১ম, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ১৩-১৪)। স্মৃতিকথা, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, পৃঃ ৩৫০।
- ১৬। স্মৃতির পাতা, ১ম, পৃঃ ৩৬।
- ১৭। ভারতের বিপ্লব কাহিনী, ১ম, হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, পৃঃ ৩৯।
- ১৮। বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, হেমচন্দ্র কানুনগো, ১২২৮, পৃঃ ২২।

- ১৯। শহীদ মুসল, পৃ: ৪৮।
- ২০। ঐ, পৃ: ৪৯।
- ২১। ঐ, পৃ: ৭৯।
- ২২। ঐ, পৃ: ১০২-০৪।
- ২৩। শহীদারের চিঠি, ১৩৫৪, আশ্বিন।
- ২৪। কে প্রথম শহীদ? পুলকেশ দে সরকার, ১৯৮২, পৃ: ১৮৩।
- ২৫। ঐ, পৃ: ১৮৫।
- ২৬। ঐ, পৃ: ২০৯।
- ২৭। শহীদ মুদ্রারাম, ইশানচন্দ্র মহাপাত্র, পৃ: ১৯৮-২৯।
- ২৮। শহীদ মুসল, পৃ: ১২৩-২৪।
- ২৯। অগ্নিশিঙ মুদ্রারাম, মনোরঞ্জন ঘোষ, ১৩৭৭, পৃ: ১১৮ এবং শহীদ মুসল, পৃ: ১১৩।
- ৩০। শহীদারের চিঠি, ১৩৫৪ আশ্বিন।
- ৩১। ভূপেন্দ্রনাথ : ডা: ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনী ও জীবনাদর্শ, সম্পাদনা—
সুনীলকুমার ঘোষ, ১৯৭১, পৃ: ৯২।

‘সাবালটান’ স্টাডিজ’ প্রসঙ্গে

দীপিকা বসু

‘সাবালটান’ ইতিহাসবিদরা তাঁদের মূল প্রতিপাদ্যটিকে সাম্মান্য রেখে ‘সাবালটান’ স্টাডিজের’ তৃতীয়খণ্ড প্রকাশ করেছেন। এই প্রতিপাদ্যটি হ’ল আমাদের দেশে উচ্চবর্গ আর নিম্নবর্গের সম্পর্ক; তাঁদের ভাষায় যে সম্পর্ক হল আধিপত্য আর অধীনতার সম্পর্ক (‘domination and subordination’)। আলোচ্য খণ্ডটিতে নিম্নবর্গের চেতনার প্রকাশ নিয়ে নানা আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে। গান্ধীজি পরিচালিত ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নিম্নবর্গের ভূমিকা থেকে শুরু করে মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ, গুজরাটে আদিবাসী আন্দোলন প্রভৃতি নানা বিষয় সম্মিলিত হয়েছে এই খণ্ডটিতে। এই সব প্রবন্ধের পর্যালোচনা করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। গান্ধীজি পরিচালিত জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধের আলোচনার মধ্যদিয়ে ‘সাবালটান’ ইতিহাসবিদদের ইতিহাস চিন্তার মূল কয়েকটি বিষয়ে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আলোচ্য প্রবন্ধগুলি হল :—

- ১) Gandhi and The Critique of Civil Society by Partha Chatterjee.
- ২) Gandhi as Mahatma : Gorakhpur District, Eastern U P 1921-2 by Shahid Amin.

ও

- ৩) The Conditions and Nature of Subaltern Militancy : Bengal from Swadeshi to Non-Cooperation 1905-22 by Sumit Sarkar.

এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে অবশ্য অধ্যাপক সুমিত সরকারের লেখা প্রবন্ধটিই সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক সেখানে লেখক ‘সাবালটান’ ইতিহাস চিন্তার উত্তরগত অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গী ব্যক্ত করেছেন।

অধ্যাপক পার্থ চ্যাটার্জী তাঁর প্রবন্ধে অতি জটিল বিশ্লেষণ কাঠামোর ফলে গান্ধীজির চিন্তা ও আন্দোলনের যে মূল্যায়নের প্রয়াস করেছেন, তাঁদের অতি পছন্দসই যে ‘Paradox’ উন্মোচন করতে উদ্যোগ নিয়েছেন

তাকে সহজ ব্যাখ্যা করলে বা দাঁড়ায় তা'হল বৃজেরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বৈতত্য, যা আবার গান্ধীজি পরিচালিত আন্দোলনগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আরও সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করেছে। একদিকে যেমন গান্ধীজির রামরাজ্যের পরিকল্পনা, আধুনিক শিল্পায়ন আর রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরোধিতা আর সেই সংগে তাঁর কিছুটা মৌলিক সংস্কারবাদী চিন্তা ব্যাপক কৃষক সমাজের সংস্কারবাদী মানসিকতাকে উদ্দীপ্ত করে তাদের জাতীয় আন্দোলনে সমবেত করেছে, যা হ'ল জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজির সর্বোত্তম অবদান আবার সংগে সংগে এই ব্যাপক কৃষক সমাজ আর শ্রমজীবী জনগনকে বৃজেরা জাতীয়তাবাদের চৌহান্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে তাঁর অহিংস আন্দোলনের অন্তের প্রয়োগ। জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজির এই ভূমিকার মূল্যায়নে, লেখকের দূরূহ বিশ্লেষণ কাঠামো ছাড়া নতুন কিছু বৈশেষ নেই। মার্কসবাদী প্রগতিশীল ইতিহাস চিন্তার গান্ধীজি পরিচালিত অহিংস আন্দোলনের এই বৈতত্য স্বীকৃত।

অধ্যাপক সহীদ আমিনও তাঁর লেখায় এক 'paradox' হাজির করেছেন এবং তা হ'ল গান্ধীজির আদর্শ ও শিক্ষাকে কিভাবে কৃষকরা তাদের নিজেদের মানসিকতার সঙ্গে রাঙিয়ে নিয়েছিল এবং তার ফলে তাদের 'গান্ধীবাদ' প্রকৃত গান্ধীবাদ আর আর্থনিক কংগ্রেসী নেতাদের গান্ধীবাদের উপলব্ধি থেকে ছিল ভিন্নতর। গান্ধীজির অহিংসার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা গড়ে তুলেছিল জনী কৃষক আন্দোলন। কৃষক মনে গান্ধীজির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক গান্ধীজির অলৌকিক মাহাত্ম্য সম্পর্কিত যে বহু গুরুত্ব ও ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা বিশেষ কোতুলল জাগার এবং বিশেষ করে কৃষক সমাজের চেতনায় গান্ধীজি যে আসন দখল করেছিলেন তা উপলব্ধি করতে আমাদের সাহায্য করে। তবে গান্ধীজিকে দেবতার আসনে বসিয়ে কৃষক মনের এই যে অগাধ ভক্তি আর ভালবাসা তার মূল উৎসটি কোথায়—সেই সম্পর্কে লেখকের কোন স্পষ্ট কথা নেই। প্রসঙ্গক্রমে কোথাও একটু আভাস থাকলেও, তারতম্যে ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণআন্দোলন জাগিয়ে তুলেই যে গান্ধীজি নিপীড়িত কৃষক সমাজের মনকে আকৃষ্ট করেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনায় এই ভূমিকার স্পষ্ট কোন স্বীকৃতি প্রবন্ধটিতে নেই। অবশ্য 'সামান্যটোল' ইতিহাসবিদদের ইতিহাস চিন্তার ভঙ্গুগত অবস্থানের এটি একটি বৈশিষ্ট্য। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকার স্থান যেখানে সব সময় গোল; মূল্য হ'ল উচ্চস্বা এবং নিয়ন্ত্রণের সামাজিক বিরোধ।

সুদৃশিত সরকার তাঁর প্রবন্ধে ‘সাবালটান’ ইতিহাস চিন্তার তাত্ত্বিক
কল্পনা ও সিদ্ধান্ত গুলিকেই সমর্থন জানিয়েছেন যদিও তিনি তাদের কিছু
কিছু কোঁক সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে
‘শ্রেণীর’ পরিবর্তে ‘সাবালটান’ শব্দটির ব্যবহার মার্কসীয় ইতিহাস বিশ্লেষণের
বিরোধী নয় (পৃঃ ২৭২-৭৩)। তিনি যদিও মনে করেন যে ‘সাবালটান’
শব্দটির মধ্যে অনেক অস্পষ্টতা আছে তা সত্ত্বেও এই শব্দটির মধ্য দিয়ে
সমাজের মৌল যে সম্পর্ক—domination ও subordination অর্থাৎ
আধিপত্য ও অধীনতার, তা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনিও মনে
করেন যে এই নিম্নবর্গের রাজনীতি তাঁর নিজস্ব মানসিকতা নিয়ে উচ্চ-
বর্গের রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক! কিন্তু আবার সেই সত্ত্বেও তিনি
উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের সম্পর্কের মধ্যে বিরোধিতা ও সংঘাতের দিকটিকে
বাড়িয়ে দেখার যে প্রবণতা কিছু কিছু ‘সাবালটান’ ইতিহাসবিদের আছে
সেই সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন কারণ তাঁর মতে এই সম্পর্ক অতি
জটিল—বিরোধিতা যেমন আছে তেমন আছে সহযোগিতা আর
আনুগত্যও।

অধ্যাপক সরকারের মতে স্বদেশী আন্দোলনের পর্ব থেকে গান্ধীজি
পরিচালিত ১৯২১-২২ সালের আন্দোলনের পর্বে যে সব গণ অভ্যুত্থান
ঘটেছিল খুবই অর্থনৈতিক কারণ দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা যায় না (পৃঃ ২৬৬)।
তিনি অর্থনৈতিক কারণের চেয়েও মনস্তাত্ত্বিক, ধর্মীয় এবং গৃহবের ভূমিকাকে
আরও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে স্বদেশী যুগের
তুলনায় ১৯১৯-২২ এর পর্বে যে প্রবল গণ অভ্যুত্থান ঘটেছিল তার পেছনে
সাংগঠনিক বা আদর্শগত কারণ খুব নগণ্য। আসল কারণ, তাঁর কথায়
‘crucially important’ হ’ল গৃহবের রটনা (পৃঃ ৩০৫-১০)। গান্ধীজি
ঘোষিত স্বরাজ প্রতিষ্ঠার ফলে ব্রিটিশরাজ ভেঙে পড়ার গুরুত্বই এই
অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ। বারে বারে ‘বিশ্বাসঘাতকতা করা সত্ত্বেও গান্ধীজি
যে কৃষক সমাজের ওপর তাঁর কতৃৎ বজার রাখতে পেরেছিলেন, অধ্যাপক
সরকার মনে করেন, গান্ধীজির ধর্মের আবেদন দিয়েই একমাত্র এর ব্যাখ্যা
সম্ভব।

অধ্যাপক সরকার নিম্নবর্গের রাজনীতিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক জগৎ
হলে মনে করেন। তাঁর মতে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন আর ভ্রমজীবী
জনগণের ব্রহ্মী আন্দোলন সমান্তরাল অথচ সম্পূর্ণ পৃথক খাতে প্রবাহিত
হয়েছে বাদের মধ্যে সংমিশ্রণের ঘটনা খুবই বিরল এবং জাতীয়তাবাদী

রাজনীতির সঙ্গে এইসব গণ আন্দোলনগুলির সম্পর্ক সবসময় বেশ কীণ। তা সত্ত্বেও অবশ্য তিনি জনগণের ইতিহাসকে সর্বাঙ্গীন ইতিহাসের (total history) অংশ হিসেবে দেখার প্রয়োজনীয়তার উপ্লেখ করেছেন। এই গণ আন্দোলনগুলির স্বাভাব্য, নিঃস্বতাকে গুরুত্ব দিয়েও সন্মিত সরকার স্বীকার করেছেন যে এই গণ বিক্ষোভগুলি ছিল ইচ্ছাকৃত, বিকিপ্র, কণ্ঠস্বরী যা প্রকৃতপক্ষে দুর্বল, ফলপ্রসূ কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয় নি।

তাহাড়া অধ্যাপক সরকারের আর একটি কথ্য হল কি নিম্নবর্গের আন্দোলন, কি জাতীয় আন্দোলন, এমন কি আধুনিক প্রাথমিক আন্দোলন, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই নিম্নতর চেতনা থেকে উন্নততর চেতনার দিকে ক্রমাগত বিকাশের যে ধারণা অনেকে পোষণ করেন, তাকে ব্যাতিত করা প্রয়োজন (পৃ: ৩১৯-২০)।

‘সাবালটাণ’ ইতিহাসবিদরা অবশ্যই দাবী করতে পারেন যে তাঁরা ইতিহাস বিশ্লেষণের এক নয়া কাঠামো হাজির করেছেন, প্রচলিত ছকটির বদলে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব এক নতুন ছকের উদ্ভাবন করেছেন, এমন কি তাঁরা ইতিহাস বিদ্যার ক্ষেত্রে একটি নতুন ‘স্কুল’ হিসেবে নিজদের প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। তাঁদের এই দাবী নিয়ে আমাদের প্রশ্ন নয়। তাঁদের এই নয়া বিশ্লেষণ কতখানি সঠিক বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস গবেষণার সাহায্য করবে অথবা আরও বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করবে, সেই প্রশ্নও এখানে তুলছি না। আমাদের প্রধান আপত্তি হ’ল তাঁরা যদি এই দাবী করেন যে তাঁদের এই নয়া বিশ্লেষণের সঙ্গে বিজ্ঞান সম্মত মার্কসীয় ইতিহাস বিশ্লেষণের কোন বিরোধ নেই; মার্কসীয় ইতিহাস বিশ্লেষণের কাঠামোর মধ্যেই তাঁদের মতাদর্শগত অবস্থান, তাহ’লে সেই দাবীটি মেনে নেওয়া কঠিন। মার্কসীয় ইতিহাস চিন্তার সঙ্গে তাঁদের এই ইতিহাস চিন্তার মৌল পার্থক্য গুলিকে এই প্রসঙ্গে উপ্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথমত এই প্রশ্ন তুলছি—শ্রেণী ভিত্তিক সমাজের বদলে তাঁরা সমাজকে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ এই দুই খাড়াখাড়ি ভাগে যে ভাবে ভাগ করতে চান তা কি মার্কসীয় বিশ্লেষণের বিরোধী নয়? মার্কসবাদীদের কাছে শ্রেণী হল একটি ঐতিহাসিক ধারণা (historical Category)। সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে, উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে এক একটি শ্রেণী ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। মার্কসবাদীরা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে বুর্জোয়া শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকা স্বীকার করে। একথা সুবিদিত যে দলতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে

উত্তরণের যুগে শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকার ওপর মার্কসবাদ সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। সাবালটাৰ্ণ ইতিহাসবিদরা সমস্ত নিৰ্বাচিত মানুষকে ‘নিম্নবর্গ’ এই একটি Category-র অন্তর্ভুক্ত করে কার্যত শ্রমিক শ্রেণীর এই ঐতিহাসিক ভূমিকাটিকেই নস্যাৎ করতে চান। তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে নিম্নবর্গ এই শব্দটি যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর; এর মধ্যে শুধু নিৰ্বাচিত মানুষের বিভিন্ন অংশ রয়েছে তাই নয়, এমন কি শোষক ও শোষিত এই দুয়েরই অবস্থান রয়েছে। মার্কস, এঙ্গেলস্ ও লেনিন সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে এই ভাবে এক পদবি ভুক্ত করার বিরুদ্ধে বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন।

বিতীর্ণত ইতিহাসের বিবর্তনে অন্যান্য উপাদানগুলির (যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, মনস্তাত্ত্বিক প্রভৃতির) গুরুত্ব স্বীকার করেও মার্কসবাদীরা অর্থনৈতিক উপাদানকেই প্রধান বলে মনে করেন। অন্যদিকে সাবালটাৰ্ণ ইতিহাসবিদরা অর্থনৈতিক উপাদানের এই প্রাধান্যকে সরাসরি অস্বীকার করে মনস্তাত্ত্বিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিষয়কেই ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণে চড়াবৃত্তাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে রায় দিচ্ছেন।

তৃতীয়তঃ স্বতন্ত্র আন্দোলন ও সচেতন আন্দোলনের মধ্যে যে পার্থক্যকে মার্কসবাদীরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন সাবালটাৰ্ণ ইতিহাস চিন্তার সেই পার্থক্যকে, বিশেষ করে, সচেতন আন্দোলনের ভূমিকাকে বেশ ছোট করে দেখানো হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে কৃষক, আদিবাসীদের যে আন্দোলন তা ছিল স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র আন্দোলনেও সচেতনতার উপাদান অবশ্যই থাকে কিন্তু সেই চেতনা অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের ও নিম্নমানের যেখানে সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা, ধর্ম সংস্কার, অলৌকিক ঘটনার প্রভাব প্রভৃতির প্রকাশ ঘটে। স্বভাবতই এই সব বিদ্রোহ হয় ইচ্ছাকৃত বারিকল্প আর তাই এই সব বিদ্রোহের সাফল্যের সম্ভাবনাও সীমাবদ্ধ। মার্কসবাদীরা এই সব স্বতন্ত্র বিদ্রোহের গুরুত্বকে, শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে যথামোগ্য মর্যাদা দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই সব বিদ্রোহকে সাফল্যের পথে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন আরও উন্নতমানের চেতনার। বুল্জেরা জাতীয় আন্দোলনের সমস্ত দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এইসব সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা, ধর্ম সংস্কারের উচ্ছেদ ও তার এই আন্দোলন অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের চেতনার পরিচয় দেয়। আর পরবর্তী স্তরে যখন শ্রমিক শ্রেণী শ্রেণী চেতনার সম্মুখ হয়, তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে কৃষক সমেত সমস্ত নিৰ্বাচিত শ্রেণীকে শ্রেণী সংগ্রামে উৎসাহ করে আন্দোলনের এক মধ্যে সমবেত করে, তখনই এই আন্দোলন তার প্রকৃত লক্ষ্য অর্জন করতে, সমস্ত শোষণের

অবসান করে সামাজিক মর্নির অর্জনে সক্ষম হয়। আমরা বতটা বুঝি এই তো হ'ল মার্ক'সবাদের শিক্ষা। কিন্তু 'সাবালটাণ' ইতিহাসবিদরা সচেতনতার এই ভূমিকাকেই অস্বীকার করতে চান। তাঁরা এইসব স্বতন্ত্রশ্রুত কৃষক আদিবাসী আন্দোলনকে অতি আদর্শায়িত করে তাকে জাতীয় আন্দোলন, প্রাথমিক আন্দোলনের বিকল্প এক স্বতন্ত্র অবস্থানে স্থাপন করতে উদ্যোগ নিয়েছেন। একথা ঠিকই আমাদের মত উন্নয়নশীল কৃষি প্রধান দেশে স্বতন্ত্রশ্রুত কৃষক আদিবাসী আন্দোলনের অস্তিত্ব আজও আছে এবং প্রাথমিক শ্রেণীও তার ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণে এখনও সমর্থ হয় নি। কিন্তু মার্ক'সবাদীদের লক্ষ্য কি এই সব স্বতন্ত্রশ্রুত আন্দোলনকেই আদর্শায়িত করা?—না সেগুলিকে আরও উন্নতভাবে নিয়ে যাওয়ার, প্রাথমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকার তত্ত্বটি ভুলে ধরে প্রাথমিক কৃষক মেট্রীর ভিত্তিতে এক দু'বার আন্দোলন গড়ে তোলার পথ নির্দেশ করা?

সুদৃঢ় সরকার অবশ্য তাঁর প্রবন্ধে এই প্রশ্ন তুলেছেন যে ১৯২০ সালের পর গান্ধীজির নেতৃত্বে পরিচালিত আরও সংগঠিত গণ আন্দোলন এবং বামপন্থী বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক ও ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন নিম্নবর্গের মানসিকতার কোন লক্ষণগণ্য পরিবর্তন সাধন করেছিলো কিনা। কিন্তু তিনি এই প্রশ্নের কোন জবাব দেন নি। ঐ প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি নিম্নমানের চেতনা থেকে উন্নততর চেতনার দিকে জাতীয় আন্দোলন বা প্রাথমিক আন্দোলন ক্রমে আবর্তিত হচ্ছে এই ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করার সুপারিশ করেছেন।

পরিশেষে, 'সাবালটাণ' ইতিহাসবিদরা পরাধীন ভারতে উপনিবেশবাদের সঙ্গে সমগ্র জাতির বিরোধের বদলে দেশের অভ্যন্তরে উচ্চবর্গ আর নিম্নবর্গের মধ্যে সামাজিক বিরোধকেই মূল বিরোধ বলে চিহ্নিত করতে প্রয়াসী। অন্যদিকে মার্ক'সবাদীরা মনে করেন যে পরাধীন ভারতে মূল বিরোধ হ'ল একাত্মিক নির্যাতনকারি জাতি অর্থাৎ ব্রিটেন আর অন্যদিকে নির্যাতিত জাতি অর্থাৎ সমগ্র ভারতীয় জাতির বিরোধ, যে বিরোধের অংশীদার কৃষক, প্রাথমিক, সাধারণ মেহনতি মান্দুকের সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়াও। বুর্জোয়া শ্রেণীর এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা ছিল বলেই তাদের নেতৃত্বে এদেশে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য বুর্জোয়াদের বৈত চরিত্রের ফলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হলেও এই আন্দোলন ছিল আপোষমুখী, সংস্কারবাদী। আবার এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ছিল বলেই হাজার হাজার কৃষক, শ্রমজীবী জনগণ

তাদের নিজস্ব শ্রেণী স্বার্থকে প্রাধান্য না দেওয়া সত্ত্বেও এই জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে ছিল কারণ সাম্রাজ্যবাদী শোষণে তারা ছিল অজ্ঞান।

অবশ্য এই মূল বিরোধের অঙ্কুরে সামাজিক বিরোধের ধারাটি অব্যাহত ছিল। জমিদার, মহাজনদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের বার বার অভ্যুত্থান সেই বিরোধেরই অভিযাত্রি। জাতীয় বুদ্ধোন্নতি নৈরাজ্যের দোদুল্যমানতা, কৃষক শ্রমিক আন্দোলনকে বুদ্ধোন্নতি জাতীয় আন্দোলনের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখায় তাদের যে প্রচেষ্টা তার মধ্যেও রয়েছে এই বিরোধেরই ইংগিত। মার্কসবাদীরা কখনই এই সামাজিক বিরোধকে উপেক্ষা করেন না এবং তাকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু পরাধীন দেশে কোনটি মূল বিরোধ সেটিকে তারা সম্পূর্ণভাবে চিহ্নিত করতে ভুল করেন না।

আমাদের মনে হয়েছে, বর্তমানে গ্রামসির উল্লেখ করা হোক না কেন, পরাধীন দেশ সম্পর্কে “সাবালটাণ” ইতিহাসবিদদের এই বিশ্লেষণ ঔপনিবেশিক প্রভু সম্পর্কে মার্কস এঙ্গেলস লেনিনের বিশ্লেষণের চেয়ে লিও ট্রটস্কীর বিশ্লেষণের (যেখানে জাতির বিরুদ্ধে শ্রেণীকে দাঁড় করানো হয়েছে) সঙ্গেই সঙ্গতি পূর্ণ।

আচার্য ত্রিবেদীর শিক্ষা চিন্তা

দীপিকা মজুমদার

[দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ ও মনীষিরা জাতীয় শিক্ষার স্বরূপ কি হবে তা নিয়ে যথেষ্ট ভাবনা চিন্তা করেছেন। নিম্নোক্ত প্রবন্ধটিতে তারই পরিচয় মিলবে। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন সে যুগের একজন বিশিষ্ট দ্বাদশমত প্রেমী শিক্ষাবিদ। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তদানীন্তন কালের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তিনি তুলে ধরেন। নীচের রচনাটি এই বিষয়কে কেন্দ্র করে লিখিত একটি সংবেদনাত্মক প্রবন্ধ।]

উনিবিংশ শতকে ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা নিয়ে দেশব্যাপী এক আলোড়ন ও আলাপ আলোচনার সূত্রপাত হয়। যে সকল মনীষীদের শিক্ষাচিন্তা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁদের অন্যতম। তিনি সারা জীবন বিদ্যাচর্চার ব্যাপ্ত ছিলেন। শৈশব থেকে ছাত্রজীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীকালে শিক্ষাগ্রহী হিসাবে তিনি আজীবন কাটান। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র ও বিজ্ঞানের শিক্ষক। কিন্তু তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভাবতেন এবং তাঁর এই গভীর ভাবনার ফল তাঁর শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি। নিজের সামাজিক পরিমন্ডলের পটভূমিতে প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থা ও তার দোষগুণ, ভারতীয় শিক্ষার গুরুত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনাগুলি ভারতীয় জাতীয় জীবনের অঙ্গরূপ সম্পদ।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর শিক্ষাচিন্তা যেহেতু তৎকালীন ব্রিটিশ রাজত্বের পারিপার্শ্বিকে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত সেহেতু ইংরেজী শিক্ষার দোষগুণ তাঁর অন্যতম আলোচ্য বিষয়। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পর তখন বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা যে দেশের লোকের খুব বেশী উন্নতি ঘটাতে পারে নি এ সম্বন্ধে তখন বিশেষ মতবৈধতা ছিল না। এ প্রসঙ্গে ত্রিবেদীর বক্তব্য 'এই যে ইংরেজী শিক্ষা থেকে ভারতীয়রা অনেক কিছু শিখছে ও শেখেনেছে। কিন্তু কিভাবে

জানতে হয় ও শিখতে হয় তা আরম্ভ করতে পারে নি। আমরা জানা ও শোনা কথা বলতে পারি, কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে পারি নি। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমরা ভাস্কতে শিখিছি, কিন্তু গড়তে শিখি নি। আমাদের আহ্বারের দ্রব্যসামগ্রী বেড়েছে, কিন্তু পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি ঘটে নি। কাজেই ইংরেজী শিক্ষা আমাদের বাহ্যিক উন্নতি ঘটালেও আভ্যন্তরীণ উন্নতি ঘটতে সক্ষম হয় নি। আমরা বিজ্ঞান শিখিছি, কিন্তু আমাদের বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে ওঠে নি। ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করেও ভারতবাসী ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে পারে নি। আমাদের আত্মসম্মানবোধ ও আত্মমর্যাদা বোধ জাগ্রিত হয় নি। আমরা শূন্য অশ্বভাবে অনাক্রমণ করেছি।

ইংরেজী শিক্ষা এদেশে ফলপ্রসূ না হওয়ার কারণ হিসাবে অনেকে ভারতীয়দের পাশ্চাত্যশিক্ষার অনুপবৃত্ত বলে মনে করেছেন। অনেকে আবার ইংরেজী শিক্ষাকেই দোষবৃত্ত বলে প্রচার করেছেন। গ্রিবেদী এ ধরনের কোন ধারণার প্রপন্ন সেন নি। তিনি এদেশে ইংরেজী শিক্ষার ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানের জন্য ভারতীয় সমাজের মূলে আলোকপাত করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব ও ঐতিহ্যিকতাও স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত ইংরেজী শিক্ষা ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করেছে এবং ভারতীয় জীবনে নতুন আশা ও উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে। নিজস্ব ইতিহাস ও ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলের মধ্যে বসবাসকারী ভারতীয়দের কাছে ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি এক নতুন জগতের বার্তা এনে দিয়েছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য শিক্ষার বৈজ্ঞানিক, ব্যক্তিবাদী ও মননশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রিবেদী সপ্রশংস ও সপ্রস্তু দৃষ্টিতে দেখেছেন। কাজেই তিনি ইংরেজী বিদ্যাকে দারী করেন নি। ভারতীয় চরিত্রের ওপর ও কোন দোষারোপ করেন নি। অন্যত্র এ শিক্ষা সফল হয়েছে, কিন্তু ভারতে এ শিক্ষা সফল না হওয়ার কারণ, গ্রিবেদীর মতে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রণীত শিক্ষা প্রণালীই চ্যুটিদুর্গ। তাঁর অভিমত, ভারতে এ শিক্ষা বেভাবে প্রবৃত্ত হয়েছে তার মধ্যেই গলম থেকে গেছে। ১৯১৭ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার-সাক্ষরকল্পে গঠিত স্যাডলার কমিশনের কাছে তিনি বলেন, “The University of Calcutta is altogether a foreign plant im-
planted into this country belonging to a type that flourished in foreign soil..... The founders of the

new educational system had not the time to study the ideals and methods that were indigenous.”^{১০} তাঁর মতে, ইংরেজী শিক্ষা বিদেশী শক্তি কর্তৃক আরোপিত এবং এদেশের জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে এদেশের স্বভাবসুস্থ সামগ্রী নয়। সেইজন্য এই শিক্ষা ভারতীয় জাতীয় ভাবের সঙ্গে মিশতে পারে নি। আর তাই শিক্ষা এদেশে সাফল্যলাভ করে নি।

তাঁর অভিমত, ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার কেন্দ্র নয়, পরীক্ষা গ্রহণের কেন্দ্র।^{১১} তিনি মনে করেন যে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ দুটি সম্পূর্ণ পৃথক কাজ। শিক্ষার উদ্দেশ্য অমানুষকে মানুষ করা আর পরীক্ষার উদ্দেশ্য অমানুষের মধ্য থেকে মানুষ বেছে নেওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি বহু ছাঁকনি বা চালুনি যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় নামক চালুনিযন্ত্র মানুষ ও অমানুষকে একসঙ্গে ফেলে পরীক্ষা নামক ব্যবস্থা দ্বারা নাড়া দিয়ে মানুষগুলিকে বার করে আনে। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে অনুপমবৃত্তদের বাদ দেওয়ার যন্ত্র। ছাত্রেরা বিভিন্ন জায়গায় লেখাপড়া করে; বিশ্ববিদ্যালয় খালি পরীক্ষাগ্রহণ করে ও তার মান অনুসারে যাদের উপযুক্ত মনে করে তাদের ডিপ্লোমাদান করে। ছাত্রের কাছে এই ডিপ্লোমার অশেষ মূল্য, কারণ তার ভবিষ্যতের চলার পথে এই ডিপ্লোমাই তার জীবিকাকর্ষণের উপায়। সুতরাং ছাত্রের চিন্তাভাবনা পরীক্ষাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধে তার আদৌ কোন আগ্রহ দেখতে পাওয়া যায় না। শিক্ষকের উদ্দেশ্য পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করা। শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষক আদৌ চিন্তিত নয়। কাজেই ছাত্র ও শিক্ষক—তারো দু’টিই প্রকৃত শিক্ষার দিক নয়। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পর্যাবসিন্ময়ের ন্যায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্র এই শিক্ষার ক্রেতা ও শিক্ষক বিক্রেতা। ছাত্র এই শিক্ষার জন্য মূল্য দেয় কারণ এই শিক্ষাই তার কাছে ভবিষ্যতের সম্পদ ও অর্থ-আহরণের ছাড়পত্র। শিক্ষকতাও খুবই মূল্যবান পেশার পরিণত হয়েছে। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কোনরূপ নাড়ীর টান নেই, কোন প্রকার প্রীতিসম্পর্ক নেই। শিক্ষক দলটা বাজলে আপন কর্তব্য সারেন ও হাসাতে বেতন গ্রহণ করেন। যন্ত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে কোন সহানুভূতি বা সম্বন্ধ গড়ে ওঠে নি। কাজেই শিক্ষা যন্ত্রের মতো প্রাণহীন শিক্ষার পর্ষাবসিন্ম হয়েছিল।

টিবেদীয় মতে, এদেশে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা খুবই নিম্নমানের।

এজেন্সী প্রয়োজনীয় উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের অভাবহীন বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা ফলপ্রসূ হতে পারছে না। অন্যান্য দেশে সরকার ও ধনী ব্যক্তিরা বিপুল ব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত করে তোলে। এদেশের ধনী ব্যক্তিরা এরূপ ব্যয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন না আর বিদেশী সরকার ও এ সম্বন্ধে বিদ্বেষিত চিন্তিত নর। ফলে শিক্ষার ব্যবহারের পূর্ণ দায়িত্ব ছাত্রদের ওপর পড়েছে। তারা দরিদ্র ও ব্যবহারবহণে অক্ষম। এই অবস্থার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির অভাব দূর করে কারিগরী ও বিজ্ঞান শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়।

ট্রিবেদীর সময় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ভারতীয় শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ল্যাবরেটরী ও যন্ত্রপাতির দিক থেকে অনুন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বাতিল করে শিক্ষাজগৎকে জ্ঞানাময় করতে চেষ্টা করেছিল। ট্রিবেদী এই প্রচেষ্টাকে artificial selection বলে উল্লেখ করেছেন।^১ তাঁর মতে, কেবল আগাছা উপড়ানোর ব্যবস্থা করে বাগানের শোভা বাড়ান যায় না। ভাল গাছের চারা পুঁতে উচ্চতম সার ও গোবরের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই প্রয়োজনটাই উপেক্ষিত থেকে গেছে।

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষত্রুটি আলোচনার পর ট্রিবেদী শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষার অর্থ মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি, স্বাধীনতা ও পরিপূর্ণতা।^২ বিভিন্ন জায়গায় থেকে কিছু জ্ঞান আহরণই শিক্ষা নয়—শিক্ষার্থীর মাঝে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে এবং আপন চেষ্টায় সে যাতে সমর্থ হয় তা দেখা প্রয়োজন। প্রকৃত শিক্ষা স্বাধীন ও আনন্দময় পরিবেশে শিশুকে স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির উন্নতির পথ প্রশস্ত করে। ট্রিবেদীর অভিমত, শিশুকে গতিহীন যন্ত্রের মতো মনে করলে চলবে না এবং তাকে কারাগারের নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ করলেও হবে না। গাছের অঙ্কুর যখন মাটি ভেব করে বের হয় তখন তার চারদিকে লোহার জাল পেতে রাখলে ও তাকে স্বাধীনভাবে মাথা তুলতে না দিলে তার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু অঙ্কুরটিকে খোলা হাওয়ার উদ্দেশ্যে আকাশের নীচে স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিলে সে নিজেই নিজের আহাৰ সংগ্রহ করে ধীরে ধীরে শক্ত বৃক্ষে পরিণত হয়। শূন্যমাঠে শৈলশ্রাব্য অঙ্কুরটিকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন। ট্রিবেদী মনে করেন যে শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। শিশুর মনে যে সকল শক্তির অঙ্কুর দেখা দেয় সেগুলিকে একেবারে আবদ্ধ ও সংযত না করে তাদের স্বাধীনভাবে স্বাভাবিক বৃত্তির সুযোগ দেওয়া দরকার। যখন

শিশু ধর্মসম্বন্ধে পৃথক ধারিত হয় তখনই কেবল তাকে নিরস্তিত করতে হবে। তিনি বলেছেন যে শিক্ষক সব সময় বেত হাতে ছাত্রের স্বাভাবিক চিন্তা-বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করলে শিশুর শিক্ষা ব্যাহত হবে। শিশুকে স্বাধীনভাবে জগতে বিচরণ করার সুযোগ দিতে হবে। খুব কড়া শাসনকে তিনি কখনই সুনজরে দেখেন নি। তাঁর মতে, শিশু নিত্য নতুন সামগ্রী স্বয়ং চেষ্টা করে দেখবে ও তাতে তার ইন্দ্রিয়, স্মার, ও পেশী বৃদ্ধি ও পুষ্টিলাভ করবে। শিক্ষক নিজে শিক্ষার্থীর হয়ে দেখবেন না, তাকে দেখিয়েও দেবেন না। শিক্ষকের শৃঙ্খল দেখা প্রয়োজন তার পাকস্থলী যেন কথোপকথন খাদ্যসামগ্রী পায়—খাদ্যাভাবে নিষ্কর্মা ও অকাজো না হয়, আবার খুব বেশী খাবারের ভারে অবসন্ন হয়ে না পড়ে। তিনি বলেছেন, সে নিজে দেখবে শুনবে, নিজে স্পর্শ করে পরীক্ষা করবে এবং পরীক্ষা করে ধীরে ধীরে বিবিধ পদার্থের সম্বন্ধ নিরূপণ করতে থাকবে। ভুলবশত সে বহুক্ষণের মধ্যে এক্ষণ দেখে বা সাদৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য দেখে প্রভাবিত হতে পারে। তখন স্নেহ ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা তার মনে উৎসাহ, আগ্রহ, ও আশা সঞ্চার করতে হবে। বার বার প্রভাবিত হতে হতে অবশেষে সফলতালাভ করে সে পরমানন্দ অনুভব করবে। ত্রিবেদী মনে করেন যে এইরূপ শিক্ষা শিশুকে শারীরিক মানসিক ও নৈতিক বলে বলীয়ান করবে ও তার মনুষ্যত্বের স্বর্গীয় ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে সহায়ক হবে। শিক্ষাকে সফল করতে হলে সর্বাত্মক প্রয়োজন শিক্ষার্থীর প্রতি সন্তরিতা ও সহযোগিতার মনোভাব। ডিসিগ্লিনের নামে অহেতুক ভয় ও নৈরাশ্য সৃষ্টি করলে তার মানসিক উৎকর্ষবিধান অসম্ভব হয়ে পড়বে।

ত্রিবেদীর মতে, শিক্ষা শৃঙ্খল স্বতন্ত্র হলেই চলবে না, জাতীয় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।^{১২} শিক্ষা জাতীয় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে শিক্ষিতদের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতির প্রতি অনুরাগ জন্মায়। তাঁর মতে, যে শিক্ষাপ্রণালী জাতীয়তার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় তা নিত্যকাল অস্বাভাবিক এবং বা অস্বাভাবিক তা থেকে দ্বারী ফললাভের সম্ভাবনা অল্প। বৃগবৃগান্তর ধরে যে জাতীয় স্বভাব বর্জিত, পুষ্টি ও বিকশিত হয়ে আসছে তার থেকে একেবারে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করলে শৃঙ্খল শিক্ষাপ্রণালী কেন, কোন প্রণালীই ফলদায়ক হতে পারে না। তিনি মনে করেন, কিশোর থেকে যে শিক্ষাপ্রণালী সশরীরে আমাদের দেশে আমদানি করা হয়েছে তা আমাদের জাতীয় ভাবের সঙ্গে মিশতে পারে নি। তাই সে শিক্ষাপ্রণালী এদেশে স্বাভাবিক ফল দিতে পারে নি।

অতীতকালীন ভারতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা দেশের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন দেখে চন্দ্রবেদার সুপ্রাচীন ভারতীয় বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন এবং টোল ও চতুষ্পাঠীগুলির কথা অত্যন্ত প্রকার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, চতুষ্পাঠীর মধ্যে গণিত ও জ্যোতিষ, বেদান্ত ও ন্যায়, কাব্য ও অলংকারের স্বাধীন আলোচনা মনে পড়ে।^{১০} উপনিষদ, সাংখ্য, বেদান্ত, দর্শনিকলিপি, চিকিৎসা ও জ্যোতিষ, বীজগণিত ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে ভারত তখন খুবই উন্নত ছিল। তিনি বৃক্ষ, শংকর, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর, গদাধর, রঘুনাথ ও লীলাবতীর নাম সম্ভ্রান্তভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে প্রাচীন ভারতীয়রা শিক্ষার স্বার্থেই শিক্ষার্চা করত। শিক্ষা ও জ্ঞানের পক্ষেই কোন অর্থকরী উদ্দেশ্য ছিল না। শিক্ষার লক্ষ্য ছিল মনুষ্যের সম্পন্ন পূর্ণ মানব তৈরী করা—পরীক্ষা পাশ করা নয়। শিক্ষা তখন ষাণ্ঠিকতার বা হ্রস্বহীন দোকানদারিতে পরিণত হয় নি।

চন্দ্রবেদার প্রাচীন ভারতের বর্ণপ্রভাজনিত বংশানুক্রমিক কর্মবিভাজনকেও প্রশংসা করেছেন, কারণ এই ব্যবস্থার খুব সম্ভাব্য ও সহজে শিক্ষাশিক্ষা সম্ভব ছিল।^{১১} পুত্রকে প্রতিপালন করার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকেই সে পিতার ব্যবস্থা শিখত। এইভাবে শিক্ষা ছিল শিশুর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত; তখনকার শিক্ষা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তিনি বলেছেন যে এই প্রাচীন ভারতীয় সমাজ মানব সভ্যতার প্রত্যাবকাল থেকে সংসারের জীবনযাত্রা সহস্র আঘাত, সহস্র নিষ্ঠুর আক্রমণ সহ্য করেও আজ পর্যন্ত জীবিত থাকতে সমর্থ হয়েছে আর তাই এই সমাজ তার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তাঁর মতে, যারা এই পুরাতন সমাজের সঙ্গে সব সম্পর্ক পরিত্যাগ করে বিদেশ থেকে আনীত বা চৌরালম্ব উপকরণ দ্বারা নতুন সমাজ গড়ে তুলে তারা মূলক্ষেত্রের পর শাখা থেকে ফলপ্রাপ্তির আশা করেন।^{১২} প্রাচীন ভারতীয় সমাজের প্রতি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত টোল ও চতুষ্পাঠীগুলির প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও তিনি যে পাশ্চাত্য মূলকলন ও বিজ্ঞান শিক্ষার জায়গায় টোল চতুষ্পাঠী ও সংস্কৃত শিক্ষার কথা বলেছেন তার প্রমাণ তাঁর রচনাসম্ভারে কোথাও মিলবে না। তিনি মাডলার কমিশনের কাছে বলেছেন, "Ancient Indian education hardly makes one fit for the struggle of life; the branches of learning, that form the subjects of his study are perhaps barren and fruitless according to modern standards."

But his course of training moulds his character; his learning gives him a position of honour and esteem in society. Above all he represents an ideal—an ideal associated with a high standard of culture, a course of self-imposed discipline and a series of voluntary self-denial and sacrifice.” তিনি পাশ্চাত্য বুদ্ধিনির্ভর ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি খুবই প্রকাশীল ছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য মূলকলঙ্কের অর্থ অনুসরণ যে ভারতীয়দের প্রকৃত উপকার করতে পারে না এ সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, “Western education has given us much; we have been great gainers; but there has been a cost, a cost as regards culture, a cost as regards respect for self and reverence for others, a cost as regards the nobility and dignity of life” সুতরাং, তাঁর মতে, জাতীয় ভাবধারার বিশিষ্টতার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শিক্ষার মহৎ আদর্শগুণের মিলনেই আমাদের শিক্ষা সর্বাসুন্দর হবে।

উনিশশে শতকে রাষ্ট্রের কৃষ্ণ বৃক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেখেছেন যে প্রত্যেক দেশের শিক্ষাপদ্ধতি দেশকে আরও শক্তিশালী করতে নিয়োজিত। তাই তিনি মন্তব্য করেছেন যে সেই শিক্ষাব্যবস্থাই আদর্শ যা দেশের দৌর্বল্য দূর করে দেশকে শক্তিশালী করে ও ব্যক্তির দৌর্বল্য দূর করে ব্যক্তিগত ক্ষমতার স্ফূর্তি ঘটিয়ে তাকে রাষ্ট্রের কাজের উপযোগী করে।^{১৭} এই জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা তৎকালীন ভারতে প্রযোজ্য ছিল না কারণ শাসন ক্ষমতা দেশের লোকের হাতে ছিল না। স্বাধীন ভারতে এই অসুবিধা দূর হয়েছে। কাজেই গ্রিবেদীর শিক্ষাদর্শ অনুসরণ করে আমরা এমন শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাবতে পারি যা দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগরিত করতে সাহায্য করবে, দেশকে শক্তিশালী করবে আবার ব্যক্তির দৌর্বল্য দূর করে তাকে পূর্ণ মনুষ্যত্বদান করবে।

শিক্ষা সম্বন্ধে গ্রিবেদীর বক্তব্য অনুধাবন করলে বোকা বান যে তিনি সেই শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন যে শিক্ষা প্রকৃত মানু্য তৈরী করে এবং জাতীয় জীবনের অস্বাভাবিক দূর করে জাতিকে নতুন আলোকের সম্মান দেয়। ছকে বাঁধা বাস্তবিক শিক্ষা তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। তিনি

বলেছেন, শিক্ষাব্যবস্থা যেন প্রাণহীন না হয়। সেখানে যেন প্রাণশক্তির পরিচয় থাকে। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাদর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও শিক্ষার ব্যাপারে তিনি রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। তাঁর শিক্ষাদর্শনের বৈশিষ্ট্য বরং তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-ভাবের সম্মিলনের কথাই তিনি বলেছেন। তিনি লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, শিক্ষা যখন মানুষের গারে বল দেয়, অশিক্ষিত যখন দুর্বল এবং জীবসমাজে যখন দুর্বলের স্থান নেই তখন শিক্ষাবিস্তারের আবশ্যিকতা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কিন্তু লোকশিক্ষার আবশ্যিকতা স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকার করলেও তিনি পাঠাগারের নামে কারাগার স্থাপনে অনীহা প্রকাশ করেছেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞান ও শক্তির বর্ধন। শিক্ষা প্রণালী যেন এই উদ্দেশ্যের সহায়ক হয়, পরিপন্থী না হয়। তাঁর মতে বালকেরা যে শিক্ষালাভ করে তার ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, যে চাষার ছেলে যে ভবিষ্যতে রাজমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পাবে না তাকে দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত স্কুলে পঢ়ে স্বাক্ষর জ্ঞান ও ক্রোমরস, ইব্রাহিম লোদি ও জুমক ফার্নান্ডেজের বিবরণ মৃৎস্থ করানোর চেষ্টা নিরর্থক ও ভয়াবহ। শিল্পশিক্ষা ও বিজ্ঞান-শিক্ষার উপযোগিতাও তিনি অস্বীকার করেন নি। কিন্তু এজন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির অভাব দূর করা আগে প্রয়োজন। মাতৃভাষার শিক্ষা প্রচারের কথাই তিনি বলেছেন। নিজে বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে ক্রাসে মাতৃভাষায় শিক্ষা দিচ্ছেন। বিভিন্ন বিষয়ে বাংলার মননশীল প্রবন্ধ লিখে হাতেকলমে বাংলাভাষার দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলা গদ্যে তাঁর সাবলীল প্রকাশভঙ্গী ও সূচরুভাবে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা বাংলা গদ্যের ব্যাপ্তি ও বাঞ্ছনীয়তা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

তিনি তাঁর মনোনিবেশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রবন্ধে^{১০} জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কার্যনির্বাহী ছবি অঙ্কিত করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় নিম্নতম থেকে উচ্চতম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবে, কারণ তাঁর মতে, নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ শিক্ষা সমন্বিত হলে শান্তি ও সমরের অপচয় ঘটে। এই বিশ্ববিদ্যালয় শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষারও ব্যবস্থা করবে, কারণ দেশে ধনাগমের জন্য এবং জীবিকাধারের জন্য এ জাতীয় শিক্ষা প্রয়োজন। সর্বোপরি, শিক্ষা যাতে জাতীয় প্রকৃতির অনুরণী হয়, যেদিকেও বিশ্ববিদ্যালয়কে দৃষ্টি দিতে হবে।

তিবেনী বলেছেন যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিম্ন ও মধ্যশিক্ষার জন্য

নিম্নে বারে একটি আদর্শ স্কুল স্থাপন করবে। নিম্নশ্রেণীগামীকে নিম্নাশিকা ও উচ্চতর শ্রেণীসমূহে মধ্যাশিকার ব্যবস্থা থাকবে। উভয়ের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ থাকবে না। পাঁচ থেকে ষোল বছর পর্যন্ত ছাত্রেরা এখানে অধ্যয়ন করবে। এই আদর্শ স্কুলে পাঠানির্দেশ, শিক্ষক নিয়োগ ও সমুদয় ব্যয়ভার পরিচালনার ব্যবস্থা করবে বিশ্ববিদ্যালয়। সহর ও মফস্বলের যে সকল বিদ্যালয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনতা স্বীকার করবে তারা এই আদর্শ বিদ্যালয়কে সর্বতোভাবে অনুসরণ করবে। এইরূপ স্কুল দেশময় ছড়িয়ে থাকবে। এই সকল স্কুলের পাঠ সমাপনান্তে উত্তীর্ণ ছাত্ররা কলেজে প্রবেশাধিকার পাবে।

উচ্চশিক্ষার জন্য আদর্শ কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব তিনি করেননি। সহর ও মফস্বলের বেসরকারী কলেজগুলির মধ্যে যারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনতা স্বীকার করবে তারাই উচ্চশিক্ষার ভার নিতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয় সেক্ষেত্রে ভারবহনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে। পাঠ্যবিষয় ও পাঠ্যপুস্তক নির্বাণ ও পরীক্ষা-গ্রহণান্তে প্রশংসাপত্র দান ও অবশ্যকমত কলেজগুলির পরিদর্শন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য হবে। কলেজের অধ্যয়ন সমাপ্তির পর উত্তীর্ণদের বি, এ, উপাধিধারীর অনুরূপ মর্যাদা হবে। অর্থাৎ ছাত্র উচ্চশিক্ষার পর ব্যবসায় বা শিল্পশিক্ষা বা গৃহকর্মে প্রবৃত্ত হবে। উচ্চতর শিক্ষাভিলাষীদের সংখ্যা খুব বেশী হবে না। চিবেদী মনে করেন যে এই অল্পসংখ্যক জ্ঞানার্থী ছাত্রের জন্য প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞানার্জনের পথ প্রশস্ত করতে হবে, কারণ সংখ্যার কম হলেও এই সকল জ্ঞানার্থী ছাত্রই দেশের শিরোভূষণ হয়ে জাতীয় প্রকৃতি গঠনে ও জাতীয় উন্নতিবিধানে সমর্থ হবে। এদের জন্য উপস্থিত ব্যয়ে library, laboratory ও museum সমন্বিত পাঠাগার স্থাপন প্রয়োজন। সেখানে দেশী ও বিদেশী জ্ঞানীগুণী অধ্যাপকেরা অব্যাপনা করবেন ও ছাত্রদের জ্ঞানার্জনে ও নতুন সত্যাবিস্কারে পথপ্রদর্শন করবেন। অব্যাপকেরাও জ্ঞানার্জনে ও সত্যাবিস্কারে নিরোিজিত থাকবেন। এই পাঠাগার দুই ভর্তুকিগণ্ট হবে। প্রথম ভর্তুকি অধ্যাপকের অধীন থেকে ছাত্ররা উচ্চশিক্ষা লাভ করবে ও উত্তীর্ণ ছাত্রদের এম, এ, পাশের অনুরূপ মর্যাদা হবে। দ্বিতীয় ভর্তুকি যে সকল ব্যক্তি জ্ঞানচর্চার জীবনব্যাপন করতে চান তাঁরা অব্যাপকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে জীবনব্যাপী জ্ঞানচর্চার সুবিধা ও অবসর লাভ করবেন। তাঁদের জীবিকার জন্য যথোচিত বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এক এক ব্যক্তি এক এক বিষয়ে নিযুক্ত থাকবেন।

বাস্তবিক শিক্ষার ব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়কে করতে হবে। শিক্ষাশিক্ষার

জন্ম দুটি বা তিনটি স্তর থাকবে। নিম্নস্তরে কৃষি ও দেশে প্রচলিত ব্যবসায়াদুলির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রকৃষ্ট শিক্ষার জন্য ছোট্ট স্কুল স্থাপন করতে হবে। উচ্চস্তরে বাবহারিক বিজ্ঞানের ভিত্তির ওপর বিবিধ শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার।

সবশেষে ত্রিবেদী মনে করেন যে ছাত্রদের শৃঙ্খল বইয়ের উপর সমস্ত নজর দিলে হবে না। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অল্পবয়সে ব্যায়ামচর্চার ব্যবস্থা থাকবে। বিদ্যারম্ভ থেকে ছাত্রদের মধ্যে সেবাকর্ম দ্বারা স্বদেশী ভাব জাগরিত করতে হবে। ছাত্রদের আপন কর্মচরনের স্বাধীনতা ও সুযোগ দিতে হবে। সর্বোপরি, উন্নত চরিত্র গঠনের জন্য নীতিশিক্ষা দিতে হবে।

ত্রিবেদীর উপরোক্ত স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা ও কল্পনা পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। তিনি শিক্ষার দ্বার নিয়ে আলোচনা করেন নি। তাঁর আলোচনা শিক্ষাপ্রণালীর ওপর সীমাবদ্ধ। শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনার গুরুত্ব আজকের দিনেও কম নয়। তিনি সামাজিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটের বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষাসমস্যা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছেন। স্বদেশ ও সংস্কৃতিত্ব সঙ্গে পরিচিতির মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ উৎকৃষ্ট করা তার মতে শিক্ষার আদর্শ। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার বিশিষ্টতার দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি এমন এক আদর্শ শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা বলেছেন যা পূর্ণ মানুষ গড়ে তোলে, নিজেকে ও অপরকে প্রভা করতে শেখায় ও জীবনের মহত্তর আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে। আজকের দিনেও এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার বৌদ্ধিকতা অনস্বীকার্য।

দুত্র নির্দেশ

- ১ “ইরেজী শিক্ষার পরিণাম,” নানাকথা, রাধেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র, সম্পাদক ডাঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থমেলা, কলিকাতা, ১৩৮২, পৃঃ ৩০৮-৩১০।
- ২ ১৯১৭ সালে ডাঃ মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে একটি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত হয়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯১৯ সালে কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে।
- ৩ আচার্য রাধেন্দ্রসুন্দর, আশুতোষ বাজপেয়সী, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, কলিকাতা, ১৩৩০, পৃঃ ৩১৮।

- ৪ "অরণ্যে রোদন", নানাকথা, উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪০৯।
- ৫ "বন্দুক শিক্ষাপ্রণালী", রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৭।
- ৬ "সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার", নানাকথা, উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৪০।
- ৭ "অরণ্যে রোদন", উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪১৪।
- ৮ "শিক্ষাপ্রণালী", নানাকথা, উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৫৫।
- ৯ "সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার", উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৭৭।
- ১০ "ইংরেজী শিক্ষার পরিণাম", উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩১১।
- ১১ "বন্দুক শিক্ষাপ্রণালী", উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৪।
- ১২ "সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার", উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৯৩।
- ১৩ অর্ডার্স রামেন্দ্রসুন্দর, পৃঃ ০০০-০০৪।
- ১৪ ঐ, পৃঃ ০০৪।
- ১৫ "অরণ্যে রোদন", উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪০১-৪০২।
- ১৬ "স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়", রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৪-৩৯।

ভারতে শ্রমিক আন্দোলন ও চিত্তরঞ্জন

আশাক মুস্তাফি

প্রথম যুদ্ধোত্তর ভারতে একদিকে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক উদ্দীপনা এবং অপরদিকে অর্থনৈতিক সংকটজনিত অস্থিরতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সংগঠিত শক্তি হিসেবে যুদ্ধ পরবর্তীকালে শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয়ও এই সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী শ্রমিকদের সংগঠিত করার বহুমুখী প্রচেষ্টার নিষেদের নিয়োজিত করেন। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর সম্পর্ক সম্বন্ধে সঠিক কোন ধারণা সংগঠকদের ছিল না। সদ্য সচেতন অথচ অসংগঠিত শ্রমিকদের নামে আন্দোলনের লক্ষ্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল না। শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের সম্পর্কের প্রকৃতি নিয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ ছিল। গান্ধীজি ও দেশবন্ধু মধো এনিরে এক বিতর্কেরও সৃষ্টি হয় যদিও এই বিতর্কের ফলশ্রুতি তেমনভাবে শ্রমিক শ্রেণী অথবা জাতীয় আন্দোলন কোনটাকেই প্রভাবিত করে নি। আদর্শগত কারণে গান্ধীজি, শ্রেণী সংগ্রামকে জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করতে চান নি। তিনি ছিলেন অর্থাৎ উত্তর বিশ্বাসী এবং শ্রমিক মালিক সম্পর্কে শ্রেণীধর্মের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। আমেদাবাদে সূতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘটের সময় তিনি যে কর্মসূচী নেন তাকে পরবর্তীকালে অনেকেই সংস্কারপন্থী বলে অভিহিত করেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে তিনি যে হরতাল আহ্বান করেন তারও দিন নির্দিষ্ট হয় এক রবিবার।

আদর্শগত সীমাবদ্ধতা ছাড়াও সাধারণভাবে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রথম থেকেই শ্রমিকদের অগ্রণী ভূমিকা সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহ দেখান নি। কারণ তাদের ধারণা ছিল পরাধীনতার পর্যায়ে দেশের শ্রমিক বনিকের বিরোধকে ঘনীভূত হতে দিলে সাধারণ শত্রু ইংরাজই লাভবান হবে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ চ্যামশলি তথা গনশক্তির আগরণকে যথেষ্ট ভীতির চোখে দেখতেন। প্রকৃতপক্ষে যদি দেশের শ্রমিক শ্রেণী একটি সুস্পষ্ট মতবাদগত দৃষ্টিভঙ্গী বা উপদ্রষ্ট সমন্বয় সেই সময়ে গড়ে তুলতে পারত তাহলে কংগ্রেসের অবহেলা এবং উপেক্ষাকে ভয়সর

সহ্য করতে হত না। এমনকি বিদেশী লেখকরাও মন্তব্য করেছেন যে বিশ-বিশের দশকে শ্রমিক শ্রেণীকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অতুষ্ণ করার জন্য বিশেষ কোন কর্মসূচী নেওয়া হয় নি। তাদের মতে সেটা সম্ভবতঃ এই কারণে যে কংগ্রেসের গণাভিস্ত সঙ্গসারিত হলে আসলে সংগঠনের অভ্যন্তরস্থ বামপন্থী নেতৃবৃন্দই অধিকতর শক্তিশালী হবেন এমন আশংকা সর্বভারতীয় দলীয় কর্তৃপক্ষের ছিল। শ্রমিক শ্রেণী কংগ্রেসের সমীপবর্তী হতে চাইলেও সে ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অনীহা ছিল। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শ্রমিক বিক্ষোভ বোধ কিছুটা বিচলিত বোধ করছিলেন। সরকারী বিবরণ অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্প এবং রেল ও ডাক বিভাগে শ্রমিক অসন্তোষ ঐ সময় তুঙ্গে ওঠে। বোম্বাই ও কানপুরে সর্বসমেত প্রায় সওয়া দু'লক্ষ শ্রমিক, মল্লাবৃন্দের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে। অধিকন্তু রাওলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের পর রেল, টাঁকশাল, কন্দর এবং ইঞ্জিনারিয়ার শিল্পে হাজার হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করে কানপুর, জামালপুর, আমেদাবাদ প্রভৃতি জায়গায়। মল্লাবৃন্দি এবং জীবনযাত্রার নিয়গামী মানের জন্য ১৯২০-২১ সালে সারা দেশ জুড়ে প্রায় ৩৯৬টি ধর্মঘট হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য টাটর ইম্পাত শিল্পে বোম্বাই এর সূতাকলে এবং বাংলার পাট শিল্পে সংগঠিত ধর্মঘট। উত্তর প্রদেশ ও বোম্বাইতে প্রায় একই সময় রেল ও ডাক ধর্মঘট তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯০৭ সাল ছাড়া ১৯২১-এর মতো এত বেশী ধর্মঘট আর দেখা যায় নি। কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পশ্চিম ভারতের কিছু শিল্পপতি এবং সমস্ত কারণই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই ধর্মঘটগুলির ব্যাপ্তিতে কিছুটা বিব্রত বোধ করেন।

এতদসঙ্গেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। ১৯১৯-এর কংগ্রেস অধিবেশনে বলা হয় যে শ্রমিকদের সঙ্গে স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া উচিত এবং তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা উচিত। এর পরের কংসর নাগপুরে যে কংগ্রেস সম্মেলন হয়, তাতে চিন্তরঞ্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব তোলেন। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে নিজস্ব সংগঠন মাধ্যমক শ্রমিক শ্রেণী তাদের বৈধ দাবী অর্জনে যে সন্তোষ চালাচ্ছে কংগ্রেসের তাতে পরিপূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে দৃঢ় উপসর্গমিতি গঠিত হয়। একটির সঙ্গে চিন্তরঞ্জন স্বয়ং যুক্ত ছিলেন। যদিও এই সমিতি কংগ্রেসকে অধিকতর গণতান্ত্রিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক একটি সংস্থায় রূপান্তরিত করতে উদ্যোগ নেয় তবুও কংগ্রেস শ্রমিকদের সংগঠিত করে গণাভিস্তকে সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে কিন্তু কোন কার্যকরী পদক্ষেপই গ্রহণ

হয়ে নি। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সন্মেলনে সভাপতির ভাষনে ক্ষেত্রোক্ত করে চিত্তরঞ্জন মন্তব্য করেন যে আনন্দ্রুপ কংগ্রেস প্রতিনিধিদের উপর বস্তুতঃ তিনি নাগপুর প্রস্তাবটি চাপিয়ে দিয়েছিলেন, কেননা সেই প্রস্তাবটি এখনও কার্যকরী করা হয় নি। গয়া কংগ্রেসে ইতিপূর্বেই তিনি এই ষড়্ভুজকে নস্যাৎ করেছেন যে, শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে নিরোজিত করার অর্থ হল তাদের উপদীক্ষণ করা। গয়া কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জনের প্রচেষ্টায় শ্রমিক কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি উপসমিতি গঠিত হয়—যার মধ্যে এম্প্লয়জ, সেনগুপ্ত, স্বামী দীননাথ প্রমুখ জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সিন্ধারাভেলু চৌটারায়ের (পরবর্তীকালে বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা) মতো ব্যক্তিও স্থান পান। প্রকৃতপক্ষে গয়া কংগ্রেসের পর কংগ্রেস সংগঠন বিধাবিভক্ত হওয়ার ফলে এই উপসমিতি কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। মৌখিক সহানুভূতি ও প্রতিশ্রুতি ছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামে সহায়তা দান করার ব্যাপারে কংগ্রেস কোন সক্রিয় ভূমিকা সেই সময় আদৌ গ্রহণ করে নি। আরও লক্ষ্যণীয় যে ১৯২০ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত যে কটি শ্রমিক আন্দোলনে ~~কংগ্রেস~~ লিপ্ত হয়েছে, সেই আন্দোলনগুলিকে পর্যাপ্ত কংগ্রেস নিজের শর্তে পরিচালিত করেছে। এইজন্যই দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন বাংলার শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সমর্থন লাভে ব্যক্তি হন এবং চিত্তরঞ্জনও কংগ্রেসের নির্দিষ্ট নীতির বাইরে গিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোন অগ্রণী কর্মসূচী নিতে এগিয়ে আসেন নি। বাস্তবিক পক্ষে স্বরাজ্য দলের উদ্যোগে যে কয়েকটি ছোটখাট শ্রমিক ধর্মঘট সংঘটিত হয় সেগুলির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ঐতিহ্যবাহী নীতি অর্থাৎ অহিংস এবং স্বেচ্ছাহীন সংগ্রামের পথকেই বেছে নেওয়া হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতেও ১৯২০ সালে নাগপুরের কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন শ্রমিকদের সম্পর্কে যে প্রস্তাব তোলেন তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রস্তাবে বলা হয় —
 “The Congress expresses its fullest sympathy with the workers of India in their struggle for securing their legitimate rights through the organisation of trade unions.....the Congress is of opinion that Indian labour should be organised with a view to improve and promote their well-being and to secure to them their just rights and also to prevent exploitation of Indian labour and Indian resources by foreign agencies.”

রাজনৈতিক কর্মব্যস্ততার দরুন চিত্তরঞ্জন নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রেরিত একটি শ্রুতেন্দ্ৰা বাণীতে তিনি দেশবাসীকে ট্রেড ইউনিয়নের কাজকর্মে আরও উৎসাহ দিতে আহ্বান জানান। তৃতীয় ও চতুর্থ A.I.T.U.C তে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং বৃদ্ধ পরবর্তী অসন্তোষকে তিনি রাজনৈতিক অসন্তোষের চেহারা দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্ব দেন।

এটা স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না যে দেশের তৎকালীন পরিস্থিতিতে স্বরাষ্ট্রের লক্ষ্য সাধারণ মানুষের বোধগম্য ও সাধনার বস্তু করে তুলতে চেষ্টাছিলেন চিত্তরঞ্জন। প্রকৃতপক্ষে একটি সাধারণ সংগ্রামের স্বার্থে তিনি কংগ্রেস ও দেশের প্রমথিত্বের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক স্থাপনের কথা ভাবছিলেন। তবে কংগ্রেসের মধ্যে বিচ্চিন্ন এবং পরস্পর বিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থের যে সহাবস্থান ঘটেছিল, তাকে তিনি বাধা দেন নি। বরং একপ্রকার মেনেই নিরেছিলেন।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের পার্থক্য তিনি বুঝতেন না এমন নয়। যদিও উদারনৈতিক বুজোঁয়া মনোভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত নিষ্ঠাবান কংগ্রেসী হিসাবে বৈপ্লবিক প্রবণতাকে প্রশয় দিতে তিনি চান নি। তিনি একথাও বলোঁছিলেন যে ধার করা ইংরাজিয়ানা আটপোরে জনগণ থেকে আমাদের ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। ইহ বঙ্গ স্বেচ্ছ উন্নাসিকতার কারণে আমরা আপামর জনগণের প্রতি যে ক্রমেই তাঁজিলা পন্ডায়ণ হয়ে পড়ছি, তাতেও তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন শ্রোত্বের সঙ্গে বলেন—“Is the peasant a member of any of our committees and conferences? Do we consult them.....Do we co-operate with them? Indeed our political organisation is a lifeless and soulless force. Hence our political agitation is unsubstantial—divorced from all intimate touch with the soul of the people.” ১৯২২ এর নভেম্বরে দৈনিকবন্ধে চিত্তরঞ্জন ভারতীয় উদারনৈতিক দলের সমর্থকদের কটাক্ষ করে বলেন—“The Liberals fight shy of revolution.....revolution means complete change, We want complete change.....I don't want the sort of Swaraj which will be only for the middle

class alone..... I want Swaraj for the masses, not for the classes. I don't care for the Bourgeoisie. How few are they ?”

চিন্তনজনের এইসব বক্তব্য সেই সময়ের কংগ্রেসী নীতির পরিপ্রেক্ষিতে যে কিছুটা মেকপ্রদ ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। সে সময়কার বাঙ্গালদেশের জাতীয়তাবাদী পর-পরিষ্কার শ্রমিক সংগঠন বিষয়ে কংগ্রেসের পুরাতন প্রভাব কাব্যকরী না হওয়ায় যথেষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়—“আত্মশক্তি”, “শম্ভু”, “অমৃতভাষার”, “মহম্মদী” প্রভৃতি পত্রিকা চিন্তনজনের মন্তব্যকে সমর্থন করে। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ অসহযোগের চৌহান্দার বাইরে শ্রমিকদের মালিক বিরোধী ক্রিয়াকর্মকে অনুমোদন করতেন না যদিও বিদেশী মালিকের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করতে দিতে তাঁদের কোন আপত্তি ছিল না। তাত্ত্বিক দিক থেকে শ্রমিকদের দাবী পাওয়ার আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে চিন্তনজন চুটি করেন নি। বস্তুত ১৯২০-এর AITUC-র লাহোর অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তার তিনি বলেন—“Labour represents 98% of the population in India. Labour includes peasants in India. Does anybody mean to say that this vast population of the community require no organisation ?”

চিন্তনজনের ব্যক্তিগত মতামত হাইহোক তিনি প্রকাশ্যে দলীয় স্বার্থের (কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দল উভয়ই) বিরোধিতা ফরতে পারেন নি, কেন না তার স্বরাজ্য দলের মধ্যে উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং ভূস্বামীদেরই দাঙ্গিণ্য ও প্রাধান্য ছিল। এটা স্পষ্ট যে শ্রমিক সংগঠন ও জাতীয় আন্দোলনে শ্রমজীবী মানবের ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট চেতনা সত্ত্বেও প্রেমী সত্যবোধের তত্ত্বকে কিন্তু তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে স্বরাজ্য দলের গৃহীত ইত্তাহার থেকে ক্রিয়ালব্ধ উদ্ধৃত করা যেতে পারে—“True the party stands for justice to the tenant but poor indeed will be the quality of that justice if it involves any injustice to the landlord.” প্রকৃতপক্ষে স্বরাজ্য পার্টি অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে চলতে পারত না। শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবখাল হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন বিহার পঞ্চায়েত সমিতির সম্পাদককে তিনি জিজ্ঞাসাছিলেন—“I donot desire any friction between landlords and tenants..... I have opposed the idea of such class-war from public platforms.”

মূল্যায়ন—১

মানবেন্দ্রনাথ রায় স্বরাজ্য দলের এই ধরনের কর্মসূচী এবং চিত্তরঞ্জনকে
বিধাশ্রম মানসিকতার শঙ্কা বোধ করোঁছিলেন !

এতদসত্ত্বেও প্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন যথেষ্ট জড়িয়ে পড়ে-
ছিলেন। এই সংযোগকে পূর্ণিগণ কতৃপক্ষ আদৌ প্রীতির চোখে দেখেন
নি। সরকারী অথবা প্রকাশ ২০শে এপ্রিল ১৯২১ চিত্তরঞ্জন সর্বভারতীয়
জাহাজ কর্মী ইউনিয়নের পক্ষে যোগ দিয়েছেন। মহম্মদ দাউদ জাহাজ
সমিতির চিত্তরঞ্জন ও অন্যান্য নেতার প্রভাবাধীনে আনতে চান !
চিত্তরঞ্জন এই সময় Bengal Labour Federation-এর সহ-সভাপতিও
নির্বাচিত হন ! ১৯২০ সালে কলকাতা ট্রাম ধর্মঘটে চিত্তরঞ্জন ও তাঁর
অনুগামীদের অংশ গ্রহণের বিষয়ে জানুয়ারী মাসে বাংলা সরকারের পার্শ্বিক
রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে। ঐ বৎসর ১১ই মার্চ কাঁকিনাড়ার একটি প্রমিক
সম্মেলনে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও দেওয়ান চমনলালের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন উপস্থিত
ছিলেন।

১৯১৯—১৯৩০ এই সময় সীমার মধ্যে কংগ্রেস কতৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট
প্রস্তাবগুলি অনুধাবন করলে দেখা যায় যে দেশের প্রমিক শ্রেণীর সংগে
সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত অভাব ছিল !
অনেক কংগ্রেস কর্মী এতে বিকৃত হন, পত্র-পত্রিকার কংগ্রেসের এই দৃষ্টিভঙ্গী
সমালোচিত হয়। ১৩ই মার্চ ১৯২০ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে অমৃতবাজার
পত্রিকা স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রমিক শ্রেণীকে স্বত্ব করার ব্যাপারে কংগ্রেসের
অনীহা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করে। প্রমিকদের সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের মনোভাব
গোড়া কংগ্রেস কর্মীদের ধারণা থেকে কিছুটা ভিন্ন ছিল। বিভিন্ন প্রমিক
আন্দোলনে তিনি অংশ নেন। স্বরাজ্য দল সংগঠনের পর ট্রেড-ইউনিয়নের
কাছে তিনি আরও মন দেন ! এমন কি স্বরাজ্য দলের নেতৃত্বে একটি
বিকল্প ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের কথাও তিনি ভাবেন ! কিন্তু প্রমিক আন্দো-
লনকে একটি সীমিত গভীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে অন্যান্য কংগ্রেস
নেতাদের মত তিনিও সচেষ্ট ছিলেন। প্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগা-
যোগ রক্ষা করে চললেও প্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামী ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি
সজাগ ছিলেন, এর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

জাতীয় বুজোঁয়া শ্রেণীর ভূমিকা নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক

মরহুম কবিবাজ

কি নিায় বিতর্ক

জাতীয় বুজোঁয়া শ্রেণীর ভূমিকা নিয়ে অতি সাম্প্রতিক কালে আবার আর এক দফা বিতর্ক আরম্ভ হয়েছে। এবারে বিতর্কের মূলে রয়েছে—ভারতের বৈদেশিক নীতি ও আভ্যন্তরীণ নীতির মধ্যে আপাত-বিরোধের প্রশ্নটি। কেউ বলতে চান—ভারতের বৈদেশিক নীতি যদি প্রগতিশীল হয় তাহলে তার আভ্যন্তরীণ নীতি প্রতিচ্ছিন্নশীল হয় কি করে? বিষয়টি উল্টো করে আবার কেউ কেউ বলেন—আভ্যন্তরীণ নীতি যদি প্রতিচ্ছিন্নশীল হয় তাহলে কোনোক্রমে তার বৈদেশিক নীতি পুরোপুরি প্রগতিশীল হতে পারে না। বৈদেশিক নীতি ও আভ্যন্তরীণ নীতির মধ্যে এই আপাত-বৈপরীত্য—বর্তমান বিতর্কের মূলে।

আমাদের মতে বিষয়টির শ্রেণীমূলে প্রবেশ না করলে এই আপাত বৈপরীত্যের রহস্যটি ভেদ করা যাবে না। ভারতের বৈদেশিক নীতি ও আভ্যন্তরীণ নীতি—এই দুইয়ের মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। সেই যোগসূত্রটি খুঁজে বার করা প্রয়োজন।

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে ভারতের বৈদেশিক নীতি মোটামুটি প্রগতিশীল (একথা প্রতিটি বামপন্থী পার্টি আজ স্বীকার করেন)। সাধারণভাবে বৃদ্ধ ও শক্তির প্রস্নে, বিশেষ করে নিউক্লিয়ার বৃদ্ধ রোধের প্রস্নে, নিরস্ত্রীকরণের প্রস্নে, ঔপনিবেশিকতাবাদ উচ্ছেদ করার প্রস্নে, বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্নে (বিশেষ উদাহরণ, দক্ষিণ আফ্রিকা)—ভারত সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছে তা সাম্রাজ্যবাদী মহলগুলির মোটেই পছন্দসই নয়। তা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বা সমাজতন্ত্রমুখীন দেশগুলি সম্পর্কিত কয়েকটি প্রস্নে যেমন, ভিয়েতনাম প্রস্নে, কাম্বুজিয়া প্রস্নে, আফগানিস্তান প্রস্নে, ভারত সরকার যে অবস্থান গ্রহণ করেছে সাম্রাজ্যবাদ তাকেও মোটেই পছন্দ করেছে না।

শব্দ আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও, উন্নত জনতান্ত্রিক দেশগুলির স্বার্থ ও উন্নয়নশীল সমা-
স্বাধীন দেশগুলির স্বার্থের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দিয়েছে। এই
সংগ্রামেও ভারত অংশীদার। ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের একটি বৃহৎ
দেশের এই সংগ্রামে যোগদান একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

এই ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত মোটামুটি
একটি সামাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা অনুসরণ করেছে। তবে এই সামাজ্য-
বাদ-বিরোধিতার সীমারেখাটি ভুলে গেলে চলবে না।

ভারতের অবস্থান মোটামুটি সামাজ্যবাদ-বিরোধী হলেও সামাজ্যতান্ত্রিক
দেশগুলির বলিষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার তুলনায় এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা
কেলি দ্বিধাজড়িত।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সামাজ্যবাদের
বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারত একটি মধ্যপন্থা অনুসরণ করেছে যার মধ্যে জাতীয়
বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ প্রতিফলিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে মতাদর্শগত সংগ্রাম চলছে তাতে ভারতের
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবস্থান লক্ষ্য করার মত। ভারত সরকার অনুসৃত জনতন্ত্রের
পথের আবিষ্কৃত্য অস মিশ্র অর্থনীতি, শ্রেণী-নিরপেক্ষ গণতন্ত্র, মুক্ত দুনিয়ার
মূল্যবোধের প্রতি আস্থা প্রভৃতি—ভারতের বুর্জোয়া মতাদর্শগত এই
ধারণাগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী মহল প্রায়ই প্রশংসা করে থাকে।

একই সত্ত্বেও ভারত সরকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে মোটামুটি একটি
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা অনুসরণ করেছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বৈদেশিক নীতি কি
আন্তর্জাতিক নীতির সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য? ভারত যদি পাকিস্তান বা দক্ষিণ
কোরিয়ার মত সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল অর্থনৈতিক বিকাশের পথ
অনুসরণ করত তাহলে কি এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বৈদেশিক নীতি
অনুসরণ করা সম্ভবপর হত?

একথা স্বীকার করতেই হবে ভারত জনতন্ত্রের পথ গ্রহণ করলেও বিশ্ব
সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণের পথ (পাকিস্তানের মত) গ্রহণ করেনি।
সে মোটামুটি স্বয়ংস্ফূর্ত অর্থনীতি ও স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশের পথ
অনুসরণ করতে সচেষ্ট হয়েছে। সে স্বয়ংস্ফূর্ত অর্থনীতি গঠনের উদ্দেশ্যে
ভারতী শিল্প নির্মাণের দিকে বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেছে। সে নিজস্ব

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন—তাহলে ভারত কি এক নতুন পথের স্থান দিচ্ছে না ?

ধনতন্ত্রের পথের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক স্বয়ংস্ফূর্ততা অর্জনের এই চেষ্টা ভারতের একটি নিজস্ব আবিষ্কার ভাবার কোনো কারণ নেই।

শুধু ভারত নয়, আরও অনেক সদ্য স্বাধীন দেশ অর্থনৈতিক স্বয়ংস্ফূর্ততা অর্জনের চেষ্টা করছে ও ছোট নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করছে। আরও লক্ষণীয় সদ্য স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে এই প্রবণতা ক্রমেই সবার হয়ে উঠছে।

বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করতে হলে আমরা যে যুগে বাস করছি সেই যুগে বিশ্ব রাজনীতির গতি প্রকৃতি অনুধাবন করতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদ ও সদ্য স্বাধীন দেশগুলির ভূমিকাঃ

আন্তর্জাতিক পটভূমি

আমাদের যুগের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলছে তাতে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমশ জয়লাভ করছে এবং বিশ্বধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমশ পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে শক্তি সম্পর্ক এই মৌলিক পরিবর্তন বর্তমান যুগে বিশ্ব বিকাশের গতি ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সোভিয়েতের নেতৃত্বে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই অগ্রগতি শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জীবনে মৌল পরিবর্তন সাধন করছে তা নয়, এই অগ্রগতি সমগ্র বিশ্ব প্রবাহের গতি ধারাকে পালেট দিচ্ছে। কি ধনতান্ত্রিক দেশ কি সদ্য স্বাধীন দেশ, যে ধরনের দেশই হোক না কেন, আজ তাদের জাতীয় সমস্যার সমাধানের প্রয়টিকে বিশ্ব সমাজতন্ত্রের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়।

সদ্য স্বাধীন দেশগুলির কথাই আলোচনা করা যাক। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কনস্টান্ট (১৯৬১) বলা হয়েছে—এই দেশগুলি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অঙ্কুশ নয়। আবার বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থারও অঙ্কুশ নয়। একটি স্বাধীন শক্তি হিসাবে তারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আধিক্য হতে চেষ্টা করছে।

একথা সর্বজনবিদিত যে সদ্য স্বাধীন দেশগুলির একাংশ সমাজতন্ত্র-মুখীন বিকাশের পথ গ্রহণ করেছে। তারা সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার সঙ্গে

ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে শ্রেণী সম্পর্কে যে মৌলিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তারা তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কাছ থেকে বহু-মুখীন সাহায্য গ্রহণ করে তারা ধনতন্ত্রের অভিশপ্ত পথ পরিহার করে মৌলিক সমাজ পরিবর্তনের পথ গ্রহণ করেছে।

বিশ্বরাজনীতিতে আমূল পরিবর্তনের ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা শত চেষ্টা করে ও বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রমুখীন বিকাশের ধারাতিকে ভ্রষ্ট করে দিতে পারছে না।

এমনকি সদ্য স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে যারা ধনতন্ত্রের পথ অনুসরণ করছে তাদের মধ্যে একটি বড় অংশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রেণী সম্পর্কের এই মৌলিক পরিবর্তনের যথাসম্ভব সুযোগ গ্রহণ করতে চেষ্টা করছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে প্রতিরোধ—শক্তি গড়ে তুলছে তার সুযোগ নিয়ে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। মূল কথা সাম্রাজ্যবাদের শাসনিনের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করতে চাইছে না। সোভিয়েতের কাছ থেকে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাময়িক সাহায্য নিয়ে তারা সাম্রাজ্যবাদের আঘাত কিছুটা প্রতিহত করতে পারছে। নিজ নিজ দেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে চেষ্টা করছে। বলা বাহুল্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তিশালী উপস্থিতি সদ্য স্বাধীন দেশগুলিকে স্বাধীন পথ বেছে নিতে উৎসাহিত করছে।

সদ্য স্বাধীন দেশগুলি আর আগের মত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির কাঁচামাল যোগানদানকারী (raw material appendage) দেশ হয়ে থাকতে চাইছে না। তারা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্যের উপর নির্ভর করে ভারী শিল্প গড়তে চায় এবং স্বাধীন বিকাশের পথ বেছে নিতে আগ্রহী।

উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিকে লক্ষ্য করে যে নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করছে আনকটাত (UNCTAD) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সভার শেষে দেশগুলি তার তীব্র বিরোধিতা করছে। উন্নয়নশীল দেশ ও উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের মধ্যে বিরোধ এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে যে ইউনেস্কো (UNESCO)তে সাম্রাজ্যবাদের হুকুম আর চলছে না—সাম্রাজ্যবাদীদের নেতা আমেরিকা তাই এই আন্তর্জাতিক মঞ্চ ছেড়ে দিতে মনস্থ করছে। ধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণকারী উন্নয়নশীল দেশ-

গুলির সঙ্গে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সম্বন্ধস্থান বিরোধ একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়।

ধনতন্ত্রের অসম বিকাশের নিয়ম (The law of uneven development of capitalism) দৃষ্টান্তে গতিতে এগিয়ে চলেছে। সমাজতন্ত্র-মুখীন দেশগুলি বিশ্ব ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে মূখোমুখি চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করছে। ডাঙ্কাড়া, ধনতন্ত্রের পথ অনুসরণকারী সদা স্বাধীন দেশগুলির সঙ্গে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বিরোধ বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রচণ্ড অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় সদা স্বাধীন দেশগুলিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ বিশ্ব ধনতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে না, বরং ধনতন্ত্রের সফট স্পট্টে একটি শক্তিশালী উপাদান হয়ে উঠছে (এই বিষয়ে আকর্ষণীয় আলোচনার জন্য পড়ুন—Primakov The East after the Collapse of the Colonial System, Moscow, 1983)।

এই একান্ত ইজিতবাহী ঘটনাগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নতুন কর্মসূচীতে (১৯৮৬) বলা হয়েছে—সদা স্বাধীন দেশগুলি পরস্পর থেকে যতই আলাদা হোক না কেন, তারা বিকাশের যে পথই অনুসরণ করুক না কেন, নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী, অপূরণীয় হস্তক্ষেপ বাদ দিয়ে, তারা সকলেই স্বাধীন বিকাশের পথকে বেছে নেবার ব্যাপারে, একইসূত্রে কথা বলছে।

তার মানে অবশ্যই এই নয় যে প্রত্যেকটি সদা স্বাধীন দেশই এখন স্বাধীন বিকাশের পথ অনুসরণ করছে। যে সব দেশে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিক্রিয়ালী অংশ (মূলত মূহুর্মূহী বুর্জোয়া) ক্ষমতায় আসীন হয়েছে যেমন পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি তারা স্বনির্ভর অর্থনৈতিক বিকাশের বদলে পরনির্ভর অর্থনৈতিক বিকাশের পথ গ্রহণ করছে। সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যের ফাঁস গলার পরে দেশকে কি স্বাধীনতা দিচ্ছে, কি অর্থনীতি দিচ্ছে সর্বনাশের দিকে, সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ভারতে বিপ্লবের বর্তমান স্তর ও বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা

এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে স্থাপন করে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা কিংবা করতে হবে। ভারতেও যে সাম্রাজ্যবাদের পদলেহনকারী মূহুর্মূহী বুর্জোয়া নেই তা নয়, তবে তাদের পাশাপাশি ভারতে একটি

প্রণালী সচেতন জাতীয় বুদ্ধোন্নয়ন আবির্ভাব ঘটছে। এদের নেতৃত্বে ভারতে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ—বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এরা জাতীয় আন্দোলনের উপর তাদের নেতৃত্ব বজায় রাখতে পারায় ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে একটি জাতীয় বুদ্ধোন্নয়ন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ক্ষমতা পেলের পরে তাদের সঙ্গে দেশের জনগণের বিরোধ তাঁর আকার ধারণ করলেও তাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধ এখনও নিঃশেষিত হয়নি।

এই কারণে তারা সামাজ্যিক ক্ষেত্রে বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে শক্তির ভার সাময়িক পেরিবার্টন ঘটছে তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে। উদাহরণ হিসেবে নেহেরু অনুসৃত নীতির কথাই ধরা যাক। নেহেরু তৃতীয় বিশ্বের প্রথম বুদ্ধোন্নয়ন নেতা যিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তনের গুরুত্বটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এই ব্যাপারে সচেতন ছিলেন বলেই তিনি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে বুদ্ধোন্নয়নের গুরুত্ব প্রথম থেকেই উপলব্ধি করতে পারেন। কখনও কখনও এখানে ওখানে সরে এলেও মূলতঃ নেহেরু প্রদর্শিত পথেই ভারতের পরবর্তী কথগ্রহণ নেতৃত্ব মোড়িয়েয়ের সঙ্গে বুদ্ধোন্নয়নের নীতি অনুসরণ করেছে এবং তার উপর নির্ভর করে জোট—নিরপেক্ষতার পথ ও অর্থনৈতিক স্বয়ংস্ফূর্ততা অর্জনের পথ অনুসরণ করেছে।

কাজেই বর্তমান ঘটনাবলির থেকেই দেখা যায়—ধনতন্ত্রের পথের উপর নির্ভর করেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায়। আবার সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে ধনতন্ত্রের পথ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সম্মতি-পূর্ণ সংগ্রামের পথ নয়।

এই অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জাতীয় বুদ্ধোন্নয়নের বিরোধের দিকটি উপেক্ষা করলে যেমন ভুল হবে তেমনি আবার এই বিরোধকে বাড়িয়ে দেখলেও সমৃদ্ধ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বাড়িয়ে দেখার প্রবণতাটি উদগ্রভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। যখন, কেউ কেউ বলতে আরম্ভ করেছেন—সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জাতীয় বুদ্ধোন্নয়নের যেহেতু বিরোধ রয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদ যেহেতু মূল শত্রু তাই প্রমিত শ্রেণীকে কৃষক, পেটী বুদ্ধোন্নয়ন ও জাতীয় বুদ্ধোন্নয়নের নিয়ে একটি দেশপ্রমিত ফ্রন্ট গঠনে উদ্যোগী হতে হবে। কেউ কেউ আবার এই কথাও মূল্যায়ন—১০

বলেন যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আজ এত জরুরী যে সমাজ প্রগতির জন্য সংগ্রাম আপাতত স্থগিত রাখাই বাঞ্ছনীয়। বলাই বাহুল্য, এইসব যুক্তি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।

একথা সত্য, আজও ভারতের মত সদা স্বাধীন দেশের ক্ষেত্রে মূল শব্দ সাম্রাজ্যবাদ। আজও ভারতের বিপ্লব জাতীয় যুক্তি সংগ্রামের চরিত্র বিশিষ্ট। এ কথাও ঠিক আজও ভারত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর অতিক্রম করেনি। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজগুলিকে সমাপ্ত করা—বিপ্লবের বর্তমান স্তরে প্রধান কাজ।

তবে ১৯৪৭ সালে ভারতের রাজনীতিতে যে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটেছে সেটি উপেক্ষা করলে ভারতীয় বিপ্লবের রণনীতি সঠিকভাবে স্থির করা যাবে না।

১৯৪৭ সালের আগে ও '৪৭ সালের পরে মূল পার্থক্য এইখানে যে '৪৭ সালের পর ভারতের উপর সাম্রাজ্যবাদ আর আগের মত প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব করছে না। ১৯৪৭ সালের পরে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বুদ্ধোন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালের আগে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যেমন ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুদ্ধস্রোত গঠন করা সম্ভব ছিল (যাতে বুদ্ধোন্নত দেশী শব্দ একটি চালিকা শক্তি ছিল তাই নয় তারা জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিল।) এখন আর তা কোনো ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। এখন সাম্রাজ্যবাদ দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করছে নয়া—উপনিবেশবাদের রূপ পরিগ্রহ করে—প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধোন্নত সরকারের আপোষ নীতির দোহাত্তে। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে জাতীয় বুদ্ধোন্নত সরকারের আপোষ নীতির কল্যাণে ভারতের অর্থনীতিতে বিদেশী পুঁজি তার পুরোনো কুম্ভা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বজার রাখতে পেরেছে এবং নুতন নুতন ক্ষেত্রে এই কুম্ভা বৃদ্ধি পাচ্ছে (বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি সম্পর্কে ভারত সরকারের নমনীয় মনোভাব এর উদাহরণ)।

ধনতন্ত্রের পথ ভারতকে বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে চম্বকের মত টানছে। ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক শ্রমবিভাগের অংশীদার। সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্যের উপর নির্ভর করে বিশ্ব ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছুটা সংগ্রাম করা যায়; এই পথে কিছুটা স্বরস্ফুটতার নীতি অনুসরণ করাও সম্ভব। কিন্তু এই পথের ভিত্তিতে পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না। অর্থাৎ বিদেশী পুঁজির আধিপত্য থেকে দেশকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা এই পথে কখনই সম্ভব নয়।

(একমাগ্ন অ-ধনতান্ত্রিক পথেই সেটি সম্ভব)। কাজেই বর্তমান অবস্থায় মূল শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গেলে ধনতান্ত্রিক পথের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অনিবার্য। এই দুই সংগ্রাম আজ গুডপ্রাতভাবে জড়িত।

এই প্রসঙ্গে আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজগুলিকে ধনতন্ত্রের পথের ভিত্তিতে সমাধা করা যায় না। এই পথের ভিত্তিতে আমূল ভূমিসংস্কার সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। আর ধনতন্ত্রের পথের অনিবার্য পরিণতি একটোট্টা ধনিক গোষ্ঠীর ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধি।

ইতিহাসের বিচারে ধনতন্ত্র আজ মৃত্যু পথবাঠী। ধনতন্ত্রের ক্ষয়িকৃত্যর আগে এই পথের ভিত্তিতে কোনো সামাজিক সমস্যার মৌলিক সমাধান সম্ভব নয়। এই পথে ধনতন্ত্রের অমোঘ নিয়মে ধনী আরও ধনী আর গরীব আরও গরীব হতে বাধ্য। মূদ্রাস্ফীতি, বেকারী, মূল্যবৃদ্ধি এই পথের নিত্য সঙ্গী।

মনে রাখতে হবে, আমরা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করেছি। এই স্তরে সাম্রাজ্যবাদ মূল শত্রু হলেও—যেহেতু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ধনতন্ত্রের পথের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গুডপ্রাতভাবে জড়িয়ে পড়েছে তাই এই স্তরে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়া দূরে থাকুক, জাতীয় বুজোয়ারা বিপ্লবের চালিকা শক্তিও হতে পারে না। আসল কথা, জাতীয় বুজোয়া সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত না করে এই বিপ্লব সামাধা করা যাবে না। এই বিপ্লবে চালিকাশক্তি হবে শ্রমিক, কৃষক, পেটি বুজোয়া; এতে ক্রমবর্ধমানভাবে শ্রমিক শ্রেণী নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হবে। এই বিপ্লব ধনতন্ত্রের পথ বন্ধন করে অধনতান্ত্রিক পথ অর্থাৎ সমাজতন্ত্রমুখীনতার পথ গ্রহণ করবে।

এই অবস্থায়, সাম্রাজ্যবাদ মূল শত্রু এই অস্থিলায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে ব্যাপকতর করার নামে কেউ যদি শ্রমিক বুজোয়া মৈত্রীকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেন তাহলে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজগুলি অসমাপ্তই রয়ে যাবে এবং কার্যত বুজোয়া গণতন্ত্রের কাছে ঘটবে আত্মসমর্পণ। অপরদিকে কেউ যদি বলেন সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের পথ উভয়ই মূল শত্রু তাহলে বিপ্লবের চরিত্রটি (কতটা গণতান্ত্রিক এবং কতটা সমাজতান্ত্রিক) সম্পূর্ণে বিজ্ঞানি ঘটবে। কার্যত ধনতন্ত্রের পথের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেয়ে বেশী গুরুত্ব লাভ করবে।

আসল কথা, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জাতীয় (সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী)

চরিত্রটি যেমন মনে রাখতে হবে, তেমনই তার বৈপ্লবিক চরিত্রটিও বিস্মৃত হলে চলবে না। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চেহেল্লির মধ্যে যথাসম্ভব বৈপ্লবিক উপাদানে বিপ্লবকে সমৃদ্ধ করা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ—যে বৈপ্লবিক উপাদানগুলি প্রাথমিক ও অন্যান্য নিবর্তিত প্রেক্ষাগুল্লির স্বার্থ সুরক্ষিত করবে। যোগুল্লিক বুদ্ধোন্নয়ন প্রেক্ষাগুল্লির চোখে দেখবে। এক কথায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতন্ত্র উত্তরণের লেনিনীয় পরিপ্রেক্ষিতটি সামনে রেখে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নতুন কর্মসূচী : আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

রবীন্দ্র দাশগুপ্ত

সমাজ বিকাশের এক একটা ঐতিহাসিক স্তর অতিক্রম করে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের আরও পরিকল্পিত এবং পূর্ণাঙ্গ উন্নয়নের মাধ্যমে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে চলেছে। কমিউনিস্টদের প্রথম কর্মসূচী কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস ও এঙ্গেলস যে শোষণ হীন সমাজ ও সাম্যবাদের আদর্শ শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষের কাছে তুলে ধরেছিলেন, যে আদর্শ বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীকে উদ্বীপিত করেছিল, সেই আদর্শ সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রমে ক্রমে রূপায়িত হতে চলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীর নতুন সংস্করণে দেশের মানুষের কাছে গৃহগতভাবে নতুন বিশ্বের লক্ষ্য তুলে ধরা হয়েছে। সেই নতুন রাষ্ট্র হল জনগণের সামাজিকতান্ত্রিক স্বশাসন এবং তাকে রূপায়িত করার সবজীবীন রূপরেখা বর্ণিত হয়েছে সোভিয়েত পার্টির এই নতুন কর্মসূচীতে। এই কর্মসূচীতে কেবল দ্রুত সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশের কথাই বলা হয় নি, বলা হয়েছে এই কর্মসূচী হল বিশ্বশান্তি এবং সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রামের কর্মসূচী।

তাই এই কর্মসূচী হল আন্তর্জাতিক গুরুত্ব সম্পন্ন। এই কর্মসূচী বিশ্ববাসীর কাছে প্রচারিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথে গুরুত্বপূর্ণ চূড়ান্ত বিচ্যুতির উল্লেখ এবং বলিস্ট আত্মসমালোচনা। এঙ্গেলস গোটা প্রোগ্রামে বলেছেন, বিশ্বের মানুষ পার্টিকে বিচার করে তার কর্মসূচী দিয়ে। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন সব সময় গুরুত্ব আরোপ করেছেন মতাদর্শ এবং নীতির ওপর, যা পার্টির কর্মসূচীতে ও তার সমস্ত কর্মকাণ্ডকে পরিচালিত করে। আমাদের বারবার স্মরণ করা উচিত রাশিয়ার পার্টি কর্মসূচী রচনার সময় লেনিনকে সঠিক মতাদর্শগত নীতির জন্য এবং সব রকম বিচ্যুতির বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী রচনার সময় বিচার কল্পতে

হয় দেশের ও সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষর এবং তার তারতম্য, লিপিবদ্ধ করতে হয় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি, শ্রেণী শক্তি সমূহের বিন্যাস, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের পরিপক্বতার ক্ষর। এসব বিচার করেই পার্টির রণনীতি ও রণকৌশল স্থির করতে হয়, নির্ধারণ করতে হয় দীর্ঘ ও আশু মেয়াদী লক্ষ্য ও পার্টির কার্যকলাপ। এ সবই সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রোগ্রামের নব সংস্করণে সূচীকৃতভাবেই বলা হয়েছে।

এই পার্টি প্রোগ্রামের একটা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা আছে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রোগ্রামের বিবর্তন ও ধারাবাহিকতার মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সমাজ বিকাশের ধারা, পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী পতন এবং সাম্যবাদের সুনিশ্চিত বিজয়। এটা কোন একটা দেশের মধ্যে সীমিত নয়, এটা হল সার্বজনীন এবং আন্তর্জাতিক ধারা।

১৯০০ সালে পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত প্রথম কর্মসূচী অনুসারে বলশেভিক পার্টি শ্রমিক কৃষক ও সমস্ত মেহনতী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে জারকে এবং পরবর্তী কালে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। ইতিহাসে সর্বপ্রথম শ্রমিক কৃষকদের এক নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল। একটা নতুন বিশ্বের জন্ম হল।

১৯১৯ সালে পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে সমাজতন্ত্র নির্মাণের কর্মসূচী গৃহীত হল। এক সম্পূর্ণ নতুন কর্মসূচী, পথও ভিন্ন, রাষ্ট্রের চারিদিক শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব, ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্বভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছিল এবং শোষক শ্রেণীর সমস্ত প্রতিরোধ চূর্ণ করে লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতন্ত্র নির্মাণের কর্মসূচী কার্যকরী করল। রুশ দেশের জনগণের জীবনে সমাজতন্ত্র একটা বাস্তব ঘটনা হয়ে উঠল। বিশ্ব পরিস্থিতিতে এক নতুন ঐতিহাসিক উপাদানের আবির্ভাব হল। তখনও কেউ জানত না যে এই সদ্যজাত উপাদান বিশ্বের বৃকে এক পরাক্রমশালী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে এবং পরাধীন দেশের মুক্তিসংগ্রামের এক অপ্রতিরোধ্য বর্ম এবং সবরকম সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে এক পরাক্রমশালী শক্তিশেল হয়ে উঠবে।

১৯৬১ সালে দ্বাদশবার্ষিক কংগ্রেসে পার্টি তৃতীয় কর্মসূচী গ্রহণ করল, যার লক্ষ্য হল জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাম্যবাদ নির্মাণ করা। সোভিয়েত জনগণ উপাদানী শক্তির অভূত পূর্বে বিকাশে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং মানব চরিত্রের গুণগত পরিবর্তনে বিরাট সাফল্য অর্জন করল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রমে উন্নত সমাজতান্ত্রিক ক্ষরে প্রবেশ করল। সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন

আগ্রাসন এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্ব শান্তির প্রস্ফ, গণতন্ত্র ও সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থান বিশ্বজনীন ভূমিকা অর্জন করল। মার্কসবাদী ও লেনিনবাদী তত্ত্ব, মতাদর্শ, তার বিকাশ ও প্রয়োগই হলে প্রেরণা-দায়ক শক্তি ও পথপ্রদর্শক।

১৯৮৬ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে কর্মসূচীর নতুন সংস্করণ গৃহীত হয়েছে। এই কর্মসূচীর লক্ষ্য হল সমাজতন্ত্রের সর্বজনীন উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে পরিকল্পিত ভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক দ্রুত উন্নয়নের প্রথ, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রথ অগ্রসর হওয়া। সমাজতন্ত্র একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সামাজিক গঠন নয়। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের মধ্যে কোন প্রাচীর নেই। সমাজতন্ত্র হল সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার একটা স্তর। সমাজতান্ত্রিক স্তরকে এড়িয়ে বা ভিসিয়ে সাম্যবাদে পৌঁছান যায় না। আর এই স্তরকে এড়িয়ে বা ভিসিয়ে উৎপাদনী শক্তি প্রভুত বিকাশ না করে, মানুষকে আদর্শগত, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মানে উন্নত না করে সাম্যবাদী নীতির হঠকারী প্রয়োগ যে ব্যর্থতার পর্ব্বাসিত হয়, ইতিহাসই তার সাক্ষ্য বহন করে। সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ একটা নতুন বিপ্লব নয়, এটা হল সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক ধারা।

এই কর্মসূচী হল সোভিয়েত সমাজের বর্তমান ব্যবস্থার সর্বজনীন ও পরি-কল্পিত উন্নতির ভিত্তিতে সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর হওয়া। জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক স্ব শাসন প্রতিষ্ঠাই এর লক্ষ্য।

প্রোগ্রামে বর্ণিত বিরাট কর্মকাণ্ডের মধ্যমাণি হল মতাদর্শগত কাজ। কর্মী নিবাচন, নেতৃত্ব গঠন, সৈন্যদল কাজের পদ্ধতি, উৎপাদন সমস্যা, রাষ্ট্র-পরিচালনা, সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রশাসন ও রাষ্ট্র-পরিচালনার জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলায় জনা মার্কসবাদ লেনিনবাদের অনুশীলনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একমাঠ এই দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজে দ্রুতি কিছুটি এবং যে নতুন নতুন সমস্যায় উদ্ভব হচ্ছে তার সমাধান করা সম্ভব।

কর্মসূচীর দুটি দিক আছে। একটা হল সোভিয়েত ইউনিয়নের আভ্যন্তরিক দিক অর্থাৎ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজতন্ত্রকে সর্বজনীন ও পরিকল্পিতভাবে সমৃদ্ধ করা। অপর দিকটা হল সার্বজনীন দিক অর্থাৎ যুদ্ধ-শান্তির প্রস্ফ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ফ্রন্ট গড়ে তোলায়, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিখরগে, মার্কসবাদ লেনিনবাদ থেকে কিছুটির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে, জাতীয় মূল্যে সন্ত্রাসে সম্পর্কে এবং সর্বোপরি বিশ্বসমাজতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পদ্ধতির কঠোর পথ নির্দেশ করা।

কর্মসূচীর প্রেক্ষাপট

সোভিয়েত ইউনিয়নে উন্নত সমাজতন্ত্রে মানব সভ্যতার চরম বিকাশ সত্ত্বেও সমাজতন্ত্র এখনও পূর্ণাঙ্গ বা নিখুঁত হয় নি। সোভিয়েত ইউনিয়নকে অনেক বিষয়াগত কঠিন অবস্থার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বিশ্বায়িত কারণে এখনও অনেক সমস্যার সমাধান হয়নি। সেখানে অনেক রকম বিরোধ ও ভার-সাম্যহীনতা বর্তমান। উন্নত সমাজতন্ত্রকে নিখুঁত করে তোলার অর্থই হচ্ছে সাম্যবাদের দিকে বাস্তব ও দ্রুত অগ্রগতি। এই কারণে নতুন কর্মসূচীতে বলা হয়েছে যে উন্নত সমাজতন্ত্রকে সবোচ্চতম ভাবে নিখুঁত করে তোলাই হল পার্টির কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্মাণের প্রথম স্তরে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যাই সর্বোচ্চে উল্লেখযোগ্য। এখনও শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতার আশানুরূপ উন্নতি হয় নি কারণ অর্থনীতিতে উন্নত যন্ত্রপাতির পাশাপাশি রয়েছে সেকুলে যন্ত্রপাতি ও কারখানা। এখনও অনেক লোক রয়েছে যাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা নেই। শ্রমশক্তির মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ অদক্ষ শ্রমিক। খাদ্য সমস্যা পূর্ণভাবে সমাধান করা যায় নি। এখনও মানুষের চেতনার ও আচার আচরণে অতীতের অবশেষ বিদ্যমান।

এই সব ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি বৃদ্ধি হয়ে যায় নি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধ থাকবেই কিন্তু সেই বিরোধের চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। এইসব বিরোধ শ্রেণীগত বিরোধ নয়, বৈরীমূলক বিরোধ নয়। বিভিন্ন ধরনের বিরোধ সমাধান করে সমাজতন্ত্রকে অগ্রসর হতে হয়। লেনিন বলেছিলেন বিরোধের মধ্যেই জীবনের অগ্রগতি নিহিত রয়েছে এবং জীবন্ত বিরোধ-গুলির মর্মবস্তু এতই গভীর এবং বৈচিত্রময় ও তার মর্মবস্তু এতই সমৃদ্ধ যে তা মানুষের মনে প্রথম দর্শিতে ধরা পড়ে না।

কিন্তু এই বিরোধগুলি বুর্জোয়া উৎপাদন সম্পর্কের মত বৈরীমূলক বিরোধ নয়। সমাজতন্ত্রে সামাজিক অগ্রগতি শ্রেণী বিরোধের মাধ্যমে হয় না। অগ্রগতি হয় পার্টি পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ও গণসংগঠনে জনগনের সচেতন এবং ঐতিহাসিক স্বজনশীল ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে।

বিরোধগুলি কি

প্রথমত : কৃষি এবং শিল্প বিকাশের মধ্যে ব্যবধান, কৃষি এখনও শিল্পের পেছনে পড়ে আছে; এখনও অনেকগুলি শিল্প শ্রমিকেরা কারিক শ্রমে

নিষ্পত্তি অথচ প্রমশাসিত ঘাটতি রয়েছে। অত্যাধুনিক শিল্পের পাশাপাশি কাজ করছে এমন শিল্প বার যন্ত্রপাতি হল সেকেন্দ্রে। একদিকে সমৃদ্ধ হয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং মতাদর্শের মৌল নীতিগুলি এবং অপরদিকে চলছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা লঙ্ঘন, কিছু কিছু নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। রুটিন মারফিক কাজ এবং আমলা-তান্ত্রিক আচরণের ঘটনাও রয়েছে। এই বিরোধগুলির চিহ্ন হল সব বিষয়গত।

দ্বিতীয়ত : সমাজতান্ত্রিক সমাজে দ্বিতীয় ধরনের বিরোধের উদ্ভব হয়েছে সমাজ বিকাশের বাস্তব নিয়মের সঙ্গে জনগণের কর্মকাণ্ডের সাম্যাত্মকতার অভাব থেকে ; সমাজ বিকাশের বেশ কিছু চাহিদা পূরণের জন্য জনগণের সচেতন প্রয়াস আশানুরূপ নয়, কাজের ধরণ বা পদ্ধতি, সামাজিক পরিচালনার সৈন্যদল কাজে ভুল চুটীগুলি প্রত্যুৎপন্নোদনের জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি।

সমাজতন্ত্র নির্মাণের বিরাট কর্মকাণ্ডে এ ধরনের বিরোধ আদৌ অস্বাভাবিক নয়। তবে যথা সময়ে বিরোধগুলিকে চিহ্নিত করে তার সমাধানের ওপর পাটির নতুন কর্মসূচিতে বিবেচনা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

তৃতীয় ধরনের বিরোধ : উৎপাদনী শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে, উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে উপরি কাঠামো এবং সর্বক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। দৃষ্টান্ত হল এংলণ্ডের বিরোধের মধ্যে রয়েছে উৎপাদনের বৈষয়িক শক্তি ও প্রমশাসিত বিরোধ ; উৎপাদনের সামাজিক চরিত্রের ভিত্তি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানার ধরণ এবং পরিচালনা কাঠামো এবং পদ্ধতির মধ্যে বিরোধ ; কাজ অনুপাতে বর্টন এবং পারিত্রিক কনজামসন ফান্ড এর মধ্যে বিরোধ ; প্রত্যক্ষভাবে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন এবং পণ্য-টাকার সম্পর্কের মধ্যে, সমগ্র এবং ভোগের মধ্যে, এবং জনগণের ক্রমবর্ধমান শিক্ষার ভিত্তি ও সচেতনতা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের অংশ গ্রহণের মাঠের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। সমাজতন্ত্র এই সমস্ত বিরোধের সমাধানের মধ্য দিয়েই সমাজতান্ত্রিক সমাজ আরও বিকাশ লাভ করে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে যুক্তোঁরা সমাজের উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজে এই বিরোধের গুনগত পার্থক্য আছে। যুক্তোঁরা সমাজে এই বিরোধ হল বৈষম্যমূলক

যার সমাধান এই সমাজে হতে পারে না বলে জনশ্রুতির সংকট সৃষ্টি হয় এবং তার পতন ও হয় অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে এই বিরোধ আদৌ বৈরীমূলক বিরোধ নয় কারণ বৈরীমূলক বিরোধের যে প্রধান উৎস সম্পত্তির বান্ধিগত মালিকানা তা রূপ বিস্তারই বিলুপ্ত হয়েছে। মাক'স বলেছেন “বান্ধিগত সম্পত্তির বিলোপই হল সমাজতন্ত্র।” অতএব সমাজতন্ত্রে এই বিরোধগুলি সমাধান করা সম্ভব এবং এই পথেই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হবার লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীর নতুন সংস্করণে।

পার্টির রূপনীর্তি

পার্টির রূপনীর্তিগত লাইন বিস্তারণ করার পূর্বে লক্ষ্য হিসেবে উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হয়েছে সাম্যবাদের মহানীর্তি “From each according to his ability, to each according to his needs” এবং সাম্যবাদী সমাজ এমন একটি সমাজ যেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে জনগণের স্ব-নয়কার এবং যেখানে শ্রম হবে সমাজের মঙ্গলের জন্য। কর্মসূচীতে এই দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ঘোষণা করার অর্থই হচ্ছে গোটা সমাজকে মাক'সবাদ-লেনিনবাদের আদর্শে শিক্ষিত করা, অনুপ্রানিত করা, নতুন কর্মোদ্যোগ সৃষ্টি করা এবং সাম্যবাদী সমাজে নৈতিক জীবনের নতুন মূল্যবোধের নবদীপ্ত উন্মোচন করা। লক্ষ্যহীন কর্মসূচীতে জীবনের স্পন্দন অনুভূত করা যায় না। কিন্তু যে লক্ষ্য জনমানসে অনুভূত হয় সেই লক্ষ্যের প্রবল শক্তি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী হল সেই কর্মসূচী যেখানে ভবিষ্যতের নব জীবনের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। এই কর্মসূচীকে আধুনিক কালের কমিউনিস্ট ইস্তেহসার বলে অভিহিত হবে না।

পার্টির কর্মসূচীতে বলা হয়েছে—সোভিয়েত সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন সাধন করতে হবে; বৈজ্ঞানিক এবং কৃষকোপলব্ধ বিপ্লবের সাফল্যের ভিত্তিতে তার বৈষয়িক এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত ভিত্তির মৌলিক নবীকরন করতে হবে, সামাজিক সম্পর্ক, সর্বোপরি সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পর্কে নিখুঁত করে গড়ে তুলতে হবে; জনগণের বৈষয়িক এবং সাম্প্রদায়িক অবস্থা একত্রিত করে ও মর্মবশতুতে প্রসাদ পরিবর্তন আনতে হবে; রাজনৈতিক, সামাজিক এবং মতাদর্শগত ভাবে সমস্ত ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হবে।

উন্নত সমাজতন্ত্রকে নিখুঁত করতে হলে কেবল সর্বাধুনিক বাণ্যপার্টির ওপর নির্ভর করলে চলে না। আরও নির্ভর করতে হয় সাধারণ মানুষের

ক্রমবর্ধমান ভূমিকার ওপর, যে ভূমিকা হল সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল এবং ঐতিহাসিক লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সচেতন এবং সক্রিয়। এর ফলে শ্রমশক্তির উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতার অভাবনীয় উন্নতি হবে, বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত এবং সাংগঠনিক-অর্থনৈতিক স্তরের মূল গত পরিবর্তন হবে। তাতে কেবল পণ্য উৎপাদন বাড়বে না, পণ্যের মানেরও উন্নতি হবে এবং বাজারে সর্বশ্রেণীর ও সর্বরকম দরের পণ্যের ঘাটতি হবে না। এবং ভবিষ্যতে কৃষি সমবায়, সমবায় সম্পত্তি এবং জনগণের সম্পত্তির মিলনের সম্ভবনা সৃষ্টি হবে।

সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষের জীবন যাত্রার মান আরও উন্নত হবে, শহর এবং গ্রামের জীবন যাত্রা ও সাংস্কৃতিক মানের এবং সামাজিক—অর্থনৈতিক ব্যবধান ক্রমেই দূরীভূত হতে থাকবে। কার্যিক ও মানসিক শ্রমের সমন্বয় হবে আরও গভীর।

এই কারণেই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই গণতন্ত্র উচ্চচেতনা সম্পন্ন এবং মার্কসবাদ লেনিনবাদী আদর্শে সূচীকৃত মানুষের গণতন্ত্র—যার লক্ষ্য ও গতিপথ হল সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে। এই বিরাট কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হল তত্ত্ব, আদর্শ, কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী এবং অনর্দ্বপভাবে পরিচালিত পার্টি সংগঠন, সম্মিলিত নেতৃত্ব, কর্মী নির্বাচন এবং কর্মপদ্ধতির বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ।

সোভিয়েত পার্টির

অর্থনৈতিক মূল বিষয় :

পার্টির অর্থনৈতিক স্ট্রাটেজির মূল বিষয় হল বৈজ্ঞানিক এবং কৃৎকৌশলগত উন্নতিকে ত্বরান্বিত করা। জাতীয় অর্থনীতিকে নতুন কৃৎকৌশলগত পদক্ষেপগুলির ওপর দাঁড় করাতে হবে যাতে সমাজের বৈষয়িক ভিত্তি দৃঢ় পরিবর্তন করা যায়।

এই কর্মসূচীতে প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থার দ্রুত নবীকরণ, ব্যাপকভাবে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, উৎপাদনের সমস্ত সেক্টরে যন্ত্রীকরণ, কলকারখানার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা প্রচলন, উৎপাদন ব্যবস্থার কর্মপট্টোর নিয়োগ, বিদ্যুৎ, রাসায়নিক ব্যবস্থা এবং ব্যাপকভাবে রোবোট প্রচলনের ওপর।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃৎকৌশলগত শক্তিকে আরও উন্নত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে যাতে

অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা যায়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে বিজ্ঞানকে উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিচালন শক্তিতে পরিণত করতে হবে।

স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলন করার ফলে শ্রমিকদের কার্যিক শ্রমের বিরাজিত কর যন্ত্রনা বহুলাংশে লাঘব করতে হবে, কঠোর শৃংখলা প্রবর্তন এবং উৎপাদনের মানোন্নয়ন করতে হবে। সময়ের অপচয় বন্ধ করতে হবে।

প্রসঙ্গতঃ মার্কস সময়ের অপচয় বন্ধ করা ও তাকে সন্যাসহার করাতে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রথম অর্থনৈতিক নীতি বলে বর্ণনা করেছিলেন। এখন এটা কেবল প্রথম অর্থনৈতিক নিয়ম নয়, সমাজতন্ত্রের আরও বিকাশ ও সাম্যবাদের যাত্রার পথে এটা প্রথম সামাজিক নিয়মে পরিণত হয়েছে।

কর্মসূচীর নতুন সংস্করণে বলা হয়েছে যে আগামী ১৫ বছরে শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতাকে ১০০-১৫০ শতাংশে বাড়াতে হবে। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি, প্রবোর মানোন্নয়ন এবং কৃৎকৌশল জ্ঞানের সাঠিক উন্নয়ন হল পাট্টির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মূল বিষয়।

সারা বিশ্বে সোভিয়েত অর্থনীতিকে সবচেয়ে বেশী আধুনিকীকরণ এবং কর্মডাশীল করার জন্য ভারী শিল্পকে অর্থনৈতিক শক্তির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

বুজ্জেরা সমালোচকেরা বাই বন্ধুক না কেন, এই কর্মসূচী মূদ্যানে সাফল্য নতুন যুগের মর্মবস্তুকে অভূতপূর্বভাবে সমৃদ্ধ করে তুলবে, বিশ্ব শক্তির ভারসাম্যকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শক্তির পক্ষে পরিবর্তন করে দেবে, বিশ্ব জনতন্ত্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতায় সোভিয়েত ইউনিয়ন নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেণী শীর্ষস্থান অধিকার করবে, পূর্জিবাদের সংকটকে আরও তীব্র করে তুলবে, সদ্য স্বাধীন দেশগুলির সাঠিক উন্নতির পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ যে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে তাকে বহুলাংশে পরাজিত করে সেই সব উন্নয়নশীল দেশগুলির অগ্রগতির পথকে প্রশস্ত করে তুলবে এবং ফলে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এই সমস্ত দেশের বিরোধকে আরও তীব্র করে তুলবে।

তাই এই কর্মসূচী আপাত দৃষ্টিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্রুত উন্নয়নের কর্মসূচী বলে মনে হলেও এর আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

সোভিয়েত সন্যাজের

রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ

অষ্ট্রিকার বিরুদ্ধে ফলে বৃন্দদশে যে শ্রমিক প্রেলীয় একনায়ক

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা সমাজ পরিবর্তনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। লেনিন বলেছিলেন, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব হল শ্রেণী সংগ্রাম। অক্টোবর বিপ্লবে বৃজেরিয়া শ্রেণীকে পরাস্ত করে শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্রতন্ত্রমতাবলম্বন করেছিল। বৃজেরিয়া শ্রেণী পরাজিত হলেও তারা স্বতন্ত্রভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। বরং তারা নানাভাবে, এমনকি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলেছিল।

সুতরাং তখন শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল, বিপ্লবী সফল্যকে রক্ষা করার জন্য দমন পীড়নের সাহায্যে বৃজেরিয়া শ্রেণীকে একেবারে নিমূল করা। যদিও এই এক নায়কত্বের প্রধান লক্ষ্য ছিল নতুন সমাজ গঠন করা যেখানে কেউ কাউকে শোষণ করবে না।

সাম্রাজ্যবাদী বৃজেরিয়া এখনও তাদের স্বজাতি ও স্বশ্রেণীর বিলুপ্ত করণকে চুষতে পারে নি। তাই তারা বার বার বলে থাকে যে সোভিয়েত ইউনিয়নে মানব অধিকার লঙ্ঘিত, নিপীড়নের ফলে কারাগারে বন্দীদের আর স্থান হয় না। কমিউনিস্টদেরইত সাহসের সঙ্গে এই কুৎসার উত্তর দেবার কথা।

বাই হোক, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের তিনটি কাজ থাকে—

(১) দমনপীড়ন, (২) শিক্ষা (৩) স্জনশীল কাজ।

বৃজেরিয়া শ্রেণীর বিলুপ্তির পর এবং শোষণ-ব্যবস্থার অবসানের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের দমন পীড়নের কাজের অবসান হয়েছে। সমাজ-তন্ত্রের বিকাশের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের সামাজিক ভিত্তি প্রসারিত হয়েছে। তার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল শিক্ষা এবং স্জনশীলতা। এমনই ভাবে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের বিবর্তন প্রক্রিয়া পরিণত হয়েছে সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রে। কারণ সমগ্র জনগণই সমাজতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ এবং তাকে সমাজের জীবনে মূর্ত করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। এখন প্রধান কাজ হল সমাজতন্ত্রকে আরও নিখুঁত করা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করা, সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনকে মোকাবিলা করা, বিশ্ব শান্তি রক্ষা করা এবং সমস্ত দেশের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি নিজের দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।

এই কারণেই কর্মসূচীতে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যা ক্রমেই জনগণের স্ব-সরকারে পরিণত হবে। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ও রূপান্তর হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে সমগ্র জনগণের পার্টি।

মতাদর্শগত শিক্ষা

দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্যে কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্ব পরিবর্তনকারী মার্কসবাদ-লেনিনবাদী মতাদর্শকে পূর্ণমাঠায় ব্যবহার করবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেকটি মানুষের সর্বক্ষেত্রে নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য, সাংস্কৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ করার জন্য উদ্দেশ্য মূলক ভাবে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মতাদর্শ ও দর্শনের দ্বারা কেবল সোভিয়েত সমাজকে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে না, তাকে আরও বিকশিত করার পথ উন্মুক্ত করা হচ্ছে।

সোভিয়েতের দৃষ্টান্ত থেকে তত্ত্ব ও মতাদর্শের অসাধারণ সম্মিলনশীল পরিলাভিত হচ্ছে যা কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাম্যবাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না, সারা দুনিয়াকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে এবং তত্ত্বের সৃজনশীল বিকাশ ও ঘটছে।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে যে মতাদর্শগত সংহতির মানকে উন্নত করা, সাম্যবাদের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সৃষ্টি করা, সোভিয়েত দেশ-এবং সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদ, কাজ এবং রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি সম্পর্কে সচেতন মনোভাব সৃষ্টি করা, সাংস্কৃতিক সম্পদে জনগণকে আরও সমৃদ্ধ করা এবং সমাজতান্ত্রিক জীবনে নৈতিক বিরোধগুলিকে সমাধান করার জন্য মতাদর্শগত কাজই হবে প্রধান ভিত্তি।

কর্মসূচীতে বৃজ্জেরা মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পূর্বে বিশ্ব ব্যবস্থার-সমাজতন্ত্র এবং দনতন্ত্রের মধ্যে দুই দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শের মধ্যে যে সংঘাত চলছে সেই বিষয়ে এবং সাম্রাজ্যবাদের অমানবিক শোষণ চারিও সম্পর্কে যেমন সকলকে অবহিত করতে হবে, তেমনই আসল সমাজতন্ত্র কি তাহেও ঘরে বাইরে প্রচার করতে হবে। তাতে সোভিয়েত জনগণের রাজনৈতিক সতর্কতা বাড়বে, সামাজিক পরিদৃষ্টিকোণ ক্রিয়াকার করার দক্ষতা বাড়বে এবং পরিষ্কার প্রেমী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধকে উর্ে তুলে ধরা সম্ভব হবে।

আধুনিক বিশেষ প্রগতিশীল

ও প্রতিষ্ঠানশীল শক্তির মধ্যে সংগ্রাম

জার্মান ফ্যাসিবাদ ও জাপানে সম্রাটবাদের পতনের পর বিশ্বব্যাপী সমাজযুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলে সমাজতন্ত্র একটি দেশের সামান্য অতিক্রম করে একটা বিশ্বব্যবস্থার পরিণত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক

চাপ, মতাদর্শগত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার প্রয়াস এবং প্রতিক্রিয়াশীল অধ্যয়ন সংগঠিত করার চেষ্টাকে পরাস্ত করে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরও দ্রুত সাময়িকের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সমাজতন্ত্র এক নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান সহোচিত উৎসাহ হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি এবং বাস্তব অবস্থার চাহিদা। আর এর বিপরীতে চলেছে বনতান্ত্রিক বিশ্বে সর্বক্ষেত্রে অসম বিকাশের নীতি, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হল সকল শক্তি পশ্চাৎপদ ও দুর্বল দেশগুলিকে জড়িত করে নিজেরা সমৃদ্ধশালী হচ্ছে। অন্যদিকে এই অসম বিকাশের নিয়মের বিরুদ্ধে সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে যে দেশ অপেক্ষাকৃত দুর্বল তাকে সর্বজনীন সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে গোটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই উন্নত করার চেষ্টা চলেছে। এটা হল দুই বিপরীত ব্যবস্থার দুই বিপরীত নিয়ম।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তি সমূহের ভারসাম্য এক মৌলিক পরিবর্তন এনেছে। এই মৌলিক পরিবর্তন শক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতা এবং সমাজ প্রগতির জন্য যারা সংগ্রাম করে চলেছে তাদেরকেই সাহায্য করছে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নতুন কর্মসূচীতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে—“সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী আমাদের কালে সব চাইতে কতৃৎশালী (অধির্যোজিত) শক্তি এবং একে বাদ দিয়ে পৃথিবীর রাজ-নীতির কোন প্রশ্নই সমাধান করা যায় না”। এ হল বিশ্ব শক্তির সবচেয়ে বড় শক্তি। সর্বোপরি এই শক্তি হল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভিত্তি।

কিন্তু তা’ সত্ত্বেও বিশ্ব জনতন্ত্র এখনও শক্তিশালী এবং বিপ্লবজনক কিন্তু আভ্যন্তরীণ সংকটে বিদীর্ণ। জনতন্ত্রের সাধারণ সংকট আরও গভীর হয়েছে। এর থেকে তার মুক্তি নেই। ঐতিহাসিকভাবে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের ক্ষয়িকার শক্তি সত্ত্বেও উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ পূর্বাপেক্ষা অনেক গভীর হয়েছে। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের সঙ্গে অবিশ্লেষ্য মিলন ঘটেছে চক্রাকারে সংকট এবং কাঠামোগত সংকট। জনতন্ত্রে আভ্যন্তরীণ আন্দোলন বেড়ে চলেছে, উৎপাদনের হার কমে যাচ্ছে, আর বেড়ে যাচ্ছে বেকারী, পণ্যমূল্য, মূল্যবাহিতা, বাজের ঘাটতি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষণের পরিমাণ।

বহুজাতিক সংস্থাগুলি শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করে প্রচুর পরিমাণ মুনাফা করছে। এরাই সদ্য স্বাধীন দেশের সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করে

তুল্য, এমন কি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের জাতীয় স্বার্থকেও ক্ষুণ্ণ করছে। এটা আজ প্রমাণিত সত্য যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত বিপ্লবের ফলে সামাজিক বিপর্যয়ের ফলাফল হচ্ছে মারাত্মক। এই সব একত্ৰটিয়া পুনর্জগীতিয়া কৃষিতেও আধিপত্য বিস্তার করেছে। ছোট খাটো এবং মাকারী বুল্জোঁয়ায়াও এসের দ্বারা ক্রমবর্ধমান হারে শোষিত হচ্ছে।

রাজনীতির সর্বক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি হল সাম্রাজ্যবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামকে প্রতিহত করার জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়া ফ্যাসিবাদ ক্রমেই সক্রিয় হয়ে উঠছে। শ্রমিক শ্রেণীকে চিহ্নিতকৃত প্রথার দমন করতে বাধ্য হলে সাম্রাজ্যবাদ তখন নানা কৌশলে প্রতিক্রিয়াশীল একদায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করে তাকে সাহায্য করে। কেবল তা নয়, সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করার জন্য তারা ব্যাপকভাবে প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করে। এরাই হল আন্তর্জাতিক সংগঠনবাদের দৃষ্টি এবং সংগঠক।

আরও লক্ষণীয় যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে অসম বিকাশের চরিত্র প্রকট হয়ে উঠেছে। এরই জন্য বাজার, পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র, কাঁচা মালের উৎস এবং বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত বিকাশকে কেন্দ্র করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপ এবং জাপানের মধ্যে। বুল্জোঁয়ায়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ গভীর হচ্ছে। এই সাম্রাজ্যবাদই উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ এবং অনূন্নত দেশের মধ্যে বিরাত ব্যবধান সৃষ্টি করার জন্য দায়ী। অনূন্নত দেশগুলি কোন পথে নিজেদের দেশের স্বাধীন বিকাশ ঘটাবে সেই পথ বেছে নেওয়ার পথে গুরুত্বের বাধা সৃষ্টি করছে সাম্রাজ্যবাদই। ফলে অনূন্নত দেশগুলি হয়েছে ক্ষুণ্ণ, দারিদ্র্য এবং ব্যাপক ও হরেক রকম রোগের কেন্দ্র।

সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং মতাদর্শগত রূপনির্মাণের সমন্বয় সাধন করে সমাজতন্ত্র, জাতীয় মন্ত্রি আন্দোলন এবং সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সমগ্রামের একটা ফ্রন্ট গড়ে তুলতে সচেষ্ট।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার প্রধান হোতা হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। প্রধানত সেখানে থেকেই আসছে বৃক্ষের বিপদ। অন্যান্য রাষ্ট্রের ওপর হুকুমদারী, বিভিন্ন দেশে নানা কায়দার তাদের অনুগত প্রতিক্রিয়াশীল সরকার কার্যে করা এবং সেখানে তা সম্ভব নয় সেখানে অন্তর্ভুক্তমূলক কাজ সংগঠিত করা বা তাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করা হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পলিসি।

সাম্রাজ্যবাদ যে হারে পারমানবিক ও অন্যান্য অশ্রু নির্মান করে চলেছে ইতিহাসে তার নজির নেই। পারমানবিক অশ্রু নির্মাকারী একচেটিয়া পুঞ্জিপতিরা, সামরিক চক্র, রাষ্ট্রীয় আমলাতট, মতাদর্শগত হাতিয়ার এবং বিজ্ঞানকে সামরিকীকরণ—এই সর্বের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে সামরিক শিল্প সমাহার। এরা হল মৃত্যুর ব্যবসায়ী, চরম প্রতিদ্বন্দ্বিশীল এবং পেশাগত বৃদ্ধ বাজ।

সাম্রাজ্যবাদ যত বেশিই অংলম্বন করুক না কেন, মনতট বিকাশের অমোঘ নিয়মকে পরিবর্তন করতে পারবে না; একচেটিয়া পুঞ্জির সঙ্গে সমাজের শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর সংঘাতের অবসান হবে মনতটের পতনে। সমস্ত বিরোধগুলি রীতিমত প্রকট হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ মরণোন্মুখ পুঞ্জিবাদকে রক্ষা করতে পারবে না কারণ সাম্রাজ্যবাদ হল মরণোন্মুখ পুঞ্জিবাদের শেষ স্তর, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ব মূহূর্ত্ত মাত্র।

অতএব শ্রমিক শ্রেণী হল বর্তমান যুগের প্রধান বিপ্লবী শ্রেণী; নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য শেষ শোধন মূলক ব্যবস্থা ধনতটকে উচ্ছেদ করবে এই শ্রমিক শ্রেণীই।

শ্রমিক শ্রেণীই আদোলন এবং বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার নেতা হল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আদোলন। কমিউনিস্টরা শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে আরও সংগ্রাম করে সামাজিক প্রগতি, বিশ্বশান্তি, নিরস্ত্রীকরণ এবং সার্বজনীন নিরাপত্তার জন্য। কমিউনিস্ট আদোলন হল বর্তমানকালে সব চেয়ে বেশী প্রভাবশালী আদর্শগত এবং রাজনৈতিক শক্তি।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম :

যে সব দেশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং সমাজ প্রতির জন্য সংগ্রাম করেছে তারও বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের সমন্বিত সংগ্রাম বিশ্বশক্তির ভার সাম্য পরিবর্তন করে দিয়েছে। অথচ এসব দেশগুলি পশ্চাৎপদ। তাদের বৈজ্ঞানিক ও কৃষকৌশলের অভাবের সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ তাদের নির্মম ভাবে শোধন করে প্রভূত মূল্য অর্জন করেছে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ থেকে যে প্রভূত পরিমান ঋণ নিয়েছে, সেই ঋণের বোকা হয়েছে এই সব দেশকে নির্মম ভাবে শোধন করার একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

এই হাতিয়ারের বিরুদ্ধে, নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এবং সদ্য স্বাধীন দেশগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার বিরুদ্ধে, এবং বর্ণ বিদ্বেষী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রবল আকার ধারণ করেছে। জনগণের এই প্রতিরোধ সংগ্রাম বিধগত ভাবে স্বাধীনতা, শান্তি এবং সমাজ প্রগতির সংগ্রামের সঙ্গে সামগ্রিক ভাবে যুক্ত হয়েছে।

যে সমস্ত সদ্যস্বাধীন সমাজতান্ত্র্যমুখীন দেশ অধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করেছে তাদেরও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। তারাও এই বিশ্ব বিপ্লবী প্রতিক্রিয়ার অঙ্গীভূত হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সদ্যস্বাধীন দেশগুলির বিরোধ ক্রমবর্ধমান। কারণ বেশিরভাগ সদ্যস্বাধীন দেশ আর পূর্বের মত সাম্রাজ্যবাদের অনুগত কৃষিপণ্যের বাজারে পরিণত হতে চায় না, নিজেদের দেশের স্বাধীনতাকে সাম্রাজ্যবাদের কাছে বিক্রি করে দিতে চায় না। সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ থেকে নিজেদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তারা সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে সহযোগিতার পথ বেছে নিয়েছে।

বর্তমান কালের প্রধান সমস্যা

বর্তমান কালে মানব সভ্যতার সাহসে সব চেয়ে বড় বিষয় যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যা। সাম্রাজ্যবাদই দুটি বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী। তারাই আবার বিশ্ব পারমানবিক যুদ্ধ বাধিয়ে মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। পারমানবিক যুদ্ধে হারাজিতের কোন প্রদ্য নেই কারণ মানব সমাজই ধ্বংস হয়ে যাবে।

বিজ্ঞান এবং কৃৎকৌশল শাসিতক বিপন্ন করেছে না। সাম্রাজ্যবাদীরা বিজ্ঞান এবং কৃৎকৌশলকে শাসিতক বিপন্ন করার জন্য ব্যবহার করেছে। যুদ্ধ বাজাদের সবেত না করলে যুদ্ধের বিপদ বাড়তেই থাকবে।

যুদ্ধের থেকে মৃত্যির একমাত্র পথ হল দুই বিপরীত সমাজব্যবস্থার মধ্যে সহ-অবস্থান। এটা একটা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থার সকলদেশের মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে বিজ্ঞানকে মানব কল্যাণে ব্যবহার করা যাবে এবং যে সমস্ত দেশ স্বাধীন বিকাশের পথ অনুসরণ করেছে তাদেরও বাহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। বিশ্ব সমস্যাগুলিকে সম্মিলিত প্রচেষ্টার সমাধান করার পথও উন্মুক্ত হবে।

যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী শান্তি আন্দোলন ব্যাপক ভাবে গড়ে

উঠেছে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সার্বিক শক্তিশালী বিশ্ববাসীর মনে আশার সঞ্চার করেছে এবং তৃতীয় বিশ্ব ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে গোষ্ঠার।

এই কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতির ফলে যুদ্ধের বিপদ বাস্তব হলেও যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী নয়। যুদ্ধকে রোধ করা সম্ভব এবং মানব সভ্যতাকেও রক্ষা করা সম্ভব। এটা হল সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক লক্ষ্য, বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ এবং সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের লক্ষ্যও তাই। এই কারণে সোভিয়েত পার্টি সাধারণ এবং পূর্ণ নিবন্ধীকরণ, সামরিক প্রস্তুতির ক্ষেত্র সংকোচন, পারমানবিক অস্ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন, গণহত্যাকারী অস্ত্রের উৎপাদন বন্ধ করা ইত্যাদি প্রস্তাব সাব্রা বিশ্বের মানুষের কাছে উপস্থিত করেছে এবং কোন পক্ষেরই সামরিক প্রেরণা অর্জন প্রদানের বিরোধিতা করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক নীতির লক্ষ্য

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে দৃঢ় ভাবে বিরোধিতা করা এবং সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর গঠনমূলক সমাধানের আলোচনা চালাতে হবে। এই উদ্দেশ্যের সমকালীন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক নীতির লক্ষ্য। যুদ্ধ ও অশান্তিজনিত বিশ্ব হল সমাজতন্ত্রের আদর্শ।

সোভিয়েত পার্টি অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কে আরও শক্তিশালী করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ঐক্য যেমন প্রত্যেকের স্বার্থসিদ্ধি করবে তেমনই বিশ্বশান্তিকে রক্ষা করবে এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বিজয়কে সুনিশ্চিত করবে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শাসক পার্টি—কমিউনিস্ট এবং ওয়াকাস পার্টির সার্বিক ঐক্যই হল এর চ্যালেঞ্জা শক্তি। সোভিয়েত পার্টি মনে করে, বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোট ন্যাটো বজায় থাকবে, ততদিন ওয়ার্ল্ড ট্রিক সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের হাতিয়ার হিসেবে বজায় রাখতে হবে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে আর্থিক, রাজনৈতিক সহযোগিতা আরও বাড়িয়ে ডোলার ওয়াল পার্টি কর্মসূচীর নব-সংস্করণে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েতের সম্পর্ক

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে

দেশেরই ভূমিকা বর্তমান যুগের বিপ্লবজনীতি ও অর্থনীতিতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। লেনিন বলেছিলেন—সদ্যাবাদীন দেশের মানুষ মানব সভ্যতার ভাণ্ডার পরিবর্তনে এবটা বড় ভূমিকা পালন করবে। সোভিয়েত পার্টি বিশ্বাস করে যে শান্তি এবং সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব ক্রমবর্ধমান।

এই কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন সদ্যাবাদীন দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন এবং তার সম্প্রদায়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সদ্যাবাদীন দেশগুলির সাবভৌমত্বকে মর্যাদা দেয়, তাদের সমান অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং বিশ্বশান্তি ও সাবজনীন নিরাপত্তা এবং সাম্রাজ্যবাদেরও নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামকে সমর্থন করে।

পার্টি সমাজতন্ত্রমুখীন দেশগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সমস্ত দেশগুলিকে সর্বপ্রকার সাহায্য দিচ্ছে এবং তাদের প্রতিরক্ষা বাবদ্ব্যক্কেও শক্তিশালী করে তুলছে।

সোভিয়েত পার্টি সদ্যাবাদীন দেশগুলির বিপ্লবী গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছে। বিশেষ করে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করেছে যাদের কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমস্ত জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল পার্টির সঙ্গে সোভিয়েত পার্টি সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সদ্যাবাদীন দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক প্রমান করেছে যে যারা দনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করে দেশের উন্নতি করতে চায় তাদের সঙ্গেও সহযোগিতার বাস্তব ভিত্তি আছে। এর অর্থ হল দনতান্ত্রিক পথ অনুসরণকারী সদ্যাবাদীন দেশগুলি বিশ্ব শান্তি রক্ষা করতে চায়; আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করতে এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতা অবসানে বিশেষ আগ্রহী। এর অর্থ হচ্ছে জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের হুকুমদারী ও সম্প্রদায়বাদী নীতির বিরোধ তাঁত হয়ে উঠছে। এর আরও অর্থ হচ্ছে এসব দেশ নিজেদের দেশের সাবভৌমত্ব রক্ষার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী।

দেশের স্বার্থে কোন পথ অনুসরণ করা উচিত এ ব্যাপারে সদ্যাবাদীন দেশগুলির মধ্যে মতের পার্থক্য থাকলেও দেশের সাধারণ মানুষ সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ এবং তারা চায় দেশের সর্বজনীন উন্নতি ও স্বাধীন বিকাশ। সোভিয়েত ইউনিয়ন জনগণের এই বাসনাকে সমর্থন করে এবং মনে

করে যে সদস্যবাহীন দেশগুলি কোন ধরনের সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তা নির্ধারণ করার তাদের পূর্ণ অধিকার আছে।

সাম্রাজ্যবাদ এবং বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবি এবং নিজেদের সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার জনগন যে সংগ্রাম করছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি তাকে সমর্থন করে।

সোভিয়েত পার্টির কর্মসূচীতে পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, যে সব দেশ তাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় মর্যাদা রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে সোভিয়েত ইউনিয়ন সব-সময় তাদেরই পক্ষে রয়েছে। তাদের সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ বর্তমান যুগে শান্তি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য সাধারণ সংগ্রাম।

বিশ্বরাজনীতিতে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কর্মকাণ্ডকে সোভিয়েত পার্টি সমর্থন করে। সদস্যবাহীন দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতা এবং তাদের উন্নয়নে সাহায্য আন্তর্জাতিকতাবাদেরই নিদর্শন।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক, শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের জন্য সংগ্রাম

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে দুই বিপরীত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যে বিরোধ চলেছে তার সমাধান হতে পারে উভয় ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের ভিত্তিতে। যুদ্ধের মাধ্যমে এই বিরোধের সমাধান হতে পারে না কারণ পারমানবিক যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের প্রত্য একেবারে অবাঞ্ছনীয় হয়ে গেছে। এই যুদ্ধের পরিণাম হবে মানব সভ্যতার ও বিশ্বসভ্যতার ধ্বংস। এই সত্য আজ বিশ্বব্যাপী অনুভূত হচ্ছে। তাই সকলে অনুভব করছে যে যুদ্ধের দ্বারা বা বলপ্রয়োগের দ্বারা সমস্যা সমাধানের পথকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, বর্জন করতে হবে। আলোচনার মাধ্যমে, কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে, কারণ ও বিরুদ্ধে আগ্রাসন না চালিয়ে, সকল দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদা দিয়ে, বলপূর্বক কোন দেশের সীমানা লঙ্ঘন না করে এবং আন্তর্জাতিক রীতিনীতি মেনে জটিল সমস্যাবলীর সমাধান করতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদীরা বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই নীতি লঙ্ঘন করে পারমানবিক যুদ্ধের এবং নিজেদের সামরিক প্রেত্বে প্রতিষ্ঠা করার পথ অবলম্বন করছে বলে সমস্যাবলী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সোভিয়েত

ইউনিয়ন বার বার চেষ্টা করেছে এবং ইউরোপে সমস্ত দেশের সঙ্গে প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। এই নীতি সমাজতন্ত্র থেকেই উদ্ভূত; অন্যদিকে স্বাধীন ও আত্মসম্মানের নীতির উৎস হচ্ছে ধনতন্ত্র।

সোভিয়েত পার্টি চার সমতার ভিত্তিতে ও সম-স্বার্থে সকল দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, কৃষকৌশলগত বিষয়ে এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা। এই নীতির ওপর ভিত্তি করে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধের বিরুদ্ধেও বিশ্বশান্তির পক্ষে দাঁড়িয়ে বিশ্ববাসীর কাছে গঠন মূলক প্রস্তাব উপস্থিত করেছে—যেমন সাধারণ ও পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ, সামরিক প্রস্তুতির ক্ষেত্র সংকোচন, পারমানবিক অস্ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপ এবং অন্যান্য ধ্বংসাত্মক অস্ত্র নির্মাণের অবশ্যন ইত্যাদি।

এই সব প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন আজ সার্বজনীন রূপ নিয়েছে রাষ্ট্র সংঘে, প্রত্যেক দেশে ও উপমহাদেশে, জোট নিরপেক্ষ দেশগুলিতে সমস্ত রকম ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে এবং সমগ্র ধনতান্ত্রিক বিশ্বে শ্রমিক শ্রেণী ও নিপীড়িত মানুষের মধ্যে। এমন কি বাস্তববাদী উর্জাবত্ত এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশের মধ্যেও। বিশ্বশান্তির পক্ষে যারা দাঁড়িয়েছেন তারা সকলে সমাজতন্ত্রের পক্ষে নয় বা কমিউনিস্ট নয়। বিভিন্ন মতের, পদ্ধতির, আদর্শের, শ্রেণীর ও ধর্মের মানুষ বিশ্বশান্তিকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অঙ্গ। পার্টি মনে করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিখুঁত করার প্রয়াস এবং সাম্যবাদের দিকে অগ্রগতির এক একটা পদ হল আন্তর্জাতিকতাবাদের নির্দর্শন।

কমিউনিস্টরা সব সময়ে সামাজিক ও জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিরলস ভাবে সংগ্রাম করেছে। সেই কমিউনিস্টরা এখন যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বশান্তি রক্ষার সংগ্রামে প্রথম সারির সৈনিক। তারা জানে যুদ্ধের উৎস কোথায়, কারা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে, কারাই বা অশ্রু প্রতিযোগিতায় উদ্বৃত্ত হয়েছে। কমিউনিস্টরা এই বিপজ্জনক শক্তির মুখোমুখি থলে দিয়ে জনমানবকে সচেতন করে তুলেছে।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের বাইরের জগতের এক একটা দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে কাজ করতে হচ্ছে। তাদের পলিসি, রণনীতি ও রণকৌশল তারাই ঠিক করে। এমন কি কোন কোন বিষয়ে কমিউনিস্ট

পার্টীগুন্দের মধ্যে মতভেদও দেখা দিতে পারে। বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদী চক্র এবং তাদের বুদ্ধিজীবীরা একটা কমিউনিস্ট পার্টিকে অপর দেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছে।

এই কর্মসূচী আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্যের পথ সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরেছে। কমিউনিস্ট পার্টিগুন্দের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্যের পথে অন্তরায় হতে পারে না। কমিউনিস্ট পার্টিগুন্দের স্বাধীনতা বজায় রেখে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য গড়ে তুলতে পারে। তার বাস্তব ভিত্তি হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীনতা এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা করা। এই সব কিছুই ভিত্তি হল আন্তর্জাতিকতাবাদ।

কোন বিষয়ে মতভেদ হলে পারস্পরিক আলোচনাই হল তার সমাধানের পথ। জাতীয় ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীনতা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য পরস্পর বিরোধী নয়।

কিন্তু এই ঐক্যের নামে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মধ্যে সূর্যবাদের আমদানি করা চলবে না, তার বিপ্লবী মর্মবস্তুকে বিকৃত করা চলবে না। আসল সমাজতন্ত্রের বিপ্লবী ভূমিকা ও মর্মবস্তুকে বিকৃত করলে সোভিয়েত পার্টি তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সূর্যবাদের ও সংস্কারবাদ, সংকীর্ণতা ও মতান্বেষতার বিরুদ্ধে নীতিগত সংগ্রাম করতে বাধ্যপরিচয়। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে মার্কসবাদ লেনিনবাদের মৌলিক শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হলে কমিউনিস্ট আন্দোলনেরই ক্ষতি হয় সব চেয়ে বেশী।

একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিরোধ ও বিচ্ছেদ হল মার্কসবাদ লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুতিরই পরিণাম।

সুতরাং বিশ্বকমিউনিস্ট আন্দোলনে মার্কসবাদ লেনিনবাদের বিপ্লবী আদর্শ তুলে ধরতে হবে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের সূর্যবাদের বিকাশের স্বার্থে শ্রমিক শ্রেণীর ওপর সমস্ত রকম বুদ্ধিজীবী মতদোষের প্রভাবের বিরুদ্ধে, মার্কসবাদের নামে হরেক রকম সূর্যবাদের ও মতান্বেষতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে এবং কার্যক্ষেত্রে প্রাপ্তপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টি সমূহের মধ্যে ঐক্যের জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সোভিয়েত পার্টি এই ব্যাপারে কেবল একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীই তুলে ধরে নি, তাদের ঐক্যগত প্রয়াসের ফলে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে ঐক্যের নতুন পবনতারা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই

প্রবণতাকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব বহন করতে হবে প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টি'কে।

সোভিয়েত সমাজে পার্টির নেতৃত্ব

অক্টোবর বিপ্লবকে সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীলদের অন্তর্ধ্বাংসূলক কার্যকলাপকে নিমূল করা, ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করা, সমাজতন্ত্র নির্মাণ—এই সব কিছুই মূলে রয়েছে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা। এক একটা কঠিন স্তর উত্তরণ হয়ে জটিল সমস্যাবলীর বিস্তারিত সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে বলেই সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি জনমানসে নেতৃত্বের ভূমিকার অর্নিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

উন্নত সমাজতন্ত্রকে আরও নিখুঁত করা, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করা, জনগণের সচিব ভূমিকার স্ব-সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্রমেই সাম্যবাদকে রূপান্তরিত করার কর্মসূচীর মধ্য দিয়েই কমিউনিস্ট পার্টি সমগ্র মানবের পার্টি হয়েছে। এই কর্মসূচী রূপায়নের জন্য পার্টিতে কঠোর শৃংখলা, আভ্যন্তরীণ গাভীর প্রসার, সমষ্টিগত নেতৃত্ব, আত্মসমালোচনা, নৈতিক এবং আদর্শগত মানের উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সমস্ত কাজের উন্নতি, কর্মী নির্বাচন এবং প্রমোশনের ক্ষেত্রে আদর্শ, নৈতিক গুণাবলী, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দক্ষতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই লেনিনবাদী নীতি নেতা থেকে সাধারণ কর্মী পর্যন্ত অর্থাৎ সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পার্টি সদস্যপদ অলংকার নয়। এ হল এক গুরুদায়িত্ব, দেশকে সাম্যবাদের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সমাজ প্রগতিতে পূর্ণগঠনের দায়িত্ব। প্রত্যেক কমিউনিস্টকে কাজে, আচার আচরণে জনগণের সঙ্গে সম্পর্কে এবং ব্যক্তিগত জীবনে আদর্শস্থানীয় হতে হবে। জনসাধারণের সঙ্গে গভীর সংযোগের মধ্যে পার্টির শক্তি নিহিত। নেতৃত্বের ভূমিকার কমিউনিস্টরা সঠিক ভূমিকা পালন করছে কিনা তার ওপর নির্ভর করে পার্টির নেতৃত্বও মর্যাদা।

কমিউনিস্টদের কাজে সাফল্য এবং সৃজনশীল উদ্দীপনা নির্ভর করেই পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের বিকাশের ওপর, সমষ্টিগত নেতৃত্ব ও শৃংখলাকে শক্তিশালী করার ওপর।

পার্টির লক্ষ্য ও আদর্শকে সামনে রেখে পার্টি একে একে শক্তিশালী করাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সংগঠনকে মজবুত করার জন্য

পার্টির সংবিধানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও লক্ষণীয়। পার্টির নিয়মে বলা হয়েছে উপদল, গ্রুপবাজী এবং ঘোট পাকানো পার্টি সদস্যদের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন ও বেমানান। উভয়ের সহ-অবস্থান পার্টির পক্ষে ক্রান্তিকারক।

পর্যাপ্ত মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের ওপর ভিত্তি করে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি সারা বিশ্বে যেমন বিরাট পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে, তেমনই নিজের দেশকে সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

সারা বিশ্বকে কেবল বিশ্লেষণ করলে চলবে না, দার্শনিকদের প্রধান কাজ হল বিশ্বকে পরিবর্তন করা। মার্ক্সদের এই তত্ত্ব চিরন্তন সত্য। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী এই পরিবর্তনেরই কর্মসূচী। এই কর্মসূচী বিশ্বের কমিউনিস্টদের মনে প্রেরণা সৃষ্টি করবে, সদ্যস্বাধীন দেশের মানুষের মনে আশার সঞ্চার করবে, শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী মানুষের সংগ্রামের পথকে আরও আলোকিত করবে, আর বিশ্বের মানুষ জীবন ও সৃষ্টির নিরাপত্তার ভরসা পাবে।

এটাই হল সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীর মর্মবস্তু।



পুস্তক পরিচয়

ইতিহাস-চর্চা।

জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা

সম্পাদক : শৌভম চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

প্রকাশক : কে পি বাসুদেবী এণ্ড কোম্পানী

মুদ্রা : প্রিন্স টাকা।

স্বাধীনতা উত্তরকালে ত্রমবধমান সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা এবং বিচ্ছিন্নতার কালো ছায়া ভারতের জাতীয় জীবনে নানা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে, এমন কি অতি সম্প্রতিকালে জাতীয় সংহতিকেই একরকম বিপন্ন করে তুলেছে। তার কারণ ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার ও পুঁজিবাদী পথ অনুসরণের ফল অবশ্যম্ভাবী অসম অর্থনৈতিক বিকাশ। সঙ্গত কারণেই জনপ্রসার এলাকার এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ তমে দানা বাঁধেছে। সেই সুযোগে দেশী বিদেশী স্বার্থান্বেষীমহল বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠীকে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতার কানা গলিতে ঠেলে দিয়ে নিজেদের বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেছে। এটা সহজেই তারা করতে পারছে সাধারণভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত ইতিহাস চেতনার অভাব বলত্ত। এখানেই আসে জাতীয় জীবনের শিকার প্রতিটি ভুরে আর্থন্যাক-ভাবে বিজ্ঞান সম্মত বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস পঠন পাঠনের গুরুত্বের কথা এবং তা মাতৃভাষার মাধ্যমে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা ইতিহাস সংসদ-কর্তৃক “ইতিহাস-চর্চা জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা” গ্রন্থখানির প্রকাশ প্রশংসনীয়।

এই সংকলনে স্থান পেয়েছে পাঁচটি প্রাম্খ এবং বিষ্ণু ভিত্তিক দুটি দীর্ঘ গ্রন্থ তালিকা। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ ইকবাল আলাম খান তাঁর মূল আকর ভিত্তিক গবেষণামূলক প্রবন্ধটিতে, মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য পৰ্ব জুড়ে ধর্মের অসহিষ্ণু ব্যাখ্যা যে ব্যাপক প্রভাব রাখতে পেরেছিল তাকে কমিয়ে না দেখিয়েও, তাঁরই পাশাপাশি মধ্যযুগের ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের “ধর্মনিরপেক্ষ” বৈশিষ্ট্য সমূহের ত্রম বিবর্তনের ধারাটিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। বহুবা অত্যন্ত সাবলীল। ইতিহাসের ছাছছাতীর কাছে তো বটেই, সাধারণ পাঠকে : কাছেও প্রবন্ধটির আকর্ষণ অসাধারণ। জাতীয় মানসে প্রকৃত ইতিহাস চেতনা সঞ্চার করতে

এজাতীয় প্রবন্ধের কল প্রচার হওয়া প্রয়োজন। সেদিক থেকে কিচাঁর করে ইতিহাস সংশ্লিষ্ট মূল প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে ধন্যবাদার্থ হয়েছেন। কিন্তু অনুবাদ আর একটু সহজ সাবলীল হতে পারত।

“সাম্প্রদায়িকতা ও ইতিহাস চেতনা” শীর্ষক প্রবন্ধটির স্বল্প পরিসরে অধ্যাপক অশীশ দাশগুপ্ত তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহজ সরল ভঙ্গীতে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপক সংজ্ঞা নির্ধারণ করে, ভারতের বর্তমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—“জাতীয়তা যতদিন না সত্যকার আত্মজাতিকতার উন্নীত হচ্ছে” ততদিন জাতীয়তাবাদের মধ্যেও (যদিও জাতীয়তাবাদ প্রশংসনীয়) এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতা থাকে (পৃ: ৬৫)। ভারতের বর্তমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার নিরসনের জন্য তিনি যে মনে করেন “ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকাশকে স্বকীয় মর্যাদায় রক্ষা করাই এই বিপদের প্রতিকার” (পৃ: ৬৮), “সংহতির মধ্যে যেমন করে বৈচিত্র্যকে রাখা যায় সেই কিচাঁর নতুন করে শূন্য করতে হবে “(পৃ: ৬৮)” —এ বিষয়ে কোন ভ্রমত মেই। এই প্রসঙ্গে তিনি ঐতিহাসিকের যে কর্তব্যের কথা বলেছেন, তা বিশেষভাবে প্রাণধানযোগ্য।

সাম্প্রদায়িকতা ও ভারতের ইতিহাস চর্চা প্রসঙ্গে গোতম নিয়োগী তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে ভারত ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে সাম্প্রদায়িক ইতিহাস চর্চার প্রভাবটি নিয়ে নানা প্রশ্নের আলোচনা তুলেছেন। প্র সক্রমে তিনি যে সব মন্তব্য করেছেন তার কোন কোনটি সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ রয়েছে, যদিও যে সব আলোচনার স্থান এখানে নয়। সাম্প্রদায়িক ইতিহাস চর্চা বিরোধী তাঁর মূল বক্তব্য সম্পর্কে অবশ্য সন্দেহই একমত।

স্বাধীনতা অর্জনের পর চারদশক অতিক্রান্ত হতে চলেছে আজও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বস্তুনিষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হলো না। এই পরিপ্রেক্ষিতে এযাবৎ রচিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অপেক্ষাকৃত অংশেহীন, স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকার ধারাবাহিকতা তাঁর প্রবন্ধে তুলে ধরে স্বাধীনতা সংগ্রামের বস্তুনিষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় সেটির যথাযথ মূল্যায়নের প্রতি গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অধ্যাপক গোতম চট্টোপাধ্যায়।

ইদানীকালে ‘কোম্প্রজ স্কুল’ সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের যে নয়া ভাষা উপাধৃত করেছে, অধ্যাপক বরুণ দে তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে তার সমালোচনা করেছেন।

গ্রন্থটির বিশেষ আকর্ষণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ক বাংলা গ্রন্থের এবং ভারত ইতিহাস চর্চায় সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ক দুটি গ্রন্থ তালিকা বা ইতিহাসের ছাপছাটী গবেষক এবং সাধারণ পাঠকের বিশেষ উপকারে আসবে।

লক্ষ্মিনী দেব

Gorky Sadan

House of Soviet Culture

3, Victoria Terrace, Calcutta-17

Phone : 44-2791, 44-5407



• **LIBRARY** : All kinds of Soviet Books are available in English, Hindi, Bengali and other Indian languages.

•• **AUDITORIUM** : Discussion, Seminars, Lectures on different topics are held. Films are shown. Cultural Functions, Drama Performances.

••• **FILM LIBRARY** : Soviet films on different subjects are given on loan without any charges.

•••• **EXHIBITION HALL** : Exhibition of photographs, posters, paintings on various fields of Soviet life are exhibited.

••••• **RUSSIAN LANGUAGE COURSES** :

1. Ten Months Intensive Course.
2. Ten Months Diploma (2nd) Course
3. Ten Months Post Diploma (3rd) Course

- 5 JUN 1986

Twice a Week
Mondays & Thursdays or
Tuesdays & Fridays (8-30a.m. to
10-30a.m. or 6-00p.m. to 8 p.m.)
Session from January.

মূল্যায়ন

মূল্যায়ন

মূল্যায়ন

মূল্যায়ন

পাঞ্জাব সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ প্রবন্ধ / গান্ধী নেহেরুর ভূমিকা সম্পর্কে
নতুন ধরণের গবেষণা / সাবালটান ইতিহাস চিত্রায় ভারতের শ্রমিকশ্রেণী /
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন স্রোতধারা / সমাজবাদ, গণতন্ত্র ও
সোভিয়েত পার্টি / সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত / বহুকেন্দ্রবাদ
ও বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলন / সাম্প্রদায়িকতা বিচারের মানদণ্ড / সাম্রাজ্য
জহীরের রচনা / রামমোহনের শিক্ষাচিন্তা / অজয় চরণ দাশের “দা ইন্ডিয়ান
রায়াত” /।

শারদীয়

১৩৯৩

দাম : দশ টাকা



বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য একমাত্র
নির্ভরযোগ্য সরকারী প্রতিষ্ঠান।

ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্র্যাণ্ডো ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড (একটি সরকারী সংস্থা)

২৩বি, মেডা স্ট্রীট সুভাষ রোড (৪র্থ তল) কলিকাতা-৭০০০০৯

চাষী ভাইদের জন্য নিম্নলিখিত উৎকৃষ্ট মানের কৃষি উপকরণ সমস্ত
সঠিক মূল্যে সরবরাহ করা হয়।

- ক) এইচ. এম. টি. ইন্টার ন্যাশনাল। এসকটস। মিস্‌সুবিশ ট্রলার
- খ) কুবোটা। মিস্‌সুবিশ পাওয়ার টিলারস।
- গ) 'সুজলা' ও অক্সফোর্ড ডিজেল পাম্পসেট।
- ঘ) বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি, গাছপালা প্রতিপালন সরঞ্জাম।
- ঙ) সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধ।

কর্পোরেশনের সরবরাহ করা কৃষি যন্ত্রপাতি অত্যন্ত উচ্চমানের জিনিস
বিক্রয়ের পর মেরামতি ও দেখা শোনার দায়িত্ব নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতির
মানের বা মেরামত করার বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকিলে জেলা অফিসে
হেড অফিসে (ফোন নং : ২২-২০১৪/১৫) যোগাযোগ করুন।

জেলা অফিস :

২৪ পরগনা (দক্ষিণ)	: ১৪, তারাতলা রোড, কলিকাতা-৮৮
" (উত্তর)	: ডাক বাংলো মোড়, বারাসাত
দুর্গা	: সাহাপুর রোড, তারকেশ্বর, আরামবাগ
বর্ধমান	: সদর ঘাট রোড, জি. টি. রোড, মেমারি
বাকুড়া	: লালবাজার, বাকুড়া স্টেশন রোড, বাকুড়া
মিনাপুর (ওয়েস্ট)	: সুভাষ নগর, মিনাপুর
মিনাপুর (ইস্ট)	: পাশুপুড়া রেলওয়ে স্টেশন, পোঃ পাশুপুড়া
বীরভূম	: সিউড়ি
মালদা	: মনস্কামনা রোড, মালদা
মুর্শিদাবাদ	: ১৬, শহীদ সুব্রহ্মণ্য স্ট্রীট, বহরমপুর
জলপাইগুড়ি	: 'সবারি', কাচারি রোড, জলপাইগুড়ি
দার্জিলিং	: বাঘাঘতীন পার্ক, দার্জিলিং
কুর্চাবহার	: এন. এন. রোড কুর্চাবহার
পূর্বমিলি	: নীলকুঠী ডাঙ্গা রোড, পূর্বমিলি।

Space Donated by

'U. M.'

With Best Compliments from :

Phone : Residence : 72-5341

SCIENTEK CO.

(Manufacturers of all kinds of Rubber, Plastic goods and
General Order Supplirs)

Regd. Office : 3/14 Viveknagar, Jadavpur, Calcutta-700 075

City Office : 115E Lenin Sarani, Calcutta-700 013

Works : 12/23, South Kulia Road, Calcutta-700 010

With Best Compliments from :

VICTORIA CORPORATION (India)

138, Canning Street,

Post Box No. 2578

Calcutta-700 001

Distributors for ROL-KOBO Roller and Conveyor Chain
for Eastern India

Phone : Office : 25-7510
25-1544

Resl : 47-5857

Durgapur Coke Plant

Manufacturers of Quality Coke Briquett

Sanjib Sarani, Durgapur,

Burdwan, West Bengal.

With best compliments from :

BENGAL POTTERIES LIMITED

H.O. 25, Brabourne Road,

Calcutta-700 001

Well-known makers of Dinnerware & Insulators

PROTECTION OF WORKERS' RIGHTS AND INTERESTS: PROMOTION OF PEACEFUL AND HARMONIOUS INDUSTRIAL RELATIONS

LEFT FRONT GOVERNMENT HAS TRANSLATED THESE INTO REALITY

IN LABOUR FRONT

What has this Government achieved in Nine Years? Left Front Government makes no tall claim to any basic change. But its bold and constructive approach to problems of labour and industry has

- galvanized disciplined and united struggles of workers
- given a fillip to expansion of healthy Trade Union movement
- brought about an atmospheric change for responsible and mutually respectful bargaining between workers and management
- generated a faith among toiling people in Government's welfare programmes

To be more specific :

Here are some remarkable performances of Left Front Government

- Fixation of minimum wage in 35 employments • Industry, wise settlement in Jute, Tea, Hosiery, Engineering and Goods Transport, hundreds of uni-wise negotiated settlements, resulting in substantial increase in wage and other benefits • Vigorous attempts for revival of sick industrial units—taking over of 14 units, nationalisation of 4 of them and extending benefits of Relief Undertaking to 51 units • Implementation of Unemployment Assistance Scheme with investments of Rs. 86 crores, benefitting 7 lakhs of unemployed • Introduction of Self-Employment scheme in 1985 to help the unemployed start business enterprises, already benefitting about 2000 • Expansion of Medical Benefit under E.S.I. scheme, covering to 12,75,000 families, setting up 3 more hospitals, 21 service dispensaries, augmenting the number of beds by more than 1000, starting 16 new R.B.O.s, opening of Nurses' Training school and near completion of Blood Bank • Strengthening of safety and health measures for workers, opening of Chemical Wing under Factory Directorate and a unit of Boiler Directorate for Farakha • Opening of a number of new Labour Welfare Centres and 2 Holiday Homes.

Government of West Bengal

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
Rabindra Bharati University

PUBLICATIONS

(প্রকাশনা)

(In English)

(বাংলায়)

1. Sri Chaitanya O Guru Nanak Dr. Sunil Kr. Das Rs. 75.00	১। চিঠিভাষণ —অধ্যাপক শোভন সোম ০০.০০
2. Art and Aesthetics of Abanindranath Tagore Dr. Sudhir Nandi Rs. 92.00	২। গীতার্থ চিন্তা —অধ্যাপক চক্রবর্তী আচার্য ৪০.০০
3. Naradiya Siksa Dr. Suresh Ch. Banerjee Rs. 32.00	৩। কথা ও সুর —শ্রীধরজী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৫.০০
4. Analysis and Philosophy Dr. Sivepade Chakrabarty Rs. 50.00	৪। বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা —ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য ১৬.৫০
5. The House of the Tagores. Dr. Hiranmoy Banerjee Rs. 20.00	৫। রবীন্দ্র বর্নন অমীক্ষন —ডঃ সুধীর কুমার নন্দী ১৪.০০
6. A Critique Theories of Viparyaya Dr. Nani Lal Sen Rs. 15.00	৬। রবীন্দ্র সূত্রাবিত —সংকলক : বিনয়েন্দ্র সিংহ ১২.০০
7. Studies in Artistic Creativity Dr. Manas Roy Choudhuri Rs. 15.00	৭। রবীন্দ্র বর্নন —ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬.০০
8. Indian Classical Dances Sri Bela Krishna Menon Rs. 25.00	৮। ভারতসংস্কৃত রবীন্দ্রনাথ —ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৪.৭৫
9. Sociology of Planning Dr. Sobhanlal Mukherjee Rs. 14.50	৯। বিশ্ব জিজ্ঞাসা —ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ২০.০০
10. Chhau Dance of Purulia Dr. Ashutosh Bhattacharya Rs. 10.00	১০। রবীন্দ্র শিল্পভঙ্গি —ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৮.০০
11. Ten Schools of the Vedanta Part I Rs. 6.00 Part II 7.00 Part III 22.00 Dr. Rama Choudhuri	১১। পট্টদীপ ধর্মান —শ্রী অমর ঘোষ ৫০.০০
12. The Concepts of Part and Whole (Avayava & Avoyavi) Dr. Biswanath Sen Rs. 47.00	
Journals. (Departmental)	
1. Deptt. of Philosophy	

: পটিকা :

১। ১৯৯১-৯২ অর্থবছর ১৯৯১-৯২

2. Deptt. of Sanskrit
(1st issue)

25.00

3. Deptt. of English
(1st issue)

20.00

4. Deptt. of Instrumental Music
(Vol-2) 8.00

5. Deptt. of Dance (Vol-1) 6.00

: বিভাগীয় পত্রিকা :

১। বাংলা বিভাগ ৪র্থ বর্ষ ৪.০০

২। রবীন্দ্র সংগীত বিভাগ (১ম) ৫.০০

৩। চিত্রাঙ্কন (১ম) ১০.০০

—: বিক্রয় কেন্দ্র :—

—: পরিবেশক :—

১। ৫৬এ, বি. টি. রোড, কলিকাতা-৫০

জিজ্ঞাসা

২। ৬/৪, স্বাক্ষরকানাথ ঠাকুর পেন,

১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

কলিকাতা-৭

With Best Compliments from :

Eastern Railway Catering

at

Dhanbad Station

With Best Compliments from :

Paul Bakery

**Kankarbagh Road
Patna-2**

(BIHAR)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পৰ্যদ

পৰ্যদ প্রকাশিত কলা বিষয়ক কাম্যকটি বই :

সাহিত্য শিল্পী বাঁক্ষমচন্দ্র	—সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—	২২.০০
বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস	—অজিত ঘোষ	— ৬৫.০০
শ্রীজেন্দ্রলালের কবিতা ও গান	—কবিশেখর কাজিদাস রায়	— ৬.০০
শিল্পের স্বরূপ	—অনুবাদ: শ্রীজেন্দ্রলাল নাথ	— ৪.০০
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের		
কবিতা সংকলন	সম্পাদক : সুনীলকান্ত সেন	— ৪.০০
কাব্য মীমাংসা	—প্রবাসজীবন চৌধুরী	— ৪.০০
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক প্রবন্ধ	—সম্পাদক : জাহ্নবী চক্রবর্তী—	১৬.০০
(সটিক সংস্করণ)		
বাংলা উপন্যাসের শিল্প রীতি	—হীরেন চট্টোপাধ্যায়	— ১০.০০
বাংলা গল্পায়ের ইতিহাসের উপাদান	—শঙ্কর ভট্টাচার্য	— ২৫.০০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ (১ম খণ্ড)	—উপদেশনা : সুকুমার সেন	— ২৫.০০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ (২য় খণ্ড)	—উপদেশনা : সুকুমার সেন	— ৩৫.০০
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী	—উপদেশনা :	
(১ম খণ্ড)	দেবীপদ ভট্টাচার্য	— ৩৫.০০
সাহিত্য বীক্ষা	—নীরেন্দ্রনাথ রায়	— ২৫.০০
	ভূমিকা : দেবীপদ ভট্টাচার্য	
মার্কসবাদ ও নন্দনভট্ট	—স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্স	
	সম্পাদিত	— ১০.০০
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী	—উপদেশনা :	
(৬ষ্ঠ খণ্ড সমাপ্য) (২য় খণ্ড)	দেবী পদ ভট্টাচার্য	— ৪০.০০
আজাওলের পদ্যাবলী	—সম্পাদনা :	
(দুই খণ্ড সমাপ্য)	দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	— ৪০.০০
শিল্প ও শিল্পী		
(শিক্ষা ও শিল্প পত্রিকা)	—কৃষ্ণলাল দাস	— ৩৪.০০
শিক্ষাতত্ত্বের ভূমিকা	—সুনন্দা ঘোষ	— ১৯.০০
—স্বদেশী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা	—স্বদেশী শিক্ষা ও শিল্পের প্রয়োজনীয়তা	— ৪.০০

স্বাস্থ্যই সম্পদ

স্বাস্থ্যৰক্ষায় প্ৰগতিশীল উদ্যোগ

আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগীৰ ৰোগ নিৰাময়েৰ চাইতে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ও তাৰ উৎস স্থান কৰে নিৰ্মূল কৰাকে বোঁশ গুৰুত্ব দেওৱা হয় ।

এই উদ্দেশ্যে বামফ্ৰণ্ট সরকারেৰ নয় বছৰব্যাপী শাসনকালে দেশেৰ জনগণেৰ স্বাস্থ্যৰক্ষা ও ৰোগ প্ৰতিৰোধেৰ ক্ষেত্ৰে স্বাস্থ্য ও পৰিবাৰ কল্যাণ দপ্তৰেৰ অনুসূতনীতি অতীতপূৰ্ব সাফল্যলাভ কৰেছে । বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ সুপাৰিশ অনুযায়ী এই দপ্তৰটিকে প্ৰাৰ্থমিক স্তৰ ৰেৰে তেলে সাজিয়ে শহৰ-কেন্দ্ৰিক স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাকে গ্ৰামমুখী কৰা হৈছে । গ্ৰামাঞ্চলে স্বাস্থ্য সহায়ক কাঠামোটি ঠাটি স্তৰে বিনামূল—উপকেন্দ্ৰ, সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, প্ৰাৰ্থমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ ও গ্ৰামীণ হাসপাতাল । এই স্তৰসূচীতে বিভিন্নমুখী চিকিৎসাৰ সুযোগবৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে শয্যা সংখ্যা, কৰ্মী সংখ্যা ও আনুষংগিক সাজ সৰঞ্জাম বাঢ়ানো হৈছে । ১৯৭৬ সালেৰ তুলনাৰ ১৯৮০ সালে স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ বহুমুখী উন্নতি সহজেই লক্ষ্য কৰা যায় । মাথাপিছু বৰাদ ১৫.৯০ পঃ মূলে ৩৭.০৭ পঃ হৈছে । ৩৪২টি হাসপাতালেৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এখন হৈছে ৩০৯টি (স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ বাদে) । প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ বৰ্তমান সংখ্যা ৪৯,২০২—যা কিনা পূৰ্বে আদৌ ছিল না । এছাড়া নতুনতৰ সংযোজন ৭৮টি প্ৰামাণ্যমান চিকিৎসালয় ও সুন্দৰবন এলাকায় ভাসমান লগে আধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ—যাৰ সুফল গ্ৰামে-গঞ্জে, হাটে-বাজাৰে, সাধাৰণ মানুহ পেয়ে চলেছেৰ ব্যাপকহাৰে ।

মহামাৰী আকাৰে ৰোগ প্ৰতিৰোধেৰ জন্য স্বাস্থ্যসেৱাদেৰ সাহায্যে বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানীদেৰ সমবায়ে ‘ট্যাক্স ফোৰ’ গঠন কৰা হৈছে । যোগ্যতা বৃদ্ধিৰ জন্য সৰ্বাধিকৰত চিকিৎসকদেৰ প্ৰশিক্ষণ কৰ্মসূচীৰ আওতাৰ আনা হৈছে । মা ও শিশুৰ স্বাস্থ্যেৰ উন্নতিৰ জন্য সৰ্বাধিক প্ৰয়াস নেওৱা হৈছে । পৰিবাৰ কল্যাণ কৰ্মসূচীৰ ৰূপায়ণে প্ৰসূতি মা ও শিশুমৃত্যুৰ হাৰ কমিছে । “ছোট পৰিবাৰেৰ” ধাৰণাটি জনপ্ৰিয় হৈছে ।

স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাটিকে দুৰদূৰান্তে প্ৰসাৰিত কৰা এবং সাধাৰণ মানুহেৰ যাত্ৰে প্ৰয়োজনেৰে চিকিৎসাৰ সুযোগলাভ বৰ্ধিত মা হব সেদিকে বজৰ ৰাখাই এই সরকারেৰ লক্ষ্য ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

With Best Compliments from :

CEMENT CORPORATION

**13, Brabourne Road,
Calcutta-700001**

GRAM : PORTCEM

**Phone : 26-1297
27-5827**

With Best Compliments from :

MADHU STORE

**163 CHITKOHRA
PATNA-2
BIHAR**

With Best Compliments of :

Deluxe Bakery

**Dhadka Road
Barua Barak Asansol-2
Bakers and Confectioners
Railway General Order Suppliers.**

With Best Compliments from :

Tru-chem Corporation

**P-4 New Howrah Bridge Approach Road
(4th Floor Room No. 4/4) Calcutta-700 001
Phone : 26-5036/26-8389 (House of Chemicals)**

With Best Compliments from ;

UNITED TRADERS

**General Orders & Steel Plant Spares Supplier
BENACHITY, DURGAPUR-13**

With Best Compliments from :

BAM ENGINEERING Co. Pvt. Ltd.

**53, ELLIOT ROAD,
Calcutta-700 016
Electrical Engineers & Contractors.
Telephone : 29-9525**

প্রগতি ও সমৃদ্ধির নয় বছর

পশ্চিমবাংলা এগিয়ে চলেছে এক নতুন পথে

বামফ্রন্ট সরকার ভারতবর্ষে গণতন্ত্র স্বাক্ষর সংগ্রামের এক অগ্রবর্তী ঘাঁটি। প্রতিজ্ঞাশালী গোষ্ঠীগুলির সর্বপ্রকার চক্রান্ত এই সরকার বাধা করেছে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতায়। সীমিত ক্ষমতা ও অপ্রভু আর্থিক সহায় সম্বলের ওপর নির্ভর করেও রাজ্য সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী রূপায়িত করে চলেছে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার জনগণের অবস্থার মৌলিক কোনও পরিবর্তন সম্ভব নয়।

পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোটামুটি সন্তোষজনক। জাত-পাত, ভাষা বা ধর্মের প্রসঙ্গে এ রাজ্যের মানুষ কোন অসহিষ্ণু আচরণে লিপ্ত হয়নি। জনগণ স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করছেন। রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতি আধুনিক ও বহু শিল্পের বিকাশের ওপর নির্ভরশীল। বহু শিল্পের ক্রমবিকাশ কেন্দ্রীয় সরকারের বিনিয়োগ ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা স্বত্বই জরুরী। পশ্চিমবঙ্গ এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রত্যাশিত সুবিচার পাচ্ছে না। হলদিয়ায় পেট্রোকেমিক্যালস কারখানা ও বিধাননগরে ইলেকট্রনিক শিল্প স্থাপনে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিনিয়োগের প্রত্যাশা করেছিল। বহু টালবাহানার পর কেন্দ্র দৃষ্টি ক্ষেত্রেই তাদের হাত গুটিয়ে নিয়েছে। রাজ্য সরকার বেসরকারী শিল্প সংস্থার সঙ্গে বোধ উদ্যোগে এই কাজগুলি করছে। যৌথ উদ্যোগ ও বেসরকারি উদ্যোগ উভয় মাধ্যমেই কাজ শুরু হয়েছে। বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা যাতে এ রাজ্যে অধিকতর লাভ করেন সেজন্য পরিকাঠামোগত ও অন্যান্য সুবিধা দানের দিকে সরকার নজর রেখেছে।

কৃষি উৎপাদনে এ রাজ্যের অগ্রগতি বিশেষ আশাপ্রদ। বিদ্যুৎ পরিস্থিতির মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টার সফল পাওয়া বাচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য নেমে এসেছিল। সরকার গৃহীত ব্যবস্থাবলীর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে।

● সুস্থ সংস্কৃতির প্রচারে আত্মরিক প্রচেষ্টা জন সমর্থন লাভ করেছে।

রাজ্য সরকার জনগণের ব্যাপক অংশের গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটানোর কাজ করে চলেছে। আত্মবিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ক্রমাগত এগিয়ে চলেবেই।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

এগিয়ে চলার নয় বছর : শিক্ষা ও সংস্কৃতির নতুন পথ

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতার আসার পর প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করল। ৪২,৮৮১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫৯ লক্ষ ৯৩ হাজার ছাত্রসংখ্যা থেকে গত নয় বছরে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ৫২,৮৮১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ছাত্রসংখ্যা ৮০ লক্ষ ৪০ হাজার। এই সময়ে তফসিলী ও আদিবাসী ছাত্র বেড়েছে যথাক্রমে ১ লক্ষ ২০ হাজার ও ৪৪ হাজার। বস্তুগত পর্বত সড়ক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বণ্টন করা হচ্ছে। বিনামূল্যে জলখাবার পাচ্ছে ৩২ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী। গ্রামীণ এলাকার তফসিলী ও আদিবাসী ছাত্রী ও শ্রমিকরা ২৫ ভাগ অন্য ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পোষাক বিতরণ করা হচ্ছে। গত নয় বছরে ২৫০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে অথবা জুনিয়র বিদ্যালয়কে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়েছে। ১৯৭৭ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের সুযোগ ছিল ৭৪০টি বিদ্যালয়ে এবং ১৬৪টি কলেজে। বর্তমানে ১১১৯টি বিদ্যালয় ও ২৬৮টি কলেজে এই সুযোগ রয়েছে। প্রতিবছরীদের জন্য শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষায় বঞ্চিত শিশুদের জন্য ১৮,২৬০টি বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। উচ্চ-শিক্ষার প্রসারের জন্য খোলা হয়েছে ৫০টির ওপর নতুন কলেজ এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮৬-৮৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করেছেন ৬৩৯ কোটি টাকা, যেখানে সমগ্র দেশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ ৬৩৬ কোটি টাকা। প্রতিবছর শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক বায় পশ্চিমবঙ্গে—১০৮ টাকা, কেন্দ্রীয় সরকারের—৮.৭৫ টাকা। বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের ২০ শতাংশ রাজ্য সরকার শিক্ষাখাতে ব্যয় করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ব্যবধ বরাদ্দ বাজেটের মাত্র ১.২ শতাংশ।

এছাড়াও শিক্ষালাভের সুযোগ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রসারিত করার জন্য গত নয় বছরে ১৭৬১টি নতুন গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হয়েছে। ১৯৭৭ সালে ৭৬২টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে রাজ্যে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ২৫২০টি। উৎসাহী ক্রেতার কাছে ভাল বই পৌঁছে দেবার জন্য সরকারী সাহায্যে রাজ্য প্যারি ৩টি এবং জেলা প্যারি ১৬টি গ্রন্থমেলা হয়েছে, সম্পূর্ণ সরকারী উদ্যোগেও একটি বইমেলা হয়েছে। গবেষক, উৎসাহী পাঠক এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রেখে সরকার একটি আধুনিকতম গ্রন্থপঞ্জীর মন্ত্রণ ও

দুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে ও লোকসংস্কৃতির শর্যাকে চলিষু রাখার স্বার্থে অনেকগুলি প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে। দুস্থ শিল্পীদের আর্থিক সাহায্যদান ও সাহিত্য প্রকাশনায় অনুদান প্রদান এগুলির অন্যতম। শিল্প, সঙ্গীত ও নাটকের ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে অবনীন্দ্র, আলাউদ্দীন ও দীনবন্ধু পুরস্কার। নেপালী সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে ভানুভট্ট পুরস্কার। এছাড়া স্থাপিত হয়েছে নেপালী, বাংলা ও উর্দু আকাদেমী এবং সঙ্গীত আকাদেমী। আদিবাসী মানুষদের কৃষ্টিকে রক্ষা করতে গড়ে তোলা হয়েছে উপজাতি সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র—সিউড়ি, পূর্বুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও আলিপুরদুয়ারে। চলচ্চিত্রে উন্নতমানের করার জন্য স্থাপিত হয়েছে একটি কালার ফিল্ম ল্যাবরেটরি এবং প্রেক্ষাগৃহ ও কৃষ্টিকেন্দ্র "নন্দন"। উত্তর কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে গিরিশ মঞ্চ।

সবাইকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া এবং শিক্ষার ও সংস্কৃতির অঙ্গনকে কল্যায়ক রাখার জন্য আজ আমাদের একতাবদ্ধ হবার দিন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৪৩৬৩/৮৬

With Best Compliments from :

East India Industries

Telegram : SITAPHAL

Telephone : 32-5798
34-2252

212, Raja Ram Chand Ghat Road,
Panihati, 24 Parganas

Prop. EAST INDIA RUBBER WORKS (P.) LTD.

Manufacturers & Exporters of :

Rounds, Flat, Bar, Angles, Channels

CID Bar, Squares Etc.

IS : 226

IS : 1786

Head Office :

161, Chittaranjan Avenue,
Calcutta-700007

ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ	— হরিসাধন গোস্বামী	— ১০.০০
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা	— প্রবোধ চন্দ্র সেন	— ১০.০০
শিক্ষাবিজ্ঞান	— গ্রীনিবাস ভট্টাচার্য	— ১২.০০
শিল্প ও শিল্পী (২য় খণ্ড) (প্রাচ্য খণ্ড)	— কৃষ্ণলাল দাস	— ৭৫.০০
শিল্প ও শিল্পী (৩য় খণ্ড) (পশ্চাত্য খণ্ড)	— কৃষ্ণলাল দাস	— ৫৫.০০
শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা	— শান্তি দত্ত ও বিভূষণেন গুহ	— ৩৬.০০
আলংকারিক শিল্প	— ইন্দুসুধা ঘোষ	— ০২.০০
সাবান প্রস্তুত প্রণালী	— পদ্মভরীকান্ত চক্রবর্তী	— ৪.০০
পশ্চাত্য দেশের ইতিহাস (২য় সংস্করণ) (ক্যাটঃ হেগেল)	— মনোরঞ্জন বসু	— ১.০০

পর্ষদের বইগুলি কলিকাতার সংস্কৃত স্কুলের নীচতলার অবস্থিত পর্ষদ বিপণী থেকে পাওয়া যায়। কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ক অন্যান্য বইগুলির জন্য যোগাযোগের ঠিকানা—

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কয়ার, কলিকাতা-৭০০ ০১০।

ভারতীয় দর্শন গ্রন্থাবলী : সূর্য্যের রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৩৫.০০
বৈষ্ণব সাধনার ধারা	
বাংলা সাহিত্যে রাজ রচনা : স্বর্ধিকা বসু	২০.০০
কোচবিহারের প্রাচীন ইতিহাস : হিমাদ্রিশঙ্কর ভট্টাচার্য ও সুধীশঙ্কর ভট্টাচার্য	২০.০০
পারস্য সাহিত্য পরিভ্রম : পার্বতী চরণ ভট্টাচার্য	৩৫.০০
বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ : স্বামী বিদ্যারণ্য	৩৫.০০
সর্বোৎকর্ষী রাধাকৃষ্ণ : নন্দদুলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১৮.০০
জীবন ও দর্শন	
পদ্মাবতীর অভিযান : সুকুমার সেন	১০.০০
গানের গ্রীকেষ্ট	
দর্শন-জিজ্ঞাসা : সুধীর কুমার নন্দী	৫০.০০
ব্রাহ্মসমাজের উৎসর্গ : জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫.০০
বিতর্কিত গ্রীক কীর্তন : সত্যজিত দে	৩৫.০০

বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ : বর্ধমান-৭১৩১০৪

মনীষার বই—মনীষাদীপ্ত বিষয়ের ক্রটিশীল প্রকাশনা

সদা প্রকাশিত বই

গোপাল হাভাদারের

সংস্কৃতির বিশ্বরূপ

‘সংস্কৃতির রূপান্তর’, ‘বাঙালী সংস্কৃতির রূপ’, ‘বাঙলা সংস্কৃতি প্রদর্শন’
—এক খণ্ড ‘সংস্কৃতির বিশ্বরূপ’।

বড় হরফ/রয়াল সাইজ/প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা/দাম : ৭৫.০০

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের

তরী হাত তীর

অনেক ঘটনা। অনেক পতন অভ্যুদয়ের কথা। কিন্তু ইতিহাস পড়ছি বলে
মনে হবে না কোথাও। অথচ ইতিহাস চেতনা সদা জাগ্রত।

গ্রাফিক ড্রাকিং/সংস্কৃতি-৭৭ প্রকাশনা/প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠা/দাম : ৪০.০০

পঞ্চম মূদ্রণ

নরহরি কবিরাজের

স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা

গ্রন্থটিতে উনিশ শতকের জাগরণের ইতিবাচক দিকটি তুলে ধরা হয়েছে এবং ঐ
সময়ের কৃষক বিদ্রোহগুলির যে বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল তা নিম্নেও আলোচিত
হয়েছে।

ম্যানিলাধো কাগজে/কক্সকে ছাপা/প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠা/দাম : ৩৫.০০

মার্কসীয় দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতি

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

সদস্য প্রবন্ধ/বোর্ড বীধাই/লোমিনেটেড কভার/দাম : ১২.০০

GORKY SADAN

HOUSE OF SOVIET CULTURE

3, VICTORIA TERRACE, CALCUTTA-17

Phone : 44-2791, 44-5407

- * LIBRARY** : All kinds of Soviet Books are available in English, Hindi, Bengali and other Indian languages.
 - ** AUDITORIUM** : Discussion, Seminars, Lectures on different topics are held. Films are shown. Cultural Functions. Drama Performances.
 - *** FILM LIBRARY** : Soviet films on different subjects are given on loan without any charges.
 - **** EXHIBITION HALL** : Exhibition of photographs, posters, paintings on various fields of Soviet life are exhibited.
 - ***** INSTITUTE OF RUSSIAN LANGUAGE** :
 - 1. Ten Months Intensive Course
 - 2. Ten Months Diplome (2nd) Course
 - 3. Ten Months Post Diploma (3rd) CourseTwice a Week
Mondays & Thursdays or
Tuesdays & Fridays (8-30 a. m. to 10-30 a. m. or 6-00 p. m. to 8 p. m.)
Session from January.
-

‘কৃপা’র বই

কুড়োনো মানিক

সংকলক : দাউদম্মাল মেহ্‌রা

অনুবাদ : সুরিংশেখর মজুমদার

সম্পাদনা : চিত্তরঞ্জন ঘাইতি

অলংকার তৈরী হয় মণি-মাণিকা দ্বারা, সেই অলংকার যত না শোভা বাড়ায় উদীপ্ত হয় তত মনের অহংকার। আবার এমন রক্তও আছে যা পরশ পাথরের মত, স্পর্শ করলেই সোনা হয়ে ওঠে অস্তর। —সেই রকম অজ্ঞান মণি-মানিক বিশ্ব-চিন্তাবিদদের সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকে নিয়ে সাজানো হয়েছে ‘কুড়োনো মানিক’ গ্রন্থখানি।

[মূল্য ৩৫.০০]



১৫ বক্সিম চাটার্জি স্ট্রীট : কলকাতা-৭০০ ০৭৩

আমাদের উল্লেখযোগ্য বই

ইব্রাহিম হাবিব—মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭)	75.00
গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদঃ)—ইতিহাস চর্চা : জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা	30.00
রামশরণ শর্মা—ভারতের সামন্ততন্ত্র (চতুর্থ হইতে ষাটশ শতাব্দী)	36.00
অনিলা চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী	40.00
নবহারি কবিরাজ (সম্পাদা :)—উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ (ভর্ক ও বিতর্ক)	40.00
Ray, N. R —Calcutta : The Profile of a City	60.00
Chanda. A.—Public Administration and Public Opinion in Bengal (1854-1885)	90.00
Chandra, S.—The 18th Century in India : its economy and the role of the Marathas, the Jats, the Sikhs, and the Afghans	
(S. G. Deusker Lectures on Indian History 1982)	15.00

K. P. Bagchi & Company

286, B. B Ganguli Street, Calcutta-700012

মূল্যায়ন

বর্ষ ২২

শারদীয়

১০১০

সূচী

পৃষ্ঠা

রাজা রামমোহন ও বঙ্গদেশে ইরোজী শিক্ষা / ভূজঙ্গকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	১
সাম্প্রদায়িকতা বিচারের মানদণ্ড / সোমেন্দ্রলাল রায়	১১
গান্ধী-নেহরু সম্পর্কে নতুন ধরনের গবেষণা / নরহারি কবিরাজ	২৪
সাম্রাজ্য জহীরের শেষের দিকের লেখা / রণেশ দাশগুপ্ত	৩২
অজ্ঞাত পরিচয় অভয় চরণ দাশের বিস্মৃতপ্রার “দ্য ইন্ডিয়ান রাস্তা” / নন্দিনী সেন	৪৭
সমাজবাদ, গণতন্ত্র ও সোর্ভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি / শোভনলাল দত্তগুপ্ত	৬০
সাবালটাণ ইতিহাস চিন্তায় ভারতের শ্রমিকশ্রেণী / দীপিকা বসু	৬৮
সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত / সৌরি ঘটক	৭৭
ভূদেয়ের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য / অপূর্ব কুমার রায়	৯২
অমৃতবাজার পত্রিকা (১৮৬৮-৬৯) ও শশিন্দ্রকুমার ঘোষ / অমর দত্ত	১০৫
বিপ্লবী ট্রাজেডি বা বিপ্লবের ট্রাজেডি / সুনীল মিত্র	১২২

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন স্রোতধারা / জগন্নাথ সরকার	১০১
অনুবাদ : চিত্রলেখা ডট্টাচার্য	
বহুকেন্দ্রবাদ ও বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন / সত্যরত দত্ত	১৪৩
পাঞ্জাব সমস্যা / সত্যপাল ডাঙ	১৫৫

সম্পাদক : নরহরি কবিরাজ

উপদেষ্টামণ্ডলী :

সত্যেন্দ্রনাথরায় মহাসদস্য, সুনীল জানা
নির্মাল্য বাগচী, রণধীর দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ : সর্বোষ দাশগুপ্ত

সমীক্ষা প্রকাশনীর পক্ষে রণধীর দাশগুপ্ত কর্তৃক কালান্তর প্রেস,
৩০/৬ কাউন্সল রোড, কলিকাতা-১৭ হইতে মুদ্রিত ও
১০ ব'ডল রোড, কলিকাতা-১১ হইতে প্রকাশিত।

রাজা রামমোহন ও বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষা

—ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য

ভারতে আধুনিক শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার জন্য আমাদের দুটি বিষয়ের কথা মনে রাখতে হবে। এই দুটি বিষয় হল—পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭ খৃঃ) এবং বঙ্গারের যুদ্ধ (১৭৬৪ খৃঃ)। একজন ঐতিহাসিকের মতে পলাশীর যুদ্ধের ফলে একটি বৈদেশিক বণিক কোম্পানী অর্থাৎ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশে তথা সমগ্র ভারতে রাজা শাসনের সুযোগ পেল এবং বঙ্গারের যুদ্ধের ফলে তাদের শাসনের অধিকার সামগ্রিকভাবে স্বীকৃত হল। এই যুদ্ধের ফলে একটি নতুন যুগের উদ্ভব হল। এতকাল যাদের উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যে লাভের অংক বাড়ানো—তারা সরাসরি রাজ্য শাসনের অধিকার পেল এবং একটি প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ সুসভ্য জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের সুযোগ লাভ করল।

একটি বৈদেশিক বণিকদল কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজয় এবং নিজেদের হাতে রাজা শাসনের অধিকার গ্রহণ করা—এমন একটি ঘটনা যার সম্বন্ধে অন্য কিছু পূর্বে ভারতে দেখা যায় নি।

ভারতে বহু বৈদেশিক আক্রমণ হয়েছে কিন্তু সেগুলি হয়েছে এশিয়া-বাসীদের দ্বারা—যাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ছিল ভারতের অনুরূপ। ঐ সকল আক্রমণের ফলে দেশের শাসক শ্রেণীর পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য তেমন বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। কিন্তু বঙ্গদেশে ইংরাজ অধিকার ছিল অন্য ধরনের বৈদেশিক আক্রমণ। পলাশীর যুদ্ধের পরে রাতারাতি একদল অর্থলোভী, অশিক্ষিত বণিকদলের হাতে বাংলা-দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার পড়ল—যাদের গাছের রং পৃথক ও ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী ৫০ বৎসরের মধ্যে দেশে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত শাসক ছিল না। ইংরাজ কর্মচারীদের চারিত্রিক অসচ্চারিতা, আর্থিক লোভ বাংলাদেশকে ধ্বংসের পথে টেনে নিচ্ছিল।

এই সময়ে বঙ্গদেশে রামমোহনের জন্ম হয়। রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত রাখানগর গ্রামে। রামমোহনের জন্ম হয় এমন এক সময়ে যখন পাশ্চাত্য ভাষার প্রচলিত শ্রোত্রে বঙ্গদেশের সমাজব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করছিলেন। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—“শত শত বৎসর চলে গেল—ইতিহাসের পুরোণামিনী গতি হল নিশ্চয়। ভারতবর্ষের মনোলোকে চিত্তার মহানদী গেল শুষ্কিয়ে। তখন দেশ হয়ে পড়ল ক্ষুদ্র। আপনার মধ্যে আপনি সংকীর্ণ, তার সম্ভাব চিত্তের তেজ আর বিকীর্ণ হয় না দুঃ-দুরাত্তরে। শুকনো নদীতে যখন জল চলে না, তখন তথাকার অচল পাথরগুলো পথ আগলে বসে। তারা অসংলগ্ন, তারা অর্থহীন, পাথরদের তারা বন্ধ। তেমনি দুর্দিন যখন এল এই দেশে তখন জ্ঞানের চলমান গতি হল অবরুদ্ধ। নিষ্কম্প হল নব নবোন্মেষণালনী বুদ্ধি, উদ্ভূত হয়ে দেখা দিল নিশ্চল আচার পুঙ্খ, আনুষ্ঠানিক নিরর্থকতা, মননহীন লোকব্যবহারের অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তি। সর্বজনের প্রশস্ত রাজপথকে তারা বাধাগ্রস্ত করলে। খণ্ড খণ্ড সংকীর্ণ সীমানার বাইরে বিচ্ছিন্ন করলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে।” (রবীন্দ্রনাথ : ভারত পাথক রামমোহন রায়।)

হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ও সনাতন রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী রামমোহনের পরিচয়ের জন্য রামমোহনের বালাজীবন সম্পর্কে জানা দরকার।

পাঠশালা, টোল ও মন্ডির শিক্ষা সমাপ্ত করে রামমোহন উচ্চশিক্ষা-লাভের জন্য প্রথমে যান পাটনা, পরে কাশী। সেই যুগে পাটনা ছিল আরবী, ফার্সী শেখবার প্রধান কেন্দ্র। কাশীতে এসে রামমোহন সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৬ বৎসর বয়সে রামমোহন স্বগৃহে ফিরে এলেন এবং সেই সময়ে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতাকে আক্রমণ করে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন (১৭৭৮ খ্রীঃ)। এই কারণে তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে মনান্তর হয় এবং রামমোহন গৃহ পরিত্যাগ করে দেশ পর্ষট্টনে বের হন। কথিত আছে, তিনি তিস্তত পর্বত গিরোচ্ছলেন। ১৮১৪ সাল থেকে রামমোহন কলিকাতায় বাস আরম্ভ করলেন এবং কলিকাতায় বাসকালে তিনি জন-সাধারণের শিক্ষা-ব্যবস্থায় নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। কলিকাতায় এসে রামমোহন এক স্কুল স্থাপন করলেন, এই সড়ার নাম হল ‘আত্মীয় সভা’। আত্মীয় সভার নানাবিধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা হত—ব্রহ্মসংগীত গীত হত। আত্মীয় সভার যোগদান কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—বাইরের যে কেউ এই আলোচনার যোগ দিতে পারতো।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর সনদ নবীকৃত হইল এবং সনদে এরূপ উল্লিখিত হইল যে কোম্পানী এতদেশীয় জনসাধারণের শিক্ষার জন্য বৎসরে ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করবে। প্রথম দশ বৎসর এ টাকা থেকে কিছুই ব্যয় করা হয় নি। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে এরূপ স্থির করা হইল, বারানসী সংস্কৃত কলেজের মতো কলিকাতায় ঐ টাকা দিয়ে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করা হবে এদেশে সংস্কৃত চর্চার জন্য। রামমোহন প্রচণ্ডভাবে ঐ প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন। রামমোহন মনে করিয়াছিলেন যে সংস্কৃত শিক্ষা পুনরায় প্রসারের চেষ্টা করে ইংরাজ শাসকেরা এদেশে নানাবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারকে বজায় রাখবার চেষ্টা করছে। এই প্রচেষ্টার আপত্তি জানিয়ে রামমোহন ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে লর্ড আমহাস্টকে যে দীর্ঘ পত্র লেখেন তার সারাংশ এখানে উল্লেখ করা হল।

রামমোহনের চিঠি বড়লাট আমহাস্টকে —

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারতের এই অধিবাসী সরকারী ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মনোভাব জানানোর প্রয়োজন অনুভব করছে কারণ কোন কোন সময়ে নীরবতা দোষের কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়। ভারতের বর্তমান শাসক-সম্প্রদায় হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী দেশ থেকে এসেছে এদেশকে শাসন করবার জন্য —যে দেশের অধিবাসীদের ভাষা, সাহিত্য, আচার, আচরণ, রীতি নীতি এবং ভাবধারা বর্তমান শাসককুলের নিকট সম্পূর্ণরূপে নূতন ও অপরিচিত। সুতরাং তাদের পক্ষে ঐ সম্পর্কে ঐ দেশের অধিবাসীদের ন্যায় পরিচিত হওয়া সম্ভব নয়। আমরা নিজেদের অপরাধী মনে করবো যদি না আমরা আমাদের শাসকদের প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে জানতে সাহায্য না করি। বর্তমান বিষয়ের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবশ্যই আমাদের প্রকৃত বিবরণ জানাতে হবে, যাতে তারা এ দেশের মঙ্গলের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

কলিকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করে সরকার এই দেশের অধিবাসীদের উন্নতি বিধানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই ব্যবস্থা যে এই দেশের পক্ষে আশীর্বাদম্বরূপ এবং এই কারণে এই দেশের অধিবাসীদের সরকারের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকে উচিত। মানবজাতির মঙ্গল-ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তি এরূপ ইচ্ছা অবশ্যই প্রকাশ করবেন যে এই প্রচেষ্টা যেন সঠিকভাবে পরিচালিত হয়।

যখন ঐ বিদ্যারতন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়—আমরা জানতে পারলাম

ইংলণ্ডীয় সরকার তাদের ভারতীয় প্রজাদের শিক্ষার জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। আমরা এরূপ আশা করেছিলাম যে, এই টাকা ব্যয় করা হবে উপযুক্ত প্রতিভাবান ইউরোপীয় শিক্ষক নিযুক্ত করে—যারা এই দেশের অধিবাসীদের গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরবিদ্যা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান শিক্ষা দেবেন—যে সকল বিষয় উন্নত পর্যায়ে অনুসরণ করে বিশ্বের অন্য অংশের অধিবাসীদের চেয়ে ব্রিটেনবাসী নিজেদের উন্নত করেছে।

আমরা এরূপ আশা করে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিনিষ্কেপ করছি যে, জ্ঞানের নতুন আলো আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের আলোকিত করবে এবং আমাদের হৃদয় এই কথা চিন্তা করে আনন্দে উৎফুল্ল হচ্ছে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ইতিমধ্যেই আমাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছি—এই কথা ভেবে যে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আলোক-প্রাপ্ত এবং উদার হৃদয় এক জাতি আধুনিক ইউরোপের কলা ও বিজ্ঞান বিষয়-সমূহে এশিয়াবাসীদের শিক্ষাদানের জন্য উদ্যোগী হয়েছে।

আমরা জানতে পারলাম যে, সরকার হিন্দু পণ্ডিতদের পরিচালনায় যে বিদ্যা ভারতে প্রচলিত সেই বিদ্যা ভারতবাসীদের শিক্ষাদানের জন্য একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনে মনস্থ করেছেন। এইরূপ বিদ্যালয়তন (যেহেতু বিদ্যালয়তন লর্ড বেকনের পূর্বে ইউরোপে প্রচলিত ছিল) শিক্ষার্থীর মনকে বৈরাগ্যগত সূক্ষ্মতা এবং অধিবিদ্যা বিষয়ক সম্বন্ধে বিষয়ের দ্বারা ভারাক্রান্ত করে—যে বিষয় বা জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ শিক্ষার্থীর বা সমাজের নিকট কিছুই থাকে না। এই বিদ্যালয়তনে শিক্ষার্থী যে ধরনের বিদ্যা আরম্ভ করবার চেষ্টা করবে যা দু'হাজার বৎসর পূর্বেও প্রচলিত ছিল। এই বিদ্যাচারিত্র সঙ্গে তারা এক অহংকারপূর্ণ অসার সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি বা তাত্ত্বিক ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছেন এবং যে ধরনের বিষয় ভারতের সর্বত্র সাধারণভাবে আলোচিত হয়ে থাকে—লাভ করবে।

সংস্কৃত ভাষা খুব জটিল এবং সঠিকভাবে উহা আরম্ভের জন্য কোন শিক্ষার্থীর প্রায় সারাজীবন ব্যয় করতে হয়। এই কারণে যুগ যুগ ধরে এই বিদ্যার কোন প্রসার হয় নি। এই শিক্ষাব্যবস্থা এমন এক ছিন্নমূল্য আবরণের দ্বারা আবৃত যে এই বিদ্যা আরম্ভের জন্য পরিশ্রম করা কোনক্রমেই পুরস্কার-যোগ্য নয়। তবে যদি এই ভাষাচারিত্র একান্তই প্রয়োজনীয় মনে হয়—কারণ সংস্কৃত ভাষায় অনেক মূল্যবান বিষয় রয়েছে—তাহলে একটি নতুন সংস্কৃত

কলেজ স্থাপন না করে অন্য উপায়ে উহা করা যেতে পারে। কারণ দেশের সর্বত্র বহু সংস্কৃত জ্ঞানী পাণ্ডিত্য আছেন যারা এই ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা নিয়ে শিক্ষাদানে নিযুক্ত আছেন। এই বিষয়গুলিই শিক্ষাদানের জন্য একটি নতুন সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে। এরূপ পাণ্ডিত্যবান যারা সংস্কৃত শিক্ষাদান কার্যে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন—তাদের আরও উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তাদের উপযুক্ত সাহায্য ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা উচিত।

উপরের আলোচিত বিষয় বিবেচনা করে আমরা মহামান্য গভর্নর বাহাদুরের নিকট এরূপ মত নিবেদন করে প্রার্থনা করি যে, ভারতের প্রজাদের উন্নতির জন্য এই নির্দিষ্ট অর্থ যদি প্রস্তাবিত পারিকল্পনা অনুযায়ী ব্যয় করা হয়, তাহলে উহা যে উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তদনুযায়ী ব্যয়িত হবে না এবং এই সম্পর্কে মহামান্য গভর্নর বাহাদুরের সঙ্গে আমার মতপার্থক্য আছে—তা নিবেদন করি। কারণ দেশের তরুণদের জীবনের মূল্যবান সময়ের হ্রাস ও অতিরিক্ত বৎসর সংস্কৃত বাস্তবের সূক্ষ্ম বিচার নিয়ে অতিবাহিত করলে—কোনরূপ উন্নতি এদের নিকট থেকে আশা করা যায় না।

ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্ররা এই বিষয় চর্চা করে তাদের মনের উন্নতি ঘটিয়েছে এরূপ বলা চল না। এই ছাত্ররা শিখে থাকে বিশ্বের বস্তুসমূহকে কতগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় এবং আত্মার সঙ্গে দেহের কিরূপ সম্পর্ক হতে পারে, বা দেহের সঙ্গে আত্মার অথবা চোখের সঙ্গে কানের এবং কানের সঙ্গে চোখের ইত্যাদি।

মাননীয় মহাশয়কে এই বিষয় সম্পর্কে নিবেদন করি যে, এরূপ অবাস্তব শিক্ষার উৎসাহদানের কোনরূপ প্রয়োজন নেই এবং এই প্রসঙ্গে মাননীয় মহাশয়কে আরও নিবেদন করি যে, আপনি অনুগ্রহ করে তুলনা করুন লর্ড বেকনের পুর্বে ইউরোপের বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চার অবস্থা এবং পরে যখন বেকন এই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

ব্রিটিশ জাতিকে যদি প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করে অজ্ঞানতার অন্ধকারে রাখার পরিকল্পনা করা হত তাহলে 'স্কুলস্থানদের' শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তে বেকনের দর্শনকে মূল্য দেওয়া হত না। অনুরূপভাবে যদি ব্রিটিশ আইন প্রণয়নকারীদের ইচ্ছা এরূপ হয় এদেশকে অন্ধকারে রাখার—তাহলে প্রকৃত পন্থা হল সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করা। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের উন্নতি সাধন করা যখন ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য—তখন তারা অবশ্যই একটা উদার ও

উন্নত শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনের ইচ্ছাপোষণ করবেন—যাতে থাকবে গণিত, প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরবিদ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা। এই উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত অর্থের সাহায্যে প্রয়োজনীয় পুস্তক, যন্ত্রপাতিসহ একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করে কয়েকজন শিক্ষিত ও গৃহী ইউরোপীয়কে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করা যেতে পারে।”

ইংরেজ কোম্পানীর সংস্কৃত বিদ্যা প্রসারের কর্মসূচী দেখে রামমোহন বুকতে পারলেন যে, বিদেশী শাসক ভারতীয়দের পরাধীন রাখবার জন্যই আধুনিক শিক্ষার আলোক থেকে তাদের দূরে রাখতে চাইছে। ঐ সময়ে বঙ্গদেশের অনেকেই রামমোহনের এই মতামতের গুরুত্ব বুকতে পারেন নি। তার কারণ এই যে, সংস্কৃত ভাষে বিষয়টি বিচার করবার ক্ষমতা অনেকেরই ছিল না। তবে যারা রামমোহনকে বুকতে পেরেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন হেরার ও আডাম।

রামমোহনের শিক্ষাসংক্রান্ত চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতিকে বুকতে হলে ঐ সময়কার বঙ্গদেশের সমাজব্যবস্থা কিরূপ ছিল—সেই সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। ঐ সময়কার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

“রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তখন এখানে চতুর্দিকে কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। আকাশে মৃত্যু বিচরণ করিতেছিল।...”

রামমোহন রায় যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ভারতে এরূপ কোন রাজশক্তি ছিল না বা দেশকে শান্তি ও শৃংখলার মধ্যে আনতে পারে। দেশে কোনরূপ নিরাপত্তা ছিল না; ঠগা, বণী ও ডাকাতের উপপাত লেগেই ছিল। হিন্দু সমাজের অমানুষিক প্রথাগুলির মধ্যে প্রণান ছিল সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। দেশে কোনরূপ সংগঠিত শাসনব্যবস্থা ছিল না। আজ থেকে প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে রামমোহন যখন জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়কার পৃথিবী বর্তমান যুগের পৃথিবী অপেক্ষা স্বতন্ত্র ছিল। ভারতের আধুনিক কালের প্রারম্ভ এসেছেন রামমোহন।

রামমোহনের সময় বঙ্গদেশের সমাজবিন্যাস কিরূপ ছিল তার আলোচনা এখানে অপ্ৰাসঙ্গিক নয়। ঐ সময়ে বঙ্গদেশীর সমাজব্যবস্থার তিনটি শ্রেণীর প্রাধান্য দেখা যায়। এরা হলেন : ১) ইংরেজ শাসক ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, ২) বাঙ্গালী উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং ৩) সমাজের নিম্নতরের

ইংরাজ শাসক সম্প্রদায়ের হাতে ছিল রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা। তবে এই সম্প্রদায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—অত্যাচার ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে অর্থ-সংগ্রহ করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের অকরণীয় কিছু ছিল না।

বঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরাজ শাসনের সুযোগটি পুরাপুরি গ্রহণ করে। ইংরাজ শাসকবর্গের সঙ্গে সহযোগিতা করে তারা নানাভাবে লাভবান হয়েছে। দেশের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য এদের আগ্রহ ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী।

সাধারণ মানুষ অর্থাৎ সমাজের কার্যক প্রমদানকারী সম্প্রদায় ইংরাজ শাসনে তেমন লাভবান হয় নি। এরা হল কৃষক, তাঁতী, কুমোর, কামার, জেলে, মূচি ইত্যাদি। এরা ছিল সমাজের উৎপাদনকারী অংশ এবং সমাজের সর্বাপেক্ষা নিপ্পেষিত শ্রেণী।

বঙ্গদেশীয় এইরূপ সমাজব্যবস্থার সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ ছিল। এই সময়কার সমাজব্যবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায় শিবনাথ শাস্ত্রীর “রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ পুস্তকে।”

“১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বাথরগঞ্জ একটি স্বতন্ত্র জেলাতে পরিণত হয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার হ্যামিলটন ইহার প্রজাসংখ্যা ৯২৬৭২০ জন বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে একটিও পাঠশালা দেখিতে পান নাই। দেশের অপরাপর কোন কোন স্থানে সংস্কৃতের চর্চা কিছু ছিল বটে, কিন্তু তাহাও কেবল ব্যাকরণ, স্মৃতি ও ন্যায়ের শিক্ষাতে পৰ্য্যবসিত হইত। যে জ্ঞানের দ্বারা হৃদয় সমৃদ্ধ হইত, এমন কোন জ্ঞান দেশে বিদ্যমান ছিল না। এমন কি বেদ, বেদান্ত, গীতা, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ এই সকল পাণ্ডিত্যগণের অজ্ঞাত ছিল।”

এই সময়ে বঙ্গদেশে যে ধরনের শিক্ষা ছিল তা ছিল মূলতঃ সংস্কৃত শিক্ষা। উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের ছেলেরা কিছু কিছু লেখাপড়া শিখতো বটে—কিন্তু তাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা চলে না। গ্রামে গ্রামে সাধারণ লোকের জন্য কোনরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। জনসাধারণও যে এরূপ কোন শিক্ষার প্রয়োজন আছে এরূপ ধারণা ছিল না।

এরূপ এক সমাজব্যবস্থার মধ্যে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন। রামমোহনের শিক্ষাসংক্রান্ত চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতিকে মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে ভাগ করা যায়।

১। ইউরোপের আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ভারতে প্রবর্তন করা।

২। দেশবাসীর চিত্তকে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার অনুকূলে গঠন করার জন্য বৃত্তিসিক্ত চিন্তাশক্তি উৎসাহের চেষ্টা করা।

৩। মাতৃভাষা অর্থাৎ বঙ্গভাষার উন্নতি করা এবং মাতৃভাষাকে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও উচ্চ দার্শনিক চিন্তাধারা প্রকাশের বাহন হিসাবে গঠন করা।

৪। বাংলা ভাষাকে একটি সুষ্ঠু নিয়মের মধ্যে আনবার জন্য ইংরাজী ভাষার অনুরূপ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করা। (গোড়ীর ব্যাকরণ)

৫। হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র বিশেষ করে বেদান্তে যে সকল মূল্যবান তত্ত্ব আছে তা অনুশীলনের ব্যবস্থা করা এবং প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানের জন্য জনসাধারণকে উৎসাহ করা।

উপরে উল্লিখিত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে রামমোহন নিম্নলিখিত শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করেন :

- ★ ইংরাজী ও বাংলা ভাষা উপযুক্তভাবে পঠনপাঠনের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন এবং এই উদ্দেশ্যে অন্যত্র বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহ দান।
- ★ বাংলা ভাষার বিবিধ পাঠ্যপুস্তক বিশেষ করে বিজ্ঞান, ভূগোল, ব্যাকরণ রচনা করা।
- ★ ধর্মের প্রকৃত সত্য বিষয়ে আলোচনার জন্য বেদান্ত কলেজ স্থাপন।
- ★ জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানের মনোভাব গঠনের জন্য সার্বিক পটিকা প্রকাশ করা।
- ★ দেশ থেকে মিথ্যা আচার ও কুসংস্কার দূর করার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলা।

বিদ্যালয় স্থাপন ও বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহ দান রামমোহনের আধুনিক শিক্ষাবিস্তারে একটি প্রধান কীর্তি। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ রামমোহনকে হিন্দু কলেজ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রামমোহন জনশিক্ষা ও দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলন থেকে নিজেকে দূরে রাখেন নি। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, আধুনিক শিক্ষাবিস্তার ছাড়া এই জাতিকে কুসংস্কার মুক্ত করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত রামমোহন বুঝেছিলেন যে দেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার প্রয়োজন। ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ব্যয়ই যুবমানসে একটি আমূল পরিবর্তন আসবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮২২ খ্রীঃ হেঁদুয়ার নিকট (বর্তমানে আজাদ হিন্দ বাগ) অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষা, বাংলা ভাষা ও আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হত। এই বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার তিনি একাই

বহন করতেন। ডোঁভড হেয়ার, অ্যাডাম তাকে স্কুল পরিচালনার সাহায্য করতেন। এই বিদ্যালয় সম্পর্কে উইলিয়াম অ্যাডাম লিখেছেন (১৮২৭) যে, এই বিদ্যালয়ে দুই জন শিক্ষক কাজ করেন। তাদের একজনের মাসিক বেতন ১৫০ টাকা এবং অন্য জনকে ৭০ টাকা দেওয়া হত। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭০/৮০ জন। এই বিদ্যালয়ে নৈতিক বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হত। নিম্নমণ্ডলীয়া রাখার দিকে খুব নজর দেওয়া হত। দোকেননাথ ঠাকুর, রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়, রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু প্রভৃতি এই বিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, এই স্কুলে বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ পড়ানো হত।

রামমোহন আলেকজান্ডার ডাফকে স্কুল স্থাপনে সাহায্য করেছিলেন। আলেকজান্ডার ডাফ ছিলেন স্কটল্যান্ডের একজন ভরূণ মিশনারী। এই দেশ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিনি নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন। রামমোহন তাকে নানাভাবে সাহায্য করেন। বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ডাফকে তিনি বাড়ী সংগ্রহ করে দিচ্ছিলেন। ডাফ ঐ বাড়ীতে বিদ্যালয় স্থাপন করলেন বটে, কিন্তু ছাত্র সংগ্রহ করতে পারলেন না। রামমোহন বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছাত্র সংগ্রহ করে আনলেন। ১৮০০ খ্রীঃ ১০ই জুলাই ঐ বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হল। রামমোহন নিজে ঐ বিদ্যালয়ের পরিদর্শন করতেন।

রামমোহনের অনুগামী কালীনাথ চৌধুরী টাউন্টে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ডাফকে আমন্ত্রণ করলেন। রামমোহন এই ব্যাপারে তাকে সমর্থন জানালেন। রামমোহনের নীতি ছিল আধুনিক শিক্ষাবিভাগের জন্য যেখানেই সম্ভব স্কুল স্থাপন করা। আলেকজান্ডার ডাফ রামমোহনের এই সাহায্যের কথা মৃত্যুকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ডাফ জেনারেল এসেমরী নামে যে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন সেটিই হল বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ।

শিক্ষাবিভাগে রামমোহনের অন্যতম অবদান হল পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত। রামমোহন বৃহত্তে পেরেছিলেন যে, উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক ছাড়া ছাত্রদের পক্ষে আধুনিক জ্ঞানবিস্তারের নানা বিষয় সঠিকভাবে শিক্ষালাভ করা সম্ভব নয়। এই জন্য তিনি নিজেও কয়েকখানা পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। আবার অন্যদেরও পাঠ্যপুস্তক রচনার উৎসাহ দিয়েছিলেন। ১৮১৭ খ্রীঃ এঃ হুল বুক সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঠ্যপুস্তকে রাজ্যে যে প্রভাবের এই সমাজের স্রষ্টা

রামমোহন প্রথম থেকেই বৃত্ত ছিলেন। এই সংস্থার বিবরণী থেকে জানা যায় রামমোহন বাংলার ও ইংরাজীতে একটি ভূগোলের পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। ঐ সংস্থার উদ্যোগে তিনি ফগর্দুসনের Introduction to Astronomy এর বাংলা অনুবাদ কার্বে মিঃ গডনকে সাহায্য করেছিলেন। ১৮২১-২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি যে সকল প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন সেগুলি সাধারণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক। রামমোহন রচিত এই শ্রেণীর কয়েকটি প্রবন্ধের নাম হল—প্রতিধ্বনি, অলস্কাপ বা চন্দ্রকর্মাণ, মকর মংস্যের বিবরণ, বেলুনের বিবরণ ইত্যাদি।

১৮২৬ খ্রীঃ ইংরেজ শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি ইংরাজীতে বাংলা ভাষার একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন। এই ব্যাকরণ রচনা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন যে, এই ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্য হল বঙ্গবাসীদের সঙ্গে ইংলণ্ডবাসীদের ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধা সৃষ্টি করা। পরে তিনি ঐ ব্যাকরণের একটি বাংলা অনুবাদও প্রকাশ করেন বাঙ্গালী ছাত্রদের সুবিধার জন্য এবং পুস্তকখানির নামকরণ করলেন—‘গোড়ীয় ব্যাকরণ’। স্কুল বুক সোসাইটী ঐ পুস্তকখানি প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তকখানি তার বিল্যস্ত যাত্রার প্রাকালে রচিত হয় এবং তার বিলাতে অবস্থিতি কালে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের ভূমিকায় এরূপ বলা হয়েছে—

“সর্বদেশীয় ভাষাতে এক এক ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ আছে যথারা তত্ত্বভাষা লিখনে ও শব্দশাস্ত্র বিবেচনাপূর্বক কথনে উত্তম শৃংখলামতে পারগ করেন, কিন্তু গোড়ীয় ভাষার বিবরণ না থাকাতে ইহার কথনে বা লিখনে সম্যকরূপে রীতিজ্ঞান হয় না এবং বালকদিগের আপন ভাষা ব্যাকরণ না জানাতে অন্যভাষা ব্যাকরণ শিক্ষাকালে অত্যন্ত কষ্ট হয়, আর আপন ভাষা ব্যাকরণ যাহার বোধ অল্প পরিপ্রমে সম্ভবে তাহা জানিলে অন্য ভাষা ব্যাকরণ জ্ঞান অনায়াসেই হইতে পারে।”

সাম্প্রদায়িকতা বিচারের মাত্রদণ্ড

—সোমেন্দ্রলাল রায়

সাম্প্রদায়িকতার কথা বললেই সাথে সাথে ধর্মের কথা মনে আসে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, ধর্মের নিষ্ঠার ওপর ভিত্তি করেই সাম্প্রদায়িক মনোভাব গড়ে ওঠে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, সাম্প্রদায়িকতার সাথে ধর্মনিষ্ঠার কার্যত কোন যোগ নেই। ধর্মের আচার-বিচার এবং তত্ত্বের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে তাকে আমরা বলি ধর্মনিষ্ঠা। আর সেই ব্যক্তিকেই আমরা সাম্প্রদায়িক বলে থাকি যে এক বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্তির ভিত্তিতে নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করতে চায়। এরজন্য সে অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ বা ক্ষতিসাধন করতেও দ্বিধা করে না। ধর্মনিষ্ঠার জন্য অন্যের বিরুদ্ধাচরণের প্রয়োজন নেই। অপরদিকে অন্যের বিরুদ্ধাচরণ এবং ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে ঘটে সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ এবং পরিণতি। ধর্মের সাথে তাই সাম্প্রদায়িকতার কোন প্রয়োজনীয় তত্ত্বগত সম্পর্ক নেই।^১ এদিক দিয়ে বিচার করলে সাম্প্রদায়িকতাকে ধর্মনিরপেক্ষ বলা চলে।

এক জনগোষ্ঠী যেহেতু এক সাধারণ ধর্মে বিশ্বাস করে, তাই তাদের এক অভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ বিদ্যমান—এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ঘটেছে। এই ভুল মেনে নিলে বলতে হয় যে, প্রতিটি ধর্ম সম্প্রদায়ের নিজস্ব স্বতন্ত্র ইতিহাস রয়েছে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য একযোগে কাজ করে। ভারতের ক্ষেত্রে এই ধারণা প্রয়োগ করলে বলতে হয় যে, ভারতীয় জাতি বলে কিছুই নেই। ভারত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এক কনফেডারেশন মাত্র।^২ সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা-পুষ্ট ব্যক্তির মনে করেন যে, জাতি, ভাষা বা শ্রেণী নয়, ধর্মই হল সমাজ-ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলতে ইউরোপের মতো জাতিগত সংখ্যালঘু না বৃকিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বোঝায়। ভারতে বিভিন্ন জাতির লোক থাকলেও ধর্ম এই সমস্ত জাতিগত ব্যবধানকে দূরে সরিয়ে রাখে। অথচ ধর্মীয় পার্থক্য স্থায়ী ছিল না, এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে

ধর্মীভারিত করা যেত। এই ধর্মীয় পরিবর্তনের ফলে কিন্তু তাদের জাতিগত, ভাষাগত বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন ঘটে না। পরবর্তীকালে ভারতের রাজনৈতিক ধর্মের কোন বড় ভূমিকা ছিল না। সেখানে সাম্প্রদায়িকতা—যা এক সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত মনোভাব বোঝায় এবং যা এক স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়—এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।*

অনেকে মনে করেন যে, সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়েছে মধ্যযুগে বা তারও আগে। কিন্তু এই ধারণা সত্য নয়। সাম্প্রদায়িকতা সম্পূর্ণরূপে এক আধুনিক ভাবাদর্শ। প্রাচীন বা মধ্যযুগে ভারতে মাঝে মাঝে ধর্মীয় নিপীড়ন ঘটেলেও তখন কিন্তু রাজনীতির কোন ধর্মীয় ভিত্তি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে যখন জনগণ রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে যোগদান করতে আরম্ভ করে, তখন থেকেই সাম্প্রদায়িকতাবাদ—জাতীয়তাবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের মতো—এক ভাবাদর্শ রূপে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। এর আগে রাজনীতি প্রায় সম্পূর্ণরূপে উচ্চশ্রেণীসমূহের স্বার্থে তাদের দ্বারাই পরিচালিত হ'ত। তাতে সাধারণ শ্রেণীর ব্যক্তিদের প্রায় কোন ভূমিকাই থাকত না। জনগণের সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করার পর থেকেই হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি গোষ্ঠীর কিছু নেতা নিজেদের স্বার্থে তাদের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিকে সংগঠিত করতে শুরু করে। এর ফলে অনেক সময়েই সাম্প্রদায়িক সংঘাতও ঘটে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিরোধকে ভারত ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলা চলে না। ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদের যে প্রসার ঘটে, তার জন্য অংশত ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের নীতিকে দায়ী করা চলে। তাছাড়াও সমাজের কিছু বিশেষ শ্রেণী সুবিধাভোগের জন্য সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত জগদহরলাল নেহরু বলেন, “আমাদের কখনই ভোলা উচিত নয় যে, ভারতে সাম্প্রদায়িকতাবাদ পরবর্তীকালের এক ঘটনা যার উত্থান আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে।”*

ভারতে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে যে বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হয় তা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। বিদেশী আধিপত্যের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম আধুনিক ইতিহাসের এক স্বীকৃত ধারা। এর দ্বারা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা, ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন

এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিরা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা প্রভৃতির দাবীতে ক্রমশ সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে। সাম্প্রদায়িকতাকে কিন্তু অন্তর্দৃষ্টভাবে এক অবশ্য্যভাবে ঐতিহাসিক ধারা বলে গ্রহণ করা যায় না। সাম্প্রদায়িকতাকে এক স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে সহজেই বোকা যায় যে, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীরা ধর্মীয় কারণের জন্য এক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা অজ্ঞেয়া সাম্প্রদায়িক বন্ধনে যুক্ত নয়। ধর্মীয় বন্ধন শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে কোন সমাধান সূত্র দিতে পারে না। জাতিগত, ভাষাগত কিংবা সাম্প্রদায়িক ঐক্যও ধর্মীয় বন্ধন সূনিশ্চিত করে না। একজন হিন্দু, মুসলমান বা শিখ কৃষকের শ্রেণীস্বার্থের যে অভিন্নতা রয়েছে, ধর্মীয় বন্ধনে সেই অভিন্নতা নেই। আবার এক পাজারী হিন্দু বা মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক যে নৈকট্য রয়েছে, বাঙালী হিন্দু বা মুসলমানের সাথে তাদের সেই নৈকট্যবোধ নেই।

ভারতে সাম্প্রদায়িকতাবাদের উদ্ভবে এবং প্রসারে মুসলিম সম্প্রদায়ের মনোভাবের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। সাধারণভাবে ইসলাম ধর্মের এক বক্তব্য ছিল যে, বিশ্বের সব মুসলমানই এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। গোড়া মুসলমানরা মনে করতেন যে, জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা পরস্পরের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং আল্লাহর প্রতি তাদের সাধারণ আনুগত্য বোধের পথে বাধার সৃষ্টি হবে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত মুসলিম কবি এবং রাজনীতিবিদ মহম্মদ ইক্বাল বলেন যে, বিশ্বের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমান সম্প্রদায়ের এক মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিচিত্র ধারণা। তাদের ক্ষেত্রে ভাষা বা ভূখণ্ডের ঐক্য জাতীয়তাবাদের মূল্য উপাদান নয়। তারা নিজেদের এক অখণ্ড ঐগ্ৰামিক সমাজের সদস্য বলে মনে করে। এবং এরূপ এক সমাজের আদর্শ ভূখণ্ড হচ্ছে সমগ্র পৃথিবী।^{১০} মহম্মদ আলি জাতীয়তাবাদী চিন্তা-ধারাকে এক সংকীর্ণ কুসংস্কার বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে, এটি বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে ঐগ্ৰামিক ধারণার পরিপন্থী। জাতীয়তাবাদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে এক মুসলিম লেখক বলেন যে, উম্মা (আল্লাহর প্রতি যাদের বিশ্বাস আছে) যদি বতন-এর (পিতৃভূমির) মধ্যে বিলুপ্ত হয়, তাহলে ইসলাম তার বৈশিষ্ট্য হারাবে।^{১১} এর থেকে বোকা যায় যে, যখন জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামের প্রতি আনুগত্যের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তখন বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমান ইসলামকে প্রাধান্য দিতে চায়।

ভারতীয় মুসলমানরা কি কারণে নিজেদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল সে সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বহু ঐতিহাসিক বলেছেন যে, জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মুসলমানদের ধর্মীয় সংঘর্ষ এবং হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ভীতিই তার প্রধান কারণ। এই প্রসঙ্গে আজিজ আহমদ এবং খালিদ বিন্ সইদ প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, দীর্ঘস্থায়ী হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির বিভেদের ফলে মুসলমানরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখান করে। তারা আরও বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানরা দীর্ঘকাল ভারতে একসাথে বাস করলেও তাদের সাংস্কৃতিক ধারাগুলি ভিন্ন পথে—কখনো সমান্তরালভাবে, আবার কখনো বিপরীত পথে—প্রবাহিত হয়। তাঁদের মতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার এই বিভেদকে আরও তীব্রতর করে। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথমদিকে মুসলমানরা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারায়। এরপর তারা ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধের সৃষ্টি করে, তার ফলে তাদের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের পথে বাধার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে হিন্দুরা নিজেদের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপখাইয়ে নেওয়ার তারা ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা পুরস্কৃত হয়। ইংরাজ সরকার এই অবস্থার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের আনুগত্য অর্জনের জন্য তাদের বিবিধ সুযোগ-সুবিধা দিতে আরম্ভ করলে তারা হিন্দুদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এই সময় থেকে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের চরিত্রও পরিবর্তিত হয়। বিদেশী সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অধীনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এর ফলে এক সাধারণ জাতীয়তাবাদী পতনকার তুলে সমবেত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দুটি সম্প্রদায়ের মিলিত যৌথ সশস্ত্রযুদ্ধের পথে বাধার সৃষ্টি হয়।”

সামগ্রিকভাবে ভারতে সাম্প্রদায়িকতার প্রচার এবং প্রসার যে হিন্দু বা মুসলমান সমাজের স্বার্থ রক্ষার্থে শুরু হয়েছিল, এই তত্ত্ব অনেকেই অস্বীকার করে এর মূল অন্যত্র নিহিত রয়েছে বলেছেন। এই প্রসঙ্গে অনিল শীল হিন্দু এবং মুসলমানরা দুটি পৃথক ও সুসংবদ্ধ সম্প্রদায় ছিল এবং তাদের স্বার্থের ভিন্নতা ছিল, এই বক্তব্য মানেন নি। তিনি বলেছেন যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে অসম উন্নতি ঘটে, তার প্রতিফলন উভয় সম্প্রদায়ের ওপরেই পড়ে। হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তিদের পৃথক পৃথক অভিন্ন সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ছিল, এ বক্তব্যও তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, বক্তৃতাগুলোর

অভিজ্ঞাত মুসলিম ভূস্বামী বা উচ্চ রাজকর্মচারীদের স্বার্থ সাধারণভাবে মুসলিম সমাজের স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। আবার বাঙলার মুসলিম জমিদার এবং মুসলিম রায়তদের স্বার্থও অভিন্ন ছিল না। তাই অনিল শীল বলেন, “যখন সৈয়দ আহমদ খান বা আমাদের আলি নিজেশ্বেরকে সমগ্র ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের মুখপাট হিসাবে দাবি করেন, তখন তা কংগ্রেসী নেতাদের সর্বভারতের প্রতিনিধিত্বের দাবির মতোই অযৌক্তিক মনে হয়।”

যুক্তপ্রদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পল ব্রাস এবং ফ্রান্সিস রবিনসন যে বক্তব্য রাখেন, তাতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব সম্পর্কে এক ভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়। মুসলমানরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু হওয়ার তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আবির্ভাব ঘটে—এই বক্তব্যকে তাঁরা অগ্রাহ্য করেছেন। ব্রাসের মতে যুক্তপ্রদেশের মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় বিশেষ গিঁছিয়ে ছিল না। বরং ক্ষেত্রে তারা হিন্দুদের তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। যুক্তপ্রদেশে উদ্‌ভাষার প্রাধান্যই প্রমাণ করে যে, তখনো শাসন এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। এই প্রাধান্য বজায় রাখাই ছিল উত্তরপ্রদেশের মুসলিম নেতাদের লক্ষ্য।^{১০} এই প্রসঙ্গে রবিনসনের মতও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, যুক্তপ্রদেশে মুসলিম প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে হিন্দুরা সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার এবং শাসনের ক্ষেত্রে হিন্দী ভাষা প্রচলনের দাবি জানান। এছাড়াও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগে নিবাচনের ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার মুসলমানদের স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার এবং জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে সৈয়দ আহমদ খান আলিগড় আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। কোনো দুর্বলতার জন্য নয়, তাদের প্রাধান্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই আলিগড় আন্দোলন শুরু হয়। আলিগড় আন্দোলন অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়লে তা অংশত ব্রিটিশ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অংশত হিন্দু পুনরভ্যর্থন সম্পর্কে মুসলমানদের ভীতি থেকে শক্তি সঞ্চার করে।^{১১}

উইলিয়ম ক্যান্টওয়েল স্মিথ, এ. আর. দেশাই প্রমুখ মার্কসবাদী পণ্ডিতরা ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব এবং বিস্তারকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করেছেন। তাঁর *Modern Islam in India : A Social Analysis* নামক গ্রন্থে ভারতে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার এবং হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব সম্পর্কে

মস্তব্য করতে গিয়ে স্মিথ বলেছেন যে, এর প্রধান কারণ হল শ্রেণীসংঘাত এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের সুপ্রপাত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্মিথ শ্রেণী-সংঘাত এবং ইংরাজ শাসকদের ভেদনীতির ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, প্রথমদিকে হিন্দু বৃজ্জেরা ব্রিটিশ সরকারের দাবিগুলো মুসলিম বৃজ্জেরা-শ্রেণীর তুলনায় অনেক বেশী এগিয়ে ছিল। এর ফলে মুসলমানদের মনে যে বিরূপতার সৃষ্টি হয় তা অপেক্ষাকৃত দূর্বল মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলতে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের পথ অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করে। তিনি জোরের সাথে বলেন যে, মুসলিম বৃজ্জেরা শ্রেণীর অর্থনৈতিক দূর্বলতা সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি এবং প্রসারের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। গ্রাস এবং রবিনসনের বক্তব্য খণ্ডন করে তিনি বলেন যে, তুলনামূলকভাবে দূর্বল মুসলিম বৃজ্জেরা শ্রেণীর স্বাধীনতার জন্যই আলিগড় আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের সম্প্রসারণের সম্ভাবনার মধ্যে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী বিপদের সংকট পায়। হিন্দুদের নিকট থেকে যে বিপদ আসতে পারে তা নিবারণের উদ্দেশ্যে তারা সাম্প্রদায়িকতাকে এক কার্যকর হাতিয়াররূপে গ্রহণ করে। এই নীতি অনুযায়ী তারা মৈরুদ আহমদ খানের আলিগড় আন্দোলনকে সরকারী সমর্থন জ্ঞানার এবং আলিগড় কলেজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।^{১১}

এ. আর. দেশাইও অনেকা একই ধরনের মত পোষণ করে বলেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে দারিদ্র এবং তৎকালীন সমাজব্যবস্থার চ্যুতির জন্য মুসলিম জনগণের মধ্যেও ক্রমশঃ জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে। তখন উচ্চশ্রেণীর মুসলিমরা তাদের কায়েমী শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখার জন্য এবং খাতে তাদের বিরুদ্ধে কোন বৃহৎ আন্দোলন পরিচালিত হতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের সৃষ্টি করে। ভারতে তাদের সাম্রাজ্যিক আঁকড় বজায় রাখার জন্য ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন, সংখ্যালব্ধ সাম্প্রদায়িকতাকে বিশেষ সুবিধাদান এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রদেশ সমূহের পুনর্গঠন প্রভৃতির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা প্রসারের এবং জাতীয় আন্দোলনের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। ভারতে তখন যে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা বিদ্যমান ছিল, এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে অবমান অগ্রগতি ঘটেছিল, তার সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ সরকার এদেশে তাদের

এইভাবে দেখা যায় যে, ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভবের এবং প্রসারের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আঞ্জিঙ্গ আহমদ, খলিদ বিন সঈদ প্রমুখ ব্যক্তিরা ধর্মীয় ভিত্তির ওপর জোর দিয়েছেন। তারা মনে করেন যে, ভারতে গোষ্ঠীগত সংঘাত বজায় রাখার ক্ষেত্রে ধর্ম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অপরাধকে স্মিথ এবং দেশাইয়ের মত মার্কসবাদী প্যাঁড়তেরা মনে করেন যে ধর্ম নয়, শ্রেণী-বিভাগ এবং অর্থনৈতিক কারণসমূহ ভারতের রাজনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তারা মনে করেন যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে এখানকার শ্রেণীবিভাগ এবং শ্রেণী-স্বার্থ সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আবার অনিল শীল, রাস, রবিনসন প্রমুখ প্যাঁড়তগণ ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক কারণকে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভবের কারণ হিসাবে গ্রহণ করতে চান নি। তারা মনে করেন যে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন স্থানীয় পরিস্থিতি সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করেছিল।

ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব এবং প্রসারে সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়েরও যথেষ্ট দায়িত্ব ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যে জাতীয় চেতনার সূত্রপাত হয়, তার অনেকখানিই ছিল ধর্মভিত্তিক। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, “হিন্দুরা স্বদেশপ্রীতি ও স্বধর্মপ্রীতিকে পৃথক করে দেখেনি, এবং এই ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির ফলে পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ধর্মীয় প্রভাব দেশের বৃহত্তর স্বার্থের সমূহ ক্ষতিসাধন করেছে।”^{১১}

বৃহত্তর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পর্যালোচনা করলে সাম্প্রদায়িকতাবাদকে এক চরম প্রতিক্রিয়ার ধারক এবং বাহক বলে অভিহিত করা যায়। সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িক দলগুলি এবং তাদের নেতারা ছিলেন স্থিতিবাহ্যর সমর্থক এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এর অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ তারা বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর সাথে হাত মেলাতেও বিধা করে নি। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ প্রচারের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করে। শ্রেণীস্বার্থকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের মধ্যে বিলীন করে এবং শ্রেণীসংগ্রামকে সাম্প্রদায়িক সংগ্রামে রূপান্তরিত করে সমাজে সুবিধাভোগী শ্রেণীসমূহ নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করে। তাদের শোষণের প্রকৃত চরিত্রকে

গোপন করার উদ্দেশ্যে তারা সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ওপর জোর দেন। এর মাধ্যমে তারা কেবল এক গ্রহণীয় ভাবাদর্শ গড়ে তোলার চেষ্টাই করে নি; তারা ব্যাপক গণসমর্থন অর্জন করার চেষ্টাও করে। এই প্রসঙ্গে সি. জি. শাহ মন্তব্য করেছেন, “সাম্প্রদায়িক প্রচারের ফলে জনগণ তাদের গোষণের এবং নিপীড়নের ও দৃষ্টান্তের মূল কারণগুলি চিহ্নিত করতে অসমর্থ হন; এবং তারা এক মিথ্যা সাম্প্রদায়িক কারণকে এর সৃষ্টির জন্য দায়ী করে।”^{১১} এই প্রসঙ্গে জগদীশলাল নেহরু বলেন, “সাম্প্রদায়িকতার আচরণে এবং দুই সম্প্রদায়ের পরস্পর সম্পর্কে ভীতির সুযোগ নিয়ে দেশে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাশীলতা বিস্তৃত হচ্ছে।”^{১২}

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর যখন জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটিছিল, তখন সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী এবং এদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতাশীল শক্তিসমূহ সাম্প্রদায়িকতাবাদকে তাদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্বতের রক্ষাকবচ হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে যখন গণচেতনার দ্রুত বিস্তার ঘটতে থাকে, তখন সাম্প্রদায়িকতাবাদ তাদের মূখ্য রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে এবং বৈচিত্র্য থাকার জন্য সংগ্রাম ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছিল। সে সময়ে বৈপ্লবিক শ্রেণীচেতনা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। বিদেশী শাসকগোষ্ঠী এবং ভারতীয় কায়দারী স্বার্থভোগীরা গণ-আন্দোলন বিপ্লব চালিত করতে এবং জাতীয়তাবাদী ও শ্রেণী সমতার প্রবক্তারা যাতে রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ হতে না পারে, সেজন্য সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ প্রচারের মাধ্যমে নিজেদের সামাজিক-রাজনৈতিক ভিত্তিকে দৃঢ় করার চেষ্টা করছিল। এই প্রসঙ্গে বিপ্লবচন্দ্র বলেন যে, সাম্প্রদায়িকতা ছিল পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীসহ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী এবং এদেশের কায়দারী স্বার্থভোগী ব্যক্তিদের ভাবাদর্শ।^{১৩}

এদেশের সাম্প্রদায়িক নেতারা যে মত পোষণ করতেন তা ছিল গলভস্ত এবং সামাজিক সাম্যের বিরোধী। তাঁদের এক মূল বক্তব্য ছিল যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং সামাজিক সাম্য পশ্চাত্য ধারণা থেকে উদ্ভূত এবং তা ভারতীয় সমাজব্যবস্থার উপযোগী নয়। সৈয়দ আহমদ খানের মতো শিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রথমে সামাজিক বৈষম্য দূর করার কথা বললেও দেশে যখন রাজনৈতিক চেতনা

কার্ডিনালের সদস্যদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের যে দাবী জাতীয়তাবাদীরা তোলেন, অভিজাত শ্রেণীর এক মুখ্য প্রবক্তা টৈ মদ আহমদ খান তার বিরোধিতা করে ঐ কার্ডিনালে কেবল সমাজের উচ্চশ্রেণীভূক্ত ব্যক্তিদের মনোনয়নের কথা বলেন। ১৮৮৭ খৃ. স্টোম্বে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, ভাইসরয়ের কার্ডিনালের সদস্যদের সমাজের অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্য থেকে মনোনয়ন করা প্রয়োজন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, নির্বাচিতপ্রণীত লোকেরা বি. এ. বা এম. এ. পাশ করলেও বা কর্মদক্ষ হলেও অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিরা তাদের ক্ষমতা কি মেনে নেবেন?*

সৈয়দ আহমদ খান ও মহম্মদ শফির মত মুসলিম নেতাদের ভয় ছিল যে গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি গৃহীত হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের উপর তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে এবং মুসলিম সম্প্রদায় নিৰ্বাচিত হবে। এই সম্ভাবনা দূর করার জন্য উর্দুবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনার তারা ব্রিটিশ শাসনের এক প্রধান সমর্থক ছিলেন। কিন্তু যখন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলিম নেতারা অনুভব করেন যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের চাপে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে আর দীর্ঘদিন বজায় রাখা হবে না, তখন তারা ভারত বিভাগের দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

পরবর্তীকালে মিঃ জিন্নাহ পূর্ববর্তী মুসলিম নেতাদের বক্তব্যকে আরো জোরালো ভাষায় উপস্থাপিত করেন। ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আলিগড় প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলেন যে, সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের সাথে ভারতের যথেষ্ট পার্থক্য থাকায় এদেশে সেখানকার মতো সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই তিনি প্রতিনিধিত্বমূলক ও গণতান্ত্রিক শাসনকাঠামোর বাইরে সংখ্যালঘুদের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষমতার দাবি জানান।** তিনি বলেন যে, এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করা সম্ভব নয়, এই বক্তব্যকে আরো প্রমাণিত করে তিনি ১৯৪৩ খৃ. স্টোম্বে স্বীকৃতিতত্ত্বকে এক সুনির্দিষ্ট রূপ দেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে না বলে ঘোষণা করে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। স্বীকৃতিতত্ত্বের প্রবক্তারা বারবার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয় বলে প্রচার চালান, তার ফলে পাকিস্তানের গণমানসে গণতান্ত্রিক চেতনা কখনই শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে নি এবং

পরবর্তীকালে সেখানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয় সামরিক একনায়কতন্ত্র।

সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের উদার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তাদের রাজনৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য লক্ষিত হয়। মধ্যম সারির বেশ কিছু হিন্দু কংগ্রেস নেতা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন।^{১১} কিন্তু তারা জাতীয়তাবাদীর ছন্দবেশে কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই থাকতে পারতেন। অপরদিকে মুসলিম উদার সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন নেতাদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব ছিল না। তাই তাঁদের মধ্যে যারা জাতীয়তাবাদী ছিলেন, তাঁদের প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী বলা চলে।

পরাদীন ভারতে হিন্দু এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িক ভাবধারার বিশ্বাসী ব্যক্তিদের চিন্তার পার্থক্যও লক্ষ্যণীয়। একজন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী করত। অপরদিকে একজন সাম্প্রদায়িক ভাবধারায় শুষ্ট হিন্দু বিচ্ছিন্নতার কথা চিন্তা না করে হিন্দু প্রভুত্ব স্থাপনের কথা বলত। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে হিন্দু সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার সাথে মুসলিম সাম্প্রদায়িক চিন্তার মৌলিক পার্থক্য ছিল।

১৯০৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী সরকার গঠিত হওয়ার কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে কংগ্রেসের গণসমর্থন বৃদ্ধির সুযোগ ঘটে। সাম্প্রদায়িক দলগুলি বৃদ্ধিতে পারে যে, তারা যদি জঙ্গী গণ-আন্দোলন শুরুর করতে না পারে, তাহলে ধীরে ধীরে তাদের বিলুপ্তি ঘটবে। এতদিন পর্যন্ত ক্যান্ডারভাস্টিক গণআন্দোলন করত র‍্যাডিকাল ও স্থিতিবাহ্যার বিরোধী জাতীয়তাবাদীরা, সমাজতন্ত্রীরা এবং কম্যুনিষ্টরা। এখন হিন্দু এবং মুসলিম উভয় শ্রেণীর দক্ষিণপন্থীরা ফ্যাসিবাদী সাম্প্রদায়িক গণআন্দোলন শুরুর করল। এতে উভয় সম্প্রদায়ই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কায়মী স্বার্থভোগী ব্যক্তিদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করে।

১৯০৭ সালের মুসলিম লীগের লক্ষ্যে সম্মেলনে প্রথম ফ্যাসিবাদী সাম্প্রদায়িকতার মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়। ঐ সময় হিন্দু মহাসভার মধ্যেও অনুরূপ মনোভাব লক্ষিত হয়। আর. এস. এস. এরও ঐ সময় থেকে দ্রুত বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। এই সব সাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলির প্রধানদের পদগুলি

ছিল ফরার বা ইলদ্যাডের মত স্থায়ী। ফ্যাসিবাদের দ্বারা প্রভাবিত এই সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদের অনুসরণ করে তাদের প্রচারের তীব্রতা বৃদ্ধি করে এবং প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে। হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যথাক্রমে হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্ম এবং মুসলিম সংস্কৃতি ও ইসলাম বিপন্ন বলে আওয়াজ তোলে। তারা বলতে থাকে যে, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মৌলিক বিরোধ রয়েছে তা মেটানো সম্ভব নয়।^{১০} উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ভারতকে এক হিন্দু রাষ্ট্র বলে বর্ণনা করে এবং মুসলমানদের এই হিন্দু রাষ্ট্রের চিরকাল শত্রু বলে অভিহিত করে বলে যে, হয় তাদের হিন্দু আধিপত্য মেনে নিতে হবে, না হলে তাদের দেশত্যাগ করতে হবে।^{১১} আর. এস. এস. এবং থাক্সার গোষ্ঠীর মতো উগ্র সাম্প্রদায়িক সংস্থা সমূহ ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদী দেশগুলির অনুকরণে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের বাণী ছড়াতে থাকে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের প্রধান গোলওয়ালকার বলেন যে ইতালি এবং জার্মানিতে যেমন জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের মতবাদ পুনরায় জাগরিত হচ্ছে, ভারতেও সেরকম হওয়া প্রয়োজন।^{১২}

হিন্দু এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ফ্যাসিবাদী সংগঠন গড়ে তুলে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং হিংসার আবহাওয়া সৃষ্টি করছিল। কিন্তু সে সময় বিদেশী ইংরাজ সরকার ক্ষমতায় থাকায় তারা ব্যাপক সন্দ্বিহাস এবং হিসোর সৃষ্টি করতে পারে নি। ১৯৪৬-১৯৪৭ সালে যখন এদেশে ইংরাজ শাসনের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে তখন ব্যাপক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ শুরু হয়। তাতে বহু ব্যক্তি নিহত বা আশ্রয়হীন হয়। এই হাঙ্গামা সৃষ্টির পিছনে তরুণদের নিয়ে গঠিত ফ্যাসিবাদী সংগঠনসমূহ এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সমসাময়িক কিছু দূরদর্শী ব্যক্তি উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সাথে ফ্যাসিবাদের যে নিবিড় সাদৃশ্য রয়েছে তা বুঝতে পেরেছিলেন।^{১৩} এই সম্পর্কে জহরলাল বলেন যে, হিটলারের অভ্যুত্থানের সময় থেকে তিনি নাৎসি প্রচারের ধারাকে গভীরভাবে বিচার করেছেন। তিনি আরো বলেন যে, অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় এই যে ঐ সময় ভারতেও প্রায় অনুরূপ প্রচার চালানো হয়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারের মাধ্যমে সুদেতান অঞ্চলকে কেন্দ্র করে নাৎসিরা চোকোমোভারিয়াতে যে সংকটের সৃষ্টি করে, মুসলিম লীগের কিছু নেতা তা অনুধাবন এবং সমর্থন করেন। তাঁরা সুদেতান জার্মানদের সাথে ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থার তুলনা করেন।^{১৪} এই ঘটনা সাম্প্রদায়িকতাবাদের সাথে ফ্যাসিবাদের সাদৃশ্যকে মনে করিয়ে দেয়।

অন্যান্য বহু দেশের মতো ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরও নেতৃত্ব দেয় বুদ্ধোন্মত্ত। ভারতে তারা শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করে। শাসনতন্ত্রের সরলপথ ত্যাগ করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বৃহত্তর বিপ্লবের পথে পরিচালন করার ক্ষমতা বা সাহস তাদের ছিল না। তাই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালিত হয় মধ্যম শাসনতান্ত্রিক পথে। সেই সাথে মধ্যবিত্ত ও হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ব্যক্ত হল পরস্পরকে খর্ব করতে। বদরুদ্দীন উমর এর প্রতিবিধানের শর্ত হিসাবে বলেন, “যে পর্বত না দেশের উন্নতি কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্তের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার পথে পরিচালিত হবে, সে পর্বত সাম্প্রদায়িক সমস্যার আর্থিক এবং সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি অটল থাকবে। সাম্প্রদায়িকতার অগ্নিশিখাকে নির্বাপিত করার জন্য তাই প্রয়োজন দেশের আর্থিক জীবনের বৈপ্লবিক রূপান্তর।”^১

গ্রন্থ-নির্দেশ

- ১। বদরুদ্দীন উমর : সাম্প্রদায়িকতা। পৃঃ ১
- ২। C. f. Bipan Chandra : Communalism in Modern India. pp. 1-2
- ৩। J. Nehru : The Discovery of India. pp. 381-382
- ৪। J. Nehru : Selected Works. Vol. VII, p. 69
- ৫। Quoted from R. Suntharalingam's : Indian Nationalism : An Historical Analysis. pp. 188-189
- ৬। E. I. J. Rosenthal : Islam in the Modern National State. p. XIV
- ৭। c. f. Azir Ahmad : Studies in the Islamic Culture in the Indian Environment. pp. 73-76
- ৮। Anil Seal : The Emergence of Indian Nationalism. pp. 338-340
- ৯। Paul R. Brass : “Muslim Separatism in United Provinces: Social Context and Political Strategy before Partition.” Economic and Political weekly. V : 3-5, 1970, pp. 176-180

- ১০। F. Robinson : Separatism Among Indian Muslims :
The Politics of United Provinces, 1860-1923
 - ১১। W. C. Smith : Modern Islam in India. pp. 157-94
 - ১২। A. R. Desai : Social Background of Indian Nationalism
pp. 392-93
 - ১৩। বদরুদ্দীন উমর-এর সাম্প্রদায়িকতা গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃ: ২৩
 - ১৪। C. G. Shah : Marxism, Gandhism and Stalinism p. 185
 - ১৫। J. Nehru : Selected Works. Vol VI. p. 164
 - ১৬। Bipan Chandra : Communalism in Modern India. p. 80
 - ১৭। Syed Ahmad Khan : Writings and Speeches. p. 204
 - ১৮। M. A. Jinnah : Speeches and Writings. Vol. 1, p. 42
 - ১৯। C. f. J. Nehru : An Autobiography. pp. 135-136
 - ২০। V. D. Savarkar : Hindu Rashtra Darshan. pp. 26 and 64
 - ২১। M. S. Golwalkar : We. pp. 19, 52-56
 - ২২। Ibid. pp. 40-43
 - ২৩। Nehru : quoted in Nehru, the first sixty years, Vol. 11.
pp. 344-345
 - ২৪। Ibid. p. 388
 - ২৫। C. f. বদরুদ্দীন উমর। সাম্প্রদায়িকতা। পৃ: ২৮
-

গান্ধী-নেহরু সম্পর্কে নূতন ধরনের গবেষণা

নবহরি কবিবাহু

সম্প্রতি গান্ধী ও নেহরুর ভূমিকা সম্পর্কে বেশ কিছু নূতন তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। তার ভিত্তিতে কিছু নূতন গবেষণাও আরম্ভ হয়েছে। এই গবেষণা শুধু যে এই নূতন তথ্যগুলি ব্যবহার করছেন তা নয়, এগুলির ভিত্তিতে তারা বেশ কিছু নূতন সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়েছেন। তাদের মতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, যার রূপকার ছিলেন গান্ধী ও নেহরু, তার একটি নিজস্ব স্ফুটনই চরিত্র আছে—জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে যা একটি নূতন মডেল হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য।

স্বাভাবিক কারণেই এই নূতন ধরনের গবেষণার নেহরু চরিত্রের মূল্যায়নের প্রসঙ্গটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, কেননা নেহরু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে দীর্ঘ দিন ধরে দেশের রাজনীতির কর্ণধার হয়েছিলেন এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে আধুনিকতার উপাদানে সমৃদ্ধ করার কৃতিত্ব তাঁরই সবচেয়ে বেশী।

অধ্যাপক গোপাল দাঁবি করেছেন—নেহরু তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের পথপ্রদর্শক। নেহরু উদ্ভাবন করেছেন—ভারতের মত অনগ্রসর দেশের উপযোগী গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের এক নূতন পথ—যা প্রকৃত গণতন্ত্রের উপাদানে সমৃদ্ধ, অথচ গোড়া মার্কসবাদের বন্ধ চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি মন্তব্য করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বে কখনও হয় নি।

অধ্যাপক বিপানচন্দ্র তাঁর গবেষণা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, দনতন্ত্রের পথের মধ্যেই নেহরুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি দনতন্ত্রের এমন একটি নূতন পথ আবিষ্কার করেছেন, যা প্রকৃত অর্থে প্রগতিশীল এবং যা কার্যক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য পূরণে পুরোপুরি সক্ষম হয়েছে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফরাসী পথ ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চৈনিক পথের পাশাপাশি এ একটি তৃতীয় পথ—যাকে ভারতীয়

তার মতে নেহরুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে দেখা গেছে ধনতন্ত্রের পথের দৃষ্টি সংস্করণ সম্ভব, একটি প্রগতিশীল সংস্করণ : ধনতন্ত্রের স্বাধীন বিকাশের পথ : যার ভিত্তি অ-একচেটিয়া পুঁজি এবং ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানশীল সংস্করণ : ধনতন্ত্রের পরাধীন বিকাশের পথ : যার ভিত্তি হল একচেটিয়া পুঁজি। নেহরু ছিলেন ধনতন্ত্রের পথের প্রগতিশীল সংস্করণের উদ্‌গাতা। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, একটি বৃজ্জিয়া সরকারের পক্ষে যতটা প্রগতিশীল হওয়া সম্ভব, নেহরু সরকার ছিল ততটাই প্রগতিশীল।

মোটামুটি এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে বি. আর. নন্দা গান্ধী ও নেহরুর চিন্তার মধ্যে যে যোগসূত্রটি আছে সেটি সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, বিংশ শতাব্দীর দৃষ্টি প্রধান মত ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র—এই দুইয়ের কোনোটিকেই গান্ধীজী গ্রহণ করেন নি। তিনি এমন একটি তৃতীয় পথের আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন যা শোষণ মূক্তির পর্যায়দর্শন করেছে তবে তা রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগ ছাড়াই।^{১০}

লক্ষ্য করার বিষয়, এই গবেষকদের চিন্তার একটি জায়গায় বেশ মিল আছে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্কসীয় ব্যাখ্যাটি তাদের প্রধান আক্রমণের বস্তু হয়ে উঠেছে। তাঁরা বলতে চান, কালের বিচারে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্কসীয় ব্যাখ্যা (যা কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিলপত্রে ছড়ানো রয়েছে) তা গোপে টিকল না।

কমিউনিস্টদের বহু প্রচারিত তত্ত্ব—ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকটের যুগে ধনতন্ত্রের পথে বৃজ্জিয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন করা যায় না—এই তত্ত্বটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বরং ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আগেও যেমন আজও তেমনি তার প্রগতিশীল চরিত্রটি হারায় নি। তাঁদের মতে এই কারণেই ভারতীয় জনমানসে স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘদিন পরেও এই জাতীয়তাবাদ নিজস্ব প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছে। অপরদিকে মার্কসীয় বিকল্পটি জনগণের বিবেচনার যান্ত্রিক বলে মনে হওয়ার ক্রমশই প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে।^{১১}

তাদের আক্ষেপ, ভারতীয় মার্কসবাদীরা এখনও এক ধরনের মতামতভার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করে রেখেছে।

পৃথিবীতে মার্কসবাদ নিয়ে সর্বশেষ যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে মার্কস-বাদেয় যে সৃজনশীল বিকাশ ঘটছে—ইউরো-কমিউনিজম ‘ওয়েস্টার্ন মার্কসিজম’ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে—এ সম্পর্কে ভারতীয় মার্কসবাদীরা একেবারেই উদাসীন অথচ এই ‘ওয়েস্টার্ন মার্কসিজমের আলোকে দেখলে বোকা যাবে যে নেহরু

অনেক আগেই প্রায় এই লাইনে চিত্রা করতে চেষ্টাছিলেন। অধ্যাপক গোপালের মতে নেহরুর সমাজতন্ত্র আঙ্গকের দিনের ইউরো-কমিউনিজম-এর বেশ কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিল।" অধ্যাপক বিপানচন্দ্র ও তার অনুগামীদের মতে গ্রামসির চিত্রাকে অনুসরণ করে পশ্চিম ইউরোপে মার্কসবাদের সৃজনশীল বিকাশের যে চেষ্টা চলছে তার সঙ্গে নেহরুর চিত্রায় বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রামসির মতই নেহরুও সেই যুগে দাঁড়িয়ে নিজের মত করে গনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার আশ্রয় চেষ্টা করেন।"

ইউরো-কমিউনিজম ও ওয়েস্টার্ন মার্কসিজম মার্কসবাদের সৃজনশীল বিকাশে নতুন সংযোজন কিনা সে তর্কে এখানে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন মৌখিক না। কিন্তু এই গবেষকদের মূল অভিযোগ—ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্কসীর ব্যাখ্যা ভুল—তার সত্যাসত্য বিচার করার অবশ্যই প্রয়োজন আছে।

মার্কসবাদীরা সর্বপ্রথম ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শ্রেণী বিশ্লেষণের প্রয়াসটি উত্থাপন করেন। তারাই সর্বপ্রথম বলেন—ভারতীয় জাতীয়তাবাদ শ্রেণী চরিত্রের দিক থেকে বিচার করলে বুদ্ধিজীবি জাতীয়তাবাদ।

বর্তমান গবেষকদের ঠিক এইখানেই আপত্তি। তাদের মতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ "শ্রেণীনিরপেক্ষ" মতবাদ।"

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ একটি শ্রেণীনিরপেক্ষ মতবাদ—মার্কসবাদের সৃজনশীল বিকাশের এ এক নমুনা বটে। মার্কসবাদের সংস্কারের নামে মার্কসবাদের হ্রস্ব থেকে তার লম্বিপন্ডটি ছিঁড়ে ফেলে দেওয়ার এ যেন এক প্রচেষ্টা।

একথা স্বীকার করতই হবে—মার্কসবাদীরা অতীতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এমনসব অতিসরলীকৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছিল—যা ইতিহাসের বিচারে যোগে ঢেঁকে নি—যার কঠোর সমালোচনার প্রয়োজন আছে।

ভবে এই সব ভুলত্রান্তি সত্ত্বেও মার্কসবাদীরাই সর্বপ্রথম ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শ্রেণীবিশ্লেষণের প্রয়াসটি উত্থাপন করেন—এটি বড় কথা। শ্রেণীবিশ্লেষণ বাদ দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আসল চরিত্রটি কোনোভাবে সনাক্ত করা সম্ভব নয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শ্রেণীভুলটি সম্পর্কে উদাসীনতা অবলম্বন করলে সত্য অনুসন্ধানের কাজ বিলুপ্ত হবে; আসলে এই শ্রেণীভুলটি সঠিকভাবে চিহ্নিত করার উপর ও তাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার উপর মার্কসীর শ্রেণী বিশ্লেষণের সাফল্য নির্ভর করবে।

গত চার্লিশ বছর ধরে গান্ধী-নেহরুর চিন্তাধারাকে সামনে রেখে জাতীয়তাবাদীরা ভারত শাসন করেছেন। এই অভিজ্ঞতা থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের—কোথার শক্তি, কোথায় তার ব্যর্থতা, মার্কসবাদীদের পক্ষে তা দেখার ও বোঝার সুযোগ হয়েছে। এই অভিজ্ঞতার আলোকে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একটি নবতর মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে গান্ধী ও নেহরু ছিলেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সংগঠনাগণ দুই নেতা। গান্ধীজী ছিলেন জাতীয় আন্দোলনের পিতা। এক নৃতন ধরনের আন্দোলনের প্রমুখ, অহিংস সত্যগ্রহের রূপকার ও সংগঠক। গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্য রূপ পরিগ্রহ করে নেহরু ছিলেন তার উত্তরসারক, যদিও এই জাতীয় ঐতিহ্য সৃষ্টিতে নেহরুর নিজস্ব অবদান কম নয়। তিনি গান্ধীবাদের কোনো কোনো দিক (যেমন আধুনিক যন্ত্র-সজ্জাত সম্পর্কে গান্ধীজীর অস্বীকার), যা তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে হয়েছিল, গান্ধীবাদের সেই দিকগুলিকে তিনি বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন। লক্ষ্য করার বিষয়, গান্ধীজী নিজেকে শেষ পর্যন্ত নেহরুর অবস্থানের বুদ্ধিবৃত্ততা মেনে নেন। তেমনি আবার গান্ধীজী নেহরুর স্যাডিকাল চিন্তার প্রতিটি প্রথম থেকেই টেনে ধরেছিলেন। নেহরুর স্যাডিকাল চিন্তা, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র দ্বারা প্ররোচিত, বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের দিকেও যাতে প্রসারিত না হয়, সেদিকে তার ছিল তীব্র দৃষ্টি। যেদিন নেহরু গান্ধীজীর নির্দেশে কংগ্রেস ভার্যাকং কর্মটির আপোষ প্রস্তাবটি (১৯৪৪) মেনে নিলেন সেইদিন থেকেই নেহরুর অর্ধপ্রস্তুতিত সমাজতান্ত্রিক চিন্তা বুদ্ধোন্মাদ মতাদর্শের চৌহান্দির মধ্যে বাধা পড়ল।

কার্যক্রেতে গান্ধী ও নেহরুর ভূমিকা ছিল পরস্পরের পরিপূরক। মনে হয় যেন তারা নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিয়েছিলেন। একদিকে গান্ধীজীর কর্মকান্ড (সত্যগ্রহ আন্দোলন) জাতীয় আন্দোলন ও বিপুল কৃষক সমাজের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছিল। অন্যদিকে নেহরুর আধুনিকতা দেশের বুদ্ধিজীবীদের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। উভয়ের যৌথ চেষ্টার ভারতে গড়ে উঠেছিল সত্যিকারের দেশবাসী এক জাতীয় জাগরণ।

গান্ধী-নেহরু পরিচালিত জাতীয় আন্দোলন নিঃসন্দেহে ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম কিন্তু এক বিশেষ ধরনের ঐক্যতা থেকে এই আন্দোলন কখনও

মুঠ হতে পারে নি। সেই বৈতত্য ছিল ইতিহাস-নির্দিষ্ট। কেননা, এটি ছিল ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে বৃজোরাদের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এই আন্দোলন এমন সময় সুসংগঠিত হয়েছে যখন পরাধীন দেশে বৃজোরা জাতীয়তাবাদ প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি, অথচ বৃজোরা জাতীয়তাবাদকে প্রতিনিয়ত যুগের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

এই পটভূমিতে গান্ধী ও নেহরুকে সমাজতান্ত্রিক স্বত্ববাদ সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাবহার ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল। এটি বেশ জরুরী হয়ে উঠেছিল এই কারণে যে, শৃঙ্খল বিপ্লবের প্রভাবে শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের আকাংক্ষা সারা পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল তাই নয়, দেশের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের অভ্যন্তরে একটি বামপন্থী ধারা ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল। তারা এক নতুন ধরনের জাতীয় মুক্তি সত্ত্ব্যাম গড়ে তুলতে চাইল যার আশ্রয় লক্ষ্য হবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, যার চরম লক্ষ্য হবে এক বা একাধিক অন্তর্ভুক্তিকালীন শ্রবের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ।

এই অবস্থায় গান্ধী ও নেহরুকে সমাজতন্ত্রের চ্যালেঞ্জটি সম্পর্কে সদা-সজাগ থাকতে হয়েছিল। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা বললেন—সম্প্রতির অসম বটন অন্যান্য, কিন্তু দেশ পুরোপুরি সমাজতন্ত্রের জন্য (অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্প্রতির পূর্ণ বিলুপ্তির জন্য) প্রস্তুত নয়। তাই তারা মধ্যপন্থা হিসেবে সম্প্রতির অসম বটন কিছুটা কথ করতে চান—অর্থাৎ শ্রেণীসমাজের মধ্যে তারা কিছু পরিবর্তন আনার পক্ষপাতী। একেই তারা সমাজতন্ত্রের দিকে পদক্ষেপ বলে প্রচার চালাতে আরম্ভ করেন। গান্ধীজী ঘোষণা করলেন—তিনিও সমাজতন্ত্রী। নেহরুর পক্ষ থেকে মৃদু-মৃদু সমাজতন্ত্রের কথা উচ্চারণ জাতীয় আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে বেশ কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করল।

এই ধরনের সুপরিমার্জিত আদর্শগত অভিব্যক্তি বামপন্থীদের বেশ কিছুটা অসুবিধার ফেলোছিল।

এ ছাড়া আরেকটি বড় কথা, ভারতের বৃজোরাপ্রেশী জাতীয় আন্দোলনের উপর তাদের নেতৃত্ব (hegemony) শেষ পর্যন্ত (কমতা হতাত্তরের সময় পর্যন্ত) কঙ্কর রাখতে পেরেছিল। এর ফলে জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতটি কখনও বৈতত্যের থেকে মুক্ত হতে পারে নি। একদিকে গান্ধী-নেহরু পরিচালিত জাতীয় আন্দোলন যেমন কখনও সার্বভাষাবিরোধী চরিত্র

হারায় নি, তেমনি আবার বিপ্লবের শক্তিগর্ভালি যাতে জাতীয় আন্দোলনে প্রধান ভিত্তির করতে না পারে সেইদিকে আগাগোড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল।

শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে অনীহা, বিপ্লব সম্পর্কে ভয়—এটি ছিল এই আন্দোলনের দুর্বলতম স্থান।

এই কারণে গান্ধী-নেহরু পরিচালিত জাতীয় আন্দোলন কখনও একটি অর্থসমাপ্ত বিপ্লবের উদ্দেশ্যে উঠতে পারে নি।

এই ষেত নীতির আনবার্ষ পরিলভিত—১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনা।

এটা লক্ষ্য করার বিষয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে জাতীয় আন্দোলনের অভ্যন্তরে যখন প্রামিক-কৃষক-সৈনিক বারবার জঙ্গী সংগ্রামে সন্নিবিষ্ট হচ্ছিল, যখন বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ধারাটি জাতীয় আন্দোলনের অভ্যন্তরে শক্তি সঞ্চার করতে আরম্ভ করোঁছিল, ঠিক সেই সময়ে গান্ধী-নেহরু পরিচালিত জাতীয় আন্দোলন সন্মানজনক শর্তে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ রক্ষার আসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল।

সোভিয়েত নেতৃত্বে পৃথিবীব্যাপী ফ্যাসিবিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তির জয়লাভে আত্মশ্রুত, এশিয়ার দেশগুলিতে বিশেষ করে চীনে ও ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট বিজয়ে ভীতসংশ্লিষ্ট, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতেও একগণ-অভ্যুত্থানের বিপদসংকেত লক্ষ্য করল। এই অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদীরাও, সর্বনাশে সমুদ্বগ্নে অর্থহীনতাভিত্তিক, এই সাধুবাক্য শ্রবণ করে ভারতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে একটি বোঝাপড়ার আসার প্রয়োজনীয়তা খুবই অনুভব করল।

এই পটভূমিতে ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটেছিল—এই কথাটি ভুলে গেলে চলবে না।

ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনাতে জাতীয় বুর্জোয়াদের ষেত চরিত্রটি নিরুৎসাহ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। ভারত ক্রমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করল। কাজেই একে সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ কিছুতেই বলা যায় না। আবার এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এই ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে ঘটেছিল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ (দেশ বিভাগ, কমনওয়েলথ অবস্থান প্রভৃতি যার প্রমাণ)।

এই ক্ষমতা হস্তান্তরের গুরুত্বটি ছোট করে দেখা হুল। আবার এর দুর্বলতার দিকটি উপেক্ষা করা ঠিক নয়।

একটি বিপ্লবের আসল চরিত্র সে কি ধরনের রাজ (power) প্রতিষ্ঠা করল তার উপর নির্ভর করে। ১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে ভারতে বৃজেরাশ্রণী শাসকশ্রেণীর পদমর্যাদা লাভ করল। ক্রমে দেশে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। বৃজেরাশ্রণীর দৃষ্টান্তস্বরূপ থেকে শাসকশ্রেণী তার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চরিত্রটি অক্ষুণ্ণ রাখল। সঙ্গে সঙ্গে জনতন্ত্রের পথ অনুসরণ করার তার জন-বিরোধী চরিত্রটিও বেশ স্পষ্ট আকারে দেখা দিল। জনতন্ত্রের বিকাশের নিয়ম অনুযায়ী একচেটিয়া পুঁজি স্বত্বাধিকার হয়ে উঠল, গ্রামাঞ্চলে ধনী কৃষকের উপস্থিতি স্পষ্ট হয়ে উঠল, জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি দারিদ্র্যসীমার নীচে পড়ে রইল।

ভারতীয় বিপ্লবের নেহরুর মডেলটি জনগণের চোখে উদ্ঘাটিত হল : কুৎসিত জনতন্ত্রের সেই পুরোনো মডেল হিসাবে।

ইতিহাসে আর এক ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা পাওয়া যায়— জনগণের স্বার্থে রূপান্তরিত গণতান্ত্রিক বিপ্লব। জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, যারা নীচুস্তরের লোক, সমাজের সবচেয়ে নিষ্প্রভিত ও শোষিত অংশ, তারা এই বিপ্লবের নায়ক। জনগণের আশা-আকাংক্ষা দাবিদাওয়া এই বিপ্লবের প্রতিটি অংশে প্রতিফলিত হয়ে থাকে, পুরোনো সমাজ ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়ার প্রচেষ্টা এই বিপ্লবকে নিজস্ব রূপ দান করে।

ভারতে এমন রাজনৈতিক শক্তি রয়েছে যারা এই নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি স্পষ্ট ছবি জনসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করছে।*

এই প্রক্রিয়া প্রথম দফার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসম্পূর্ণ কাজগুদাল (যেমন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, কৃষকের স্বার্থে ভূমিসংস্কার, জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতি) সুসম্পন্ন করবে। এই প্রক্রিয়াটি অ-গণতান্ত্রিক পথ বেছে নেবে, এবং এক বা একাধিক অন্তর্বর্তীকালীন জয়ের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্র গিয়ে পৌঁছাবে। একথা স্বীকার করতে হবে—নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই প্রক্রিয়াটি ভারতে এখনও যথেষ্ট শক্তি সঞ্চার করতে পারে নি, তবে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এই প্রক্রিয়াটি বৃজেরা জাতীয়তাবাদের একমাত্র স্থির ও কার্যকরী বিকল্প হিসাবে ভারতের মাটিতে ইতিমধ্যেই আবির্ভূত হতে আরম্ভ করেছে।

দ্রুত নির্দেশ

1. Gopal—Jawaharlal Nehru, A Biography, Volume—2, pp-304-305 ; Volume-3, pp-16, III; Gopal, The Mind of Nehru.
 2. Bipan Chandra—Nationalism and Colonialism in Modern India, pp-163-165.
 3. B R. Nanda—Gandhi and Nehru.
 4. Bipan Chandra (Ed)—The Indian Left, pp-259-400
 5. Gopal—The Mind of Nehru
 6. Bipan Chandra (Ed) —The Indian Left, pp-45-101
 7. Bipan Chandra—p. 48
 8. Programme, C.P.I.; Programme, C.P.I. (M)
-

সাজ্জাদ জহীরের শেষের দিকের লেখা

রূপেশ দাশগুপ্ত

(১)

আমাদের উপমহাদেশের বিশিষ্ট জাতীয় মূর্তিসংগ্রামী, মজুর ও কৃষক অভ্যুত্থানের সামনের সারির উদ্যোক্তা, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের প্রধানতম প্রবক্তা ও অক্লান্ত কর্মটানিষ্ট সংগঠক সাজ্জাদ জহীরের মৃত্যু হয়েছে ১৯৭০ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর। তিনি তাঁর ৬৮ বছরের বহুমুখী কর্মময় জীবনে নিজের লেখক-রূপটিকে যেমন সামনে আনার সময় পাননি, তেমন বড় একটা উদ্যোগীও ছিলেন না। সাহাযীদের দিয়েই লেখাতে চেয়েছেন বেশি। তবু গল্পমুখী সাহিত্যকে তিনি তাঁর কুশলী হাতে মাতৃভাষা উর্দুতে লেখা ছ' সাতটি বই দিয়েই সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। আমরা যে একটি মাত্র উপন্যাস পেয়েছি, তার নাম 'লন্ডন কি এক রাত' (লন্ডনে একরাতি)। উপন্যাসটি আসলে আমাদের উপমহাদেশের পরাধীনতার জ্বালা ও টানা পোড়েনের ইতিবৃত্ত, যা বিগত বিশের দশকে ও তিরিশের দশকের শুরুরূতে একটা গল্পঅভ্যুদয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর 'কারালাপি' হচ্ছে ব্রিটিশ আমলে বন্দীজীবনের আলেখ্যমালা। এতে জীবন থেকে নেওয়া অনেকগুলি ছোট ছোট গল্প রয়েছে। এছাড়া আমরা তাঁর জীবদ্দশায় পেয়েছিলাম কয়েকটি নিবন্ধের বর্ম। তাঁর জীবনের শেষ দশ বছরের লেখাগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু বই হয় নি।

উত্তরপ্রদেশে উর্দু আকাদেমি বেগম রাজিয়া সাহাদ জহীরের সহযোগিতায় এই শেষের দিকের লেখাগুলিকে "সাজ্জাদ জহীরের প্রকথাবলী" নাম দিয়ে লুক্সো থেকে প্রকাশ করেছেন। আমরা এই বইটির একটি পরিচিতি এখানে পেশ করছি, প্রত্যেকটি প্রবন্ধের সারমর্ম উপস্থিত করে।

(২)

বইটিতে নিম্নোক্ত ১৪টি প্রবন্ধ রয়েছে। যথা, (১) উর্দু কাব্যের কয়েকটি প্রবন্ধ, (২) উর্দু গদ্য সাহিত্যে রূপ বিপ্লবের প্রভাব, (৩) প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের তিরিশ বছর, (৪) সাহিত্য ও জীবন, (৫) মহান প্রগতিবাদী কবি গালিল, (৬) হালির কাব্যকীর্তির গুরুত্বময় ভূমিকা, (৭) আমীর খসরু

দহলবী ও তাঁর কাব্যকৃতি, (৮) গোয়েটে ও শিলারের দেশে করেকটা দিন, (৯) শিল্পীর সৃষ্টির স্বাধীনতা, (১০) কবিতা ও সম্রাট, (১১) উদ্‌ কাব্যে বাস্তব-বিশ্ব, (১২) শৈল্পিক সৃষ্টিতে অনুধাবন ও রূপায়ন, (১৩) সর্দার জাফরীর নতুন কাব্যগ্রন্থ আরও—স্বপ্ন চাই, (১৪) ওহাদ আখতারের কাব্যকৃতি।

আমরা এই ১৪টি প্রবন্ধকে তিনভাগে ভাগ করে নিয়ে এদের বিশেষ বিশেষ ধারাকেও তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। এই তিনটি ভাগ হ'ল, (১) প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের দ্বারা বর্ণনার মধ্য দিয়ে নীতি, আদর্শ ও সৃষ্টির বিশ্লেষণ, (২) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সাহিত্যে মার্কসীয় তথা সমাজতান্ত্রিক তথা কমিউনিস্ট জীবন দর্শনের ব্যাখ্যা, (৩) ঐতিহাসিক মানবিক বৈপ্লবিক উপকরণ ও উপাদান ও তাদের সংযুক্তি।

(০)

আমাদের প্রথম ভাগের দু'টি লেখা 'প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের তিরিশ বছর' ও 'উদ্‌ গদ্য সাহিত্য রূপ বিপ্লবের প্রভাব' মূলত প্রগতিবাদীদের সাহিত্য আন্দোলনের সংগঠন ও সৃষ্টির ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত।

১৯০৫ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত তিরিশ বছরের ইতিবৃত্ত দাঁখল করতে গিয়ে প্রগতি আন্দোলনের সঙ্গে উপমহাদেশের প্রাথমিক লেখকরা গোড়া থেকেই নিজেদের কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত করেছিলেন, সাম্রাজ্য তাঁর বিরুদ্ধে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ১৯০৬ সালে প্রথম সম্মেলনে প্রেমচন্দ্র, জোশ মলহাবাদী এবং সুমিঠানন্দন পন্থের মতো সাহিত্যের দিকপালরা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের সম্মতি বাস্তব করেছিলেন। প্রেমচন্দ্র তাঁর সভাপতির অভি-ভাষণে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে 'মহাজনী' বা অর্থ ও মনোফাখোরীর শাসন ও শোষণ বলে বিকৃত ও চিহ্নিত করেছিলেন। দু'বছর পরে ০৮ সালে দ্বিতীয় সম্মেলনে উপস্থিত হতে না পারলেও রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক বাণী পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই বাণীর সারমর্ম হচ্ছে, "আমি জনগণের সঙ্গে মিলেমিলে না গিয়ে খানিকটা আলগা থেকে যে ভুল করেছি, সেই ভুল তোমরা কোরো না। জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেই সাধারণ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব। অহমিকার খোলশ ডেকে বন্ধের বাকল ছিঁড়ে ফুলের মজরীর মতো বোঁরলে এসে তোমাদের লেখা জনগণের সঙ্গে একত্রিত ও একাত্ম হোক।" সাম্রাজ্যদ
মূল্যায়ন—০

জহীর সৈদন রবীন্দ্রনাথের শ্রুতিভেদ। বাণীটি পেরে কত গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৬৫ সালে পেরিছে তিনি তার আট পৃষ্ঠার প্রবন্ধটির মধ্যে তিনি পৃষ্ঠা জুড়ে রবীন্দ্রনাথের পুরো বক্তব্যটি অনুবাদ করে দিয়েছেন। শব্দ তাই নয়, তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ দিয়ে লেখা শেষ করতে গিয়ে বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের জটিল ও সমস্যা-পীড়িত জীবনে আজও অশঙ্ক্য পথে মশালের মতো দিশারী' (মশালে-রাহ)।

'প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের তিরিশ বছর'-এ সাম্রাজ্য জহীর আরও করে কটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ও বিশ্লেষণ দাখিল করেছেন। তিনি প্রথমেই দেখিয়েছেন যে, তিরিশের দশকের শুরুর দিকে আমাদের উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মত্মসংগ্রাম যে নতুন মোড় নেয়, তার মূলে ছিল মজুর ও কৃষক আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে বাম-মোচর উদ্ভব। এই সময়ে আন্তর্জাতিক বিশ্ব-পরিমার্জিত একই সঙ্গে নতুন গণ-বিপ্লবী ও সমাজতান্ত্রিক সম্ভাবনার ও উদ্বেগজনক ফ্যাসিবাদী শক্তির বিন্যাস ঘটেছে। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সফল হওয়ার দরুন বিশ্বের সর্বত্র সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সমর্থনে জনমত গড়ে উঠেছে। একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদের অগ্রফলক ফ্যাসিবাদ ইউরোপে মাথা তুলেছে, তেমনি তার বিরুদ্ধে গণ-ঐক্য জোট গর্বিত হয়েছে এবং চীন জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে রত হয়েছে। এই পটভূমিতেই বিশেষ করে ইংল্যান্ড এবং সেই সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য দেশের প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা ফ্যাসিবাদবিরোধী ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার উদ্ভূত এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মোড় পরিবর্তনে উৎসাহিত। ছাত্রছাত্রীদের এই রাজনৈতিক অবস্থান সাহিত্যেও নতুন অবস্থান নিয়ে আসে। ১৯০৫ সালের শুরুর্তে ইংল্যান্ড পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন এবং কয়েকজন প্রবাসী বুদ্ধিজীবী একজন সহানুভূতিশীল চীনা রেস্তোরাঁ মালিকের সৌজন্যে তাঁর রেস্তোরাঁর কসে ভারতীয় প্রগতি সাহিত্য সন্ধ্যা নাম দিয়ে একটি সন্মিলন গঠন করেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ মল্লিকরাজ আনন্দ, প্রমোদ সেনগুপ্ত, ডঃ মুহম্মদ নীল তাহের, ডঃ জ্যোতি ঘোষ ও সাম্রাজ্য জহীর।

প্রধানত ইতিবৃত্তমূলক দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'উদ্' গদ্য সাহিত্যে রূপ বিপ্লবের প্রভাব' এতে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে কোর্দালি উদ্ সাহিত্যে নতুন দিগন্ত আনার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে জাতীয় মত্মসংগ্রাম ও সমগ্র প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনকে অগ্রসর করেছে। এরকম একটি তথ্য এই যে,

মওলানা আবুল কালাম আজাদের সম্পাদিত 'আলহেলাল' পণ্ডিত্য কর্মিউনিট মেনিফেস্টোর উদ্ অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন মওলানা আবদুর রেজ্জাক মলিহাবাদী।

সাম্ভ্রাদ জহীর তাঁর প্রবন্ধটিতে দেখিয়েছেন, রুশ-বিপ্লবের প্রভাবে উদ্ গদ্যে মার্কসীয় চিন্তাধারার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে যে সব বই লেখা হয়, তারা সাধারণভাবে উদ্ সমালোচনা সাহিত্যেও মার্কসীয় ভাবধারার প্রসার ঘটায়। উপমহাদেশে প্রগতি সাহিত্য সংঘের সূচনা কালেই বিশেষ করে আখতার হুসেন রায়পুরী এবিষয়ে পথিকৃতের কাজ করেন। এই সময়ে লাহোর থেকে প্রকাশিত 'আদবে লতিফ' পণ্ডিত্যে কবি য়য়েজ আহমদ ফয়েজ মার্কসীয় ভাবধারার উপর কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৩৮ সালে উদীফমান কবি সরদার জাফরী কবি মাজাজ ও পরবর্তীকালের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী গ্রন্থকার সিবতে হাসানের সম্পাদনায় লক্ষ্মী থেকে প্রকাশিত মাসিকপত্র 'নয়া আদব'ও মার্কসীয় ভাবধারার ভিত্তিতে সাহিত্যে নতুন চিন্তার তরঙ্গ নিয়ে আসে। এ প্রসঙ্গে সাম্ভ্রাদ জহীর লিখেছেন, "এই মাসিকপত্রটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বহুতপস্কে প্রগতিবাদী সাহিত্যে মার্কসবাদের অনুরাগীদের একটা কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। মজনু গোরখপুরী ও এহেতশাম হুসেনের গোড়ার দিকের মার্কসীয় প্রভাবে লেখাগুলি এই পণ্ডিত্যেই প্রকাশিত হয়। উদ্ কাব্যে কর্মিউনিট আন্দোলনের প্রভাব তো ইতিপূর্বেই পড়োঁড়ল, এবার গল্প-উপন্যাসও এই আন্দোলনে শরিক হয়। এই দিকটা সব প্রথমে সবচেয়ে বেশি হুমহুগাহী ও রসসমৃদ্ধ রূপের কৃষ্ণচন্দের ছোট গল্পে। এই সময়ে সাদান হাসান মিটো (মার্কসবাদে দীক্ষিত না হলেও) রাজ্জাদের পিং বেদী, আহমদ নদীম কাসনী, ইসমত চুখতাই ও হারাতউল্লাহ আনসারীর গদ্যরীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর বাস্তবতাবাদ ও মানবতাবাদ স্বাধীনতা প্রিয়তার বলিষ্ঠ চিন্তাধারাকে উপস্থাপিত করে। এই চিন্তাধারা ছিল সমাজতন্ত্রী তথা কর্মিউনিট জীবনদর্শনে ভরপুর।"

সাম্ভ্রাদ জহীর এরপর লিখেছেন, "১৯৪২ সালেও পরবর্তী কয়েক বছরে বোম্বেই থেকে প্রকাশিত কর্মিউনিট পার্টির পণ্ডিত্য 'কৌমী জং' ও 'নয়াজমানা' যদিও রাজনৈতিক, কাগজ ছিল তবু এর সম্পাদকীয় দপ্তরে লেখক ছিলেন প্রধানত প্রগতি সাহিত্যের কর্মীরা। এদের মধ্যে ছিলেন সরদার জাফরী, সিবতে হাসান, কৈফ আজমী, জেড আনসারী, আবদুল্লাহ মালিক, কলিমুল্লাহ, মোহাম্মদ মেহেদী, সাম্ভ্রাদ জহীর।"

এই প্রবন্ধের একটি তথ্য আমরা দেখতে পাই, পাকিস্তানে কার্শবাদের ধানধারণা পোষণ হবে কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালেও সেখানে কার্ল মার্কসের 'ডাস ক্যাপিটাল' গ্রন্থের উদ্ অনুবাদ প্রকাশ করেছেন প্রগতিবাদীরা।

আমাদের প্রথম ভাগে বাকী থাকছে ইতিবৃত্তের ধারাতে হলেও মূলত সমালোচনা ও আত্মসমালোচনামূলক তিনটি প্রবন্ধ : 'উদ্ কাবোর কয়েকটি প্রবন্ধ', 'সদার জাফরীর নতুন কাব্যগ্রন্থ আওর ম্বল্প চাই' এবং 'ওহীদ আমফতারের কাব্যকৃতি'। মুক্তিসমগ্রামী জনগণের ভরফ থেকে অথবা প্রগতি সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উদ্ভাবী গনচেতন কবিদের কাছে যা প্রত্যাশা করা হয়েছে এবং তাঁরা তার কতখানি পূরণ করতে পেরেছেন, সে সম্বন্ধে মুন্সায়নমূলক এই প্রবন্ধ চারেকাটকে যেমন স্বাধীনভাবে আত্মসমালোচনা করা হয়েছে, তেমনি আরেকটিকে সার্বক সৃষ্টি যেখানে যারা থাকিছু করেছেন, তার প্রতি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তাঁদের নিয়ে গর্বও করা হয়েছে। তাঁরিশের দশক থেকে যাঁদের দশক পর্বত সময়ে উপমহাদেশের প্রচণ্ড ভাঙ্গাফাড়া ও পুনর্বিন্যাসের অধিকার চুড়ান্ত দৃষ্টান্তক গতিধারায় কাবোর লগিতবাণীকে বাস্তবতাসম্মত রাখার জন্য কঠিন সাধনা করতে হয়েছে, আবার কঠোর বাস্তবের মধ্যেই কোমল সূর সৃষ্টি করতে হয়েছে। বিভিন্ন প্রগতিবাদী কবি বিভিন্ন মাঠা, বিভিন্ন রূপাধার নিয়ে একটিকে যেমন বৈচিত্র্যে মগ্ন একটিকে আনতে পেরেছেন, আনতে পেরেছেন অভূতপূর্ব সার্বকতা। তেমনি প্রত্যাশা পূরণ করতে তাঁরা পারেনও নি, গতানুগতিক নতুন সাজে সাজিয়েছেন মাথ। মতান্তর হয়েছে, সম্ভাব্য দ্বারায় ভাস্কর হয়েছে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও উৎকণ্ঠা প্রবল হয়েছে। উপমহাদেশের অন্যান্য ভাষাতেও প্রগতি সাহিত্যের দ্বারায় আশাবাদ ও আক্ষেপ বেভাবে দেখা দিয়েছে, তারই আলোকে উদ্ কাবোর পরপর সমসাময়িক দুই প্রবন্ধের রূপকারদের লেখার কৃতিত্ব ও সার্বকতাকে সাক্ষ্যদ জহীর ছোট ছোট প্রবন্ধেই দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন।

'উদ্ কাবোর কয়েকটি প্রবন্ধ' প্রবন্ধে তিনি যেমন গজল রচনার ফরেনজ আহমদ ফরেনজেরও গতানুগতিকতার উল্লেখ করতে ছিঁচা করেন নি, তেমনি 'নজম' বা বিষয়ভিত্তিক কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ আশ্চর্য ও সৃজনশীলতাকে সামনে এনেছেন গভীর গর্ববোধের সঙ্গে। এই ধরনের কবিতায় আধুনিক রীতির ছন্দ ও শব্দপদবিন্যাসের ভাঙুর করে ফরেনজ আহমদ ফরেনজের কারাগারে বসে লেখা 'মুলাকাত' বা 'সাক্ষাৎ'কে কয়েক শতাংশের উদ্ কাবোর প্রবন্ধে এ নির্দিষ্ট দিক্যাত্মক মাত্রা এতটাই স্পষ্ট হয়ে চিহ্নিত করেছেন তিনি।

প্রেম ও বিরহের যন্ত্রণার আচ্ছন্ন বিশ্বপ্রকৃতির আবহে প্রগতিবাদের আশার সূচনিস্থিত পথবিন্যাস দেখেছেন তিনি এই কবিতাটিতে। প্রগতিবাদী কবিরা যে তাঁদের সংগ্রামী গণকাব্যকে কত গভীরভাবে মানবিক অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত করেছেন তার দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন মঞ্চদ্বয় মহীউদ্দীনের মতো দুর্দান্ত গণকবি ও গণসঙ্গীতকারের লেখাগুলি থেকে নির্বিড় অনুভব-ঘন উল্লেখ দিয়ে।

সাম্ভ্রাদ জহীর পরের প্রবন্ধে প্রগতিবাদী কাব্য তথা সাহিত্যের সমবায়ী গণমুখী উচ্চকণ্ঠী ধারার সার্থক উত্তরণকে সামনে রেখেছেন সদরি জাফরীর মতো একজন পথিকৃৎ প্রগতিবাদী কবির নতুনতর কাব্যগ্রন্থ ‘আরও স্বপ্ন চাই’কে অভিনন্দিত করে। এই কাব্যগ্রন্থেই জাফরীর বাটের দশকের একটি কবিতাতে সমবায়ী কবিদের মধ্যে আড়াল আবড়াল সৃষ্টিতে আরোপ প্রকাশ করা হয়েছে। সাম্ভ্রাদ জহীর তাঁকে আশ্রয় করেছেন উচ্চকণ্ঠের সমবায়ী ধারাকে উৎসাহিত করে। এই সূত্রে তিনি জাফরীর কাব্যের বলিষ্ঠ গণমুখী বৈশ্ববিকতার প্রশংসা করেছেন দুটি মন্তব্যের মধ্য দিয়ে। প্রথমত তিনি লিখেছেন, “জাফরী কবিতা লেখা শুরু করোছিলেন ইকবাল ও জোশের ধারায়। এটাই বর্তমান শতাব্দীর বিশ ও তিরিশের দশকের প্রধান ধারা উদ্‌কাব্যে। তবে তিরিশের দশকেই এবং তারপরে যখন উপমহাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সমাজতন্ত্রের আদর্শ নিয়ে এগিয়ে এলো, তখন তাতে মজদুর, কৃষক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের সংহতি উদ্‌কাব্যে বামপন্থী ধারার প্রবর্তন করলো। জাফরী এই কাব্যধারার প্রধান বাহক।” জাফরীর ঘোষণাপন্থী কাব্য সম্পর্কে সাম্ভ্রাদ জহীরের দ্বিতীয় মন্তব্যটিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি জাফরীর কাব্যকৃতিকে সোচ্চারিত বিশ্ববিপ্লবী শিল্পীদের আঁকা সুবহু প্রাচীর-চিহ্নাবলীর সঙ্গে তুলনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।

আধুনিক কবিদের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকেও সাম্ভ্রাদ জহীর নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন নি। ‘ওহীদ আখতারের কাব্যকৃতি’ প্রবন্ধটি এর প্রমাণ। ‘ওহীদ আখতারের ‘পাখরের গান’ কবিতার বইটির আন্তঃবাদী ব্যক্তিক কৌতুক ব্যাপারটাকে উড়িয়ে না দিয়ে বুকতে চেষ্টা করেছেন তিনি। জাভা ও গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে ওহীদ আখতারের দিকারকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। এই সঙ্গেই অবশ্য সাম্ভ্রাদ জহীর স্বভাবসিদ্ধভাবে প্রগতিবাদীদের সম্পর্কে ওহীদ আখতারের মনগড়া সহনশীলতার অভাবের অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করেছেন।

লড়াই করার শপথ নেবার উপযুক্ত স্থানই নিখারিত হয়েছিল। একথা খুব অল্প কথাতেই সাক্ষাদ জহীর বৃত্তিকে দিয়েছেন।

সাক্ষাদ জহীরের কলমে মাঠ পৃষ্ঠার এই প্রবন্ধটিতেই আরেকটি ছবি বেরিয়ে এসেছে। তিরিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে স্পেনে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশের যে লেখক-লেখিকারা আগ্রাসী ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে ৬৫ সালের এই আন্তর্জাতিক লেখক-লেখিকা সম্মেলনে সাক্ষাদ জহীরের দেখা সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁর প্রবন্ধটিতে খানিকটা জায়গা করে নিয়ে স্পেনের প্রতিরোধ যুদ্ধে যোগদানকারী জার্মান কমিউনিষ্ট বুদ্ধিজীবী আলেকজান্ডার আবুশের (Alexander Abusch) জীবনীচিত্র তুলে ধরেছেন। আবুশ স্পেনে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পতনের পরে মেক্সিকোতে আরও অনেকের মতো আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে তখন অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন উপন্যাস-রচয়িত্রী আনা সেবেস ও বার্টোল্ড ব্রেখট।

‘শিল্পীর সৃষ্টির স্বাধীনতা’ প্রবন্ধের নামের নীচেই বন্ধনীর মধ্যে আরও কয়েকটি কথা বসানো আছে। এরা হ’ল, ‘সংস্কৃতির প্রাচ্যে ভোগলিয়ার্ন্তর বক্তব্য। ১৯৬৪’র আগস্টে ইতালির কমিউনিষ্ট নেতা পানিখেরো ভোগলিয়ার্ন্তর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি বিশ্বের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের উপর একটি স্মারকপত্র রচনা করেছিলেন। ইতালীর কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নেতার মৃত্যুর পরেই এই পত্রটি প্রকাশ করেন। এই স্মারকপত্রে ভোগলিয়ার্ন্তর কমিউনিষ্টদের সাধারণ করণীয়গুলি সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য রাখেন। সাক্ষাদ জহীর তাঁর প্রবন্ধে এই পটভূমির কথা বলে নিয়ে পুরোপুরি ভোগলিয়ার্ন্তর বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন এবং নিজের ভাষায় এই বক্তব্যটি বৃত্তিকে বলেছেন ভোগলিয়ার্ন্তকে ইতালির কমিউনিষ্ট পার্টির পথপ্রদর্শক ও মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক আখ্যা দিয়ে।

ভোগলিয়ার্ন্তর বক্তব্যের দুটি ভাগ। প্রথমে তিনি দেখিয়েছেন যে, পুঞ্জিবাদী ব্যবস্থা লেখক-লেখিকাদের স্বাধীনতা হরণ করে। এই ব্যবস্থা তার শোষণ ও শাসনের এবং পারমাণবিক অস্ত্রের যুদ্ধ বাধাবার আরোজনের প্রবক্তারূপে লেখক-লেখিকাদের ব্যবহার করতে চায়। পুঞ্জিবাদী ব্যবস্থার তাগিদ হচ্ছে লেখক-লেখিকারা সমস্ত রকমের অমানবিকতা ও অশুকারের শক্তির জয়গান করবেন। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার তাগিদ সম্পূর্ণ বিপরীত। পুঞ্জিবাদী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা সমাজের উপর যে দুঃস্বপ্ন চাপিয়ে আসছে

এবং বিশ্বকে যে যুদ্ধের কিনারে নিয়ে দাঁড় করানো, সমাজতন্ত্রের প্রকাশ হচ্ছে সেই দুঃখকষ্ট ও যুদ্ধের বিভীষিকাকে অপসারিত করা। সমাজতন্ত্র লেখক-লেখিকাদের কাছে চায়, তারা মানবিক স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও প্রীতির পক্ষ নেন। সমাজতন্ত্রের তাগিদ হচ্ছে, লেখক-লেখিকারা বিশ্বশান্তির পক্ষাবলম্বী হিসাবে সমস্ত জাতির ও ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রবক্তা হয়ে জনগণের সেই সমস্ত প্রয়াসের সঙ্গে থাকবেন, যেগুলি মনুষ্যের মর্যাদা, মনুষ্যের অধিকার, সুবিচার ও সত্য প্রতিষ্ঠার নিয়োগিত।

এক কথায় ভোগলিয়ারতির ভাষায় পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা হচ্ছে, চিন্তার স্বাধীনতাকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা। অপরদিকে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা শিল্পকলা ও সাহিত্যের জন্য চায় উন্মুক্ত কাজের সম্ভব।

ভোগলিয়ারতির বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশটি হ'ল, কমিউনিষ্টদের এবং বিশেষ করে কমিউনিষ্ট শিল্পী-সাহিত্যিকদের স্বজনশীল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পতাকা-বাহী হতে হবে। এখানে তাঁদের দেখতে হবে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে শৈল্পিক সৃষ্টির কাজে মতামতের পার্থক্যের জন্য কোন শিল্পী-সাহিত্যিককে যেন সমাজতন্ত্রের বিরোধী বা শত্রু বলে ভাবা না হয়। আসল কথা হচ্ছে, দেখতে হবে, আন্তরিকতা আছে কিনা। সুতরাং শিল্পসাহিত্যে কোন বিশেষ গোষ্ঠীর ইজারাঘারি চলতে পারে না। খোলাখুলি বিতর্কের ব্যবস্থা থাকবে এবং তার মধ্যে দিয়েই যদি কেউ অসৎ থাকে তবে তার মূখোশ খুলে দেওয়া হবে।

ভোগলিয়ারতির সর্বশেষ বক্তব্য হ'ল, “যেসব দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে আমরা বড়রকমের সাহায্যই প্রত্যাশা করি। এটা সবসময়ে আমরা পাই নি।”

এরপরে ‘কবিতা ও সঙ্গীত’ প্রবন্ধটিতে সাহিত্যের নির্মিতের ক্ষেত্রে কবিতা ও সঙ্গীতের মেলবন্ধনের প্রসঙ্গটিকে বিচার করা হয়েছে। এতে আধুনিক ও রূপসী কবিদের কাজের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, কবিতাকে গানে রূপান্তরিত করার কিংবা গান গাওয়ার উপযুক্ত করে কবিতা বা গজল রচনা করার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সাহিত্য সৃষ্টিতে। সমাজে ও ব্যক্তি-জীবনে এদের মেলবন্ধনের চাহিদা রয়েছে। কিন্তু কাব্য-সাহিত্যের নির্মিতের দিকে অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে। বাজনা অথবা নানারকম আনুষ্ঠানিক সঙ্গত যেখানে কাব্যের কথাকে চাপা দিয়ে দেয়, সেখানে সমস্ত নির্মিতটাই পণ্ড হয়ে যায়। সাম্রাজ্য জহীর একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কোন একটি কবিতা পাঠের

গাওলা হাঁজুল যে, কবির বাণী একেবারেই চাপা পড়ে গিয়েছিল। সাম্রাজ্য জহীর সুরের বিরোধিতা করেন নি, কিন্তু সাহিত্যের তথা কবিতার এবং এমনকি গজলেরও কথা গোণ না হয়ে যায়, সেজনা তিনি তাগিদ দিয়েছেন। কারণ, তাঁর নত্রে, কাব্য তথা সাহিত্যের গঠনের বুনিনাদ হচ্ছে কথা।

সাম্রাজ্য জহীরের প্রকৃধাবলীতে আমরা যে ভক্তুর বিভাগটি করে নিরেছি, তার সব শেষের লেখার নাম 'শৈল্পিক সৃষ্টির অনুধাবন ও রূপায়ণ।' এই নামের নীচেও কয়েকটি কথা জুড়ে দেওয়া রয়েছে বন্ধনীর মধ্যে। এরা হলো, 'সাহিত্যের প্রগ্রে হুকুম চলতে পারে না।'

১৯৬৪ সালে রচিত এই প্রবন্ধটিতে মূলত সোভিয়েত নন্দনতাত্ত্বিক রোমিয়ান ত্সেভের তখন সদাপ্রকাশিত একটি গ্রন্থের সারমর্মকে সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে। এই গ্রন্থে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের মূলধারাকে সামনে রেখে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যে বা শিল্পকলায় আমলতান্ত্রিক হুকুম জারীর কোন স্থান থাকতে পারে না। কারণ, এটা হচ্ছে কমিউনিষ্ট তথা সমাজতান্ত্রিক তথা মার্কসীয় শিল্পসাহিত্য নীতির বিরুদ্ধাচরণ করা। লেনিন শূরু থেকেই এই বিষয়টিকে ব্যর্থহীনভাবে উপস্থিত করেছিলেন। জনগণের সঙ্গে একাত্মতাই হচ্ছে সাহিত্য ও শিল্পকলার সৃষ্টির মৌলিক অনুধাবন ও রূপায়ণের গোড়ার কথা।

সাম্রাজ্য জহীর রোমিয়ান ত্সেভের এই বক্তব্যটিকে মোটামুটি তিন ভাগে উপস্থিত করেছেন।

প্রথম ভাগটি হ'ল উদ্দেশ্য-সম্পর্কিত। জনগণের সঙ্গে একাত্মতার সম্পর্কের মাধ্যমে সাহিত্য কি করতে চায়? সাহিত্য চায় সত্যসন্ধানতা ও গভীর দৃষ্টির সাহায্যে জনগণের জীবনকে অনুধাবন করে তার চিত্রাবলীকে তাদের সমস্ত রকমের জটিলতা, মৌলিকত্ব ও বৈচিত্র্যময়তার সঙ্গে উপস্থিত করা। এই গ্রন্থের সৃষ্টিতে বোধ সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রয়াসকে এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনযাপনের ধারাকে উন্নততর ও গভীর সচেতনতার সমৃদ্ধ করা হয়। এইভাবেই সমাজ ও ব্যক্তিজীবনকে কমিউনিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ও মানস-ভেদ অনুসারে পরিবর্তিত ও প্রসারিত করার ইচ্ছাকে উৎসারিত করা যেতে পারে।

রোমিয়ান ত্সেভের বক্তব্যের দ্বিতীয় ভাগটি অনুধাবন ও সৃষ্টি সম্পর্কিত। সাহিত্য ও শিল্পরূপসৃষ্টির অনুধাবন হচ্ছে প্রকৃতিপন্থক এমনসব নতুন নতুন সম্ভাবনাকে খুঁজে বার করা যোগ্যলব্ধক এখনও উদ্ঘাটিত করা

হয় নি। সৃষ্টি হচ্ছে নতুনতর সম্ভাব্যকে নতুনতর রূপে উপস্থিত করা। এই সৃষ্টি হচ্ছে মানুষের উন্নত থেকে উন্নততর মানসিক ও আত্মিক আরোহণের অভিব্যক্তিস্বরূপ। সাহিত্য সৃষ্টির এই প্রতিনিয়ত ও অন্ত্যস্ত সন্ধানে ব্যাপারে আমলাতান্ত্রিকতার কোন দিক দিয়েই সঙ্গতি থাকতে পারে না। এখানে হুকুম বা হুকুমনিবশীল কোন অবকাশ নেই।

তৃতীয় ভাগটি সোভিয়েত ইউনিয়নের জীবনযাপনের বিন্যাসে কর্মউনিষ্ঠ পাটি'র সর্বোচ্চ সংস্থা পাটি-কংগ্রেসের ধারাবাহিক বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত রোমিয়ানভাসেডের বইটিতে এই সময়কালের পূর্বাহ্নের দুটি পাটি-কংগ্রেসে তথা বিংশতি ও বাবিশংখ্যাতম কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, জনগণকে এটা-ওটা করার জন্য বলা নয়, প্রয়োজন হচ্ছে জনগণের সূচনতার প্রসারে সহায়তা করা। সাহিত্যের বড় রকমের ভূমিকা রয়েছে এই করণীয় সম্পাদনে।

(৫)

এবার আমরা সাম্রাজ্য জহীরের প্রবন্ধাবলীর তৃতীয় অংশের চারটি প্রবন্ধের সামর্যম্ একের পর এক উপস্থিত করছি। উদ্ কাব্যে ও সাহিত্যের ধারায় যে প্রগতিবাদী ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, প্রধানত তাকে ভিত্তি করেই 'গালিল', 'হালি' এবং 'উদ্ কাব্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ' প্রবন্ধ তিনটি লেখা। আরেকটি প্রবন্ধ 'আমীর খসরু দহলবী সম্পর্কে', যার কাব্যের কাজ ফাসী ও হিন্দীতে হলেও উদ্ কাব্যসাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সাম্রাজ্য জহীর অবশ্য যেকোন মাতৃভাষার সাহিত্য ও লিপিকলার ঐতিহ্য সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করেই তাঁর বিশ্লেষণ দাখিল করেছেন। ঐতিহ্যিক সম্পদের সঙ্গে প্রগতির যোগসূত্র কোথায় কিভাবে সেটি এতে পাওয়া যাবে।

সাম্রাজ্য জহীর গালিলের তিনটি প্রগতিবাদী বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন।

এই বৈশিষ্ট্য তিনটির দুটিকে তিনি বিচার করেছেন গালিলের ফাসী ভাষায় লেখা কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। উদ্'তে তর্জমাও করে দিয়েছেন।

গালিলের প্রথম বৈশিষ্ট্য, তিনি 'মাটির পরত দিয়ে আবৃত মানুষকে' সবার উপরে স্থান দিয়ে বলেছেন, জীবনের সমস্ত কলরোল ও প্রতাপের উৎস হচ্ছে এই মানুষ।

গালিলের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, তিনি তাঁর সমসাময়িক সামন্ততান্ত্রিক জীবন-যাপনের ব্যবস্থাকে অচলারজন বলে ঘনে করতেন। তিনি এর মধ্য থেকে

বেরিয়ে আসার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। গালিব তাঁর কবিতার দুটি ছন্দে লিখেছেন যে, তিনি সেই সব লোককেই ঈর্ষার চোখে দেখেন যারা দুর্গম ও প্রস্তরাকর্ণ গিরি-কাঙ্কারে খাদ্যপানীয় ছাড়াই অভিব্যাপী। যারা প্রাসাদে নিশিচেষ্টে সুখে শান্তিতে আত্মপ্রসাদ নিয়ে জীবনযাপন করে, তাদের প্রতি তাঁর বিদ্‌যাত্র ঈর্ষা নেই।

সাম্রাজ্য জহীর গালিবের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যকে দাখিল করেছেন গালিব একাটি উদ্‌ভূতে লেখা চিঠির উল্লেখ করে। এই বৈশিষ্ট্য হ'ল, নিঃস্ব ও রিক্তদের প্রতি তাঁর সমবেদনাবোধ। গালিব তাঁর চিঠিখানিতে লিখেছেন যে, তিনি দারিদ্র্যের ব্যাপারটাকেই বরদাশ্ব করতে রাজী নন, অথচ তাঁকেই শেষ পর্যন্ত ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দরজায় দরজায় ঘুরতে হচ্ছে। তাঁর কামনা ছিল, 'সারা পৃথিবীতে হবে কি হবে না বলতে পারি না, তবে আমি যে শহরে থাকবো সেখানে যেন কেউ অন্নহীন ও বস্ত্রহীন না থাকে।'

ঐতিহাসিক বিষয়ে পরবর্তী প্রবন্ধ 'হালির কাব্যকৃতির গুরুত্বময় ভূমিকা।' এতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রখ্যাত উদ্‌ভাবী কবি আলতাফ হুসেন হালির প্রগতিবাদী বৈশিষ্ট্যের বিচার করা হয়েছে। সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাবার পরে সারা উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্ব অধিষ্ঠিত হবার পরে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে আশা ও সম্ভাব্যতার উদ্‌বুদ্ধ ও সচেতন করার জন্য নানাভাবে বুদ্ধিজীবীদের তরফ থেকে যেসব চেষ্টা করা হয়, তারই একটি বিশেষ করে আত্মানুসংস্থানের দ্বারা হিসাবে হালির কাব্যকে গণ্য করা হয়েছে। জরাজীর্ণ অতীতের জড়তা ও কপনশঙ্কতা কাটিয়ে উপস্থিত বর্তমানের মুখোমুখি হবার জন্য হালি জোরদার তাগিদ দিয়েছিলেন উদ্‌ কাব্যকে একটা নতুন কাঠামো দিয়ে। তাঁর ইসলামের ব্যাখ্যাও ছিল গতানুগতিকতা ও সংকীর্ণতার খোলস ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার তাগিদ।

সাম্রাজ্য জহীর হালির তিনটি বৈশিষ্ট্যকে একশ' বছর পরেও সজীব করে দেখিয়েছেন।

প্রথমত, হালি উদ্‌ কাব্যে বিষয়ভিত্তিক কবিতার অন্যতম প্রবক্তা। উদাহরণ, তাঁর একটি কাব্যের বিষয় 'দেশপ্রেম'। দ্বিতীয়ত, হালি তাঁর কাব্যে খুব জোরালোভাবেই বলেছিলেন যে, শ্রমজীবীরাই মানবসমাজের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ও জীবনযাপনের উপায়-উপকরণের নির্মাতা। তৃতীয়ত, তিনি বলেছিলেন যে, ধর্ম ও বর্ণনির্বিশেষে মানবজাতি এক ও অভিন্ন।

'আমীর খসরু: পঞ্চলবীর কাব্যকৃতি' প্রবন্ধে সাম্রাজ্য জহীর দেখিয়েছেন,

সাতশ' বছর আগে মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে আমীর খসরু অভূতপূর্ব উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁর আশপাশের নরনারীকে দেখেছিলেন এবং হিন্দী কবিতার তো কথাই নেই ফাসী কবিতাতেও ভারতীয় জনজীবনের উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ ছবি এঁকেছিলেন।

সাহিত্য জহীর প্রধানত ফাসী কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে তার তরুণ্য না করে বিষয়গুলিকে সরল ভাষায় সামনে এনেছেন। সাহিত্য জহীর দেখে করেছেন যে, আমীর খসরুর হিন্দী কবিতার বিপুল সংখ্যা সত্ত্বেও তা মূলত লোকশ্রুতি হয়ে রয়েছে। আমীর খসরুর ফাসী কবিতাই সূত্রাক্ত রয়েছে এবং খোঁজ করলেই দেশের বাইরেও পাওয়া যায়। এই কারণে, তদানীন্তন ভারতের যে জীবনচিত্র আমীর খসরুর কাব্যে রয়েছে, তাকে সাহিত্য জহীর ফাসী থেকেই উদ্ধৃত করেছেন। প্রবন্ধ একটি মাত্র হিন্দী দোহা'র উল্লেখ ও উদ্ধৃতি রয়েছে। খাজা নিজামউদ্দীন আউলিয়ার সমাধির গায়ে এটি লেখা রয়েছে। আউলিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোকে আশ্রুত হয়ে আমীর খসরু এই দোহাটি লিখেছিলেন। তিনি ছিলেন আউলিয়ার প্রিয়তম শিষ্য। এই দুটি পংক্তিতে ভারতীয় মধ্যযুগীয় মানবতাবাদী কাব্যের ধারাটি প্রকাশ পেয়েছে।

সাহিত্য জহীর লিখেছেন যে, আমীর খসরু আউলিয়ার সংস্পর্শ থেকে যে সুফী দর্শনে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর উদার চিন্তায়। এই উদার মন তাকে দিয়েছিল বিপুল আত্মিক ঐচ্ছর্য। এই আত্মিকতার প্রকাশ ঘটেছিল স্মরণপেক্ষভাবে তাঁর চারপাশের জনসমাজকে গ্রহণ করার। তিনি তাঁর ফাসী কবিতায় লেখেন যে, ভারতের নারীরাই ভগতের প্রেমে স্নানরী। তিনি তাঁর এইসব কবিতাতে দিল্লী ও তার আশেপাশের দেহান্ত ও নাগরিক নির্বিশেষে সকল ধর্মের যুবাপুরুষদের বলিষ্ঠ রূপকও বড় করে দেখিয়েছেন। আমীর খসরুর ফাসী কাব্যের বিবরণগুলোর মধ্যে রয়েছে লোকলৌকিকতার প্রাচুর্য, যদিও ভাবের উচ্চতাতেও তিনি ছিলেন অতিবিশিষ্ট কবি। সাহিত্য জহীর ফাসী কাব্যে হাফিজের পাশেই আমীর খসরুর স্থান নির্দিষ্ট করেছেন। আমীর খসরু একই সঙ্গে লোককবিরও ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর ফাসী গজলের পাশেই লোকধর্মী কবিতায় রয়েছে তদানীন্তন ভারতের জনজীবন, যড়যন্ত্র, ফুলফল, 'পান', আম এবং মিহি কাপড়ের বিবরণ।

ঐতিহাসিক প্রগতির দ্বারাকে বুঝাবার জন্য সাহিত্য জহীরের চতুর্থ প্রবন্ধটি হচ্ছে 'ঈদ'- জাবার বাস ও বিদ্রোহ।'

এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, শত শত বছর ধরে উদ্‌ কাব্য বাঙ্গ-
বিদ্রুপের একটা বিশেষ ধারা গড়ে উঠেছে। যার আক্রমণের মূল লক্ষ্য সমাজ-
জীবনে সমস্ত রকমের রক্ষণশীল ও কারেমী স্বার্থবাদী এবং ধর্মের ক্ষেত্রে কপট
ধনুজাবারী ও মোড়লদের উপর কবাবাত করা।

সাম্রাজ্য জহীর উচ্ছৃঙ্খল পর উচ্ছৃঙ্খল দাখিল করে দেখিয়েছেন যে,
অষ্টাদশ-উনিশ শতকের মীর তকীমীর ও অন্যান্য কবিরা যেকোন ধর্মের কপট
ও ভণ্ড মোড়লদের উদ্দেশ্যে এমনসব প্রচণ্ড বাঙ্গবিদ্রুপ বর্ষণ করেছেন, যে
ধরনের বাঙ্গবিদ্রুপ করতে আজকের কবিরা ইচ্ছাকৃত করবেন।

এইসব বাঙ্গবিদ্রুপের মান যে কত উঁচু ছিল, ভণ্ডামি ও মোড়লির বিরুদ্ধে
আক্রমণের দ্বারা যে কত নিপুণ ছিল, সে কথা বুঝাবার জন্য প্রসঙ্গক্রমে সাম্রাজ্য
জহীর শেক্সপীরের বাঙ্গবিদ্রুপের উল্লেখ করেছেন।

অজ্ঞাত পরিচয় অভয়চরণ দাশের বিস্মৃতপ্রায় “দ্য ইণ্ডিয়ান রাইট”

বন্দিনী সেন

আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলিতে কিছু এমন মহামূল্যবান অথচ অতি দুর্প্রাপ্য বই আছে, যোগুলির অবিস্মৃতি পনমুদ্রণের ব্যবস্থা না হলে, অস্তিত্বই লুপ্ত হয়ে যাবে। এইরকমই একখানি বই “The Indian Ryot, Land Tax, Permanent Settlement and the Famine”, সংক্ষেপে “The Indian Ryot”। লেখক অভয়চরণ দাশ। এই দুর্প্রাপ্য বইখানির একটি কপি আছে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগে মিনারেভ সত্ৰের মধ্যে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে পাবনার কৃষক বিদ্রোহের (১৮৭২-৭৩) সূত্র ধরে সারা বাংলা জুড়ে জমিদার প্রজার বিরুদ্ধেই তীব্র বিরোধ ও তা থেকে উদ্ভূত সংকটের চাপে পরে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাঠামোর মধ্যেই সংশোধনের উদ্দেশ্যে সরকারের প্রস্তাবিত “রেন্ট বিল” সৃষ্টি করেছিল জনজীবনে ভুগুলা আলোড়ন। বুদ্ধিজীবীদের প্রগতিশীল অংশটি জমিদার তথা তাদের মুখপত্র ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দুর্গত রায়তের স্বপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করে সৃষ্টি করেছিলেন মণি সঙ্গ্রাম। জন্ম নিয়েছিল “রেন্ট লিটারেচার” নামে পরিচিত সমৃদ্ধ সাহিত্যসম্ভার। অভয়চরণ দাশের “দ্য ইণ্ডিয়ান রাইট” সেই রচনা-সম্ভারে একখানি মূল্যবান সংযোজন। গ্রন্থখানি সেকালের প্রখ্যাত জননেতা, রায়তের সমর্থকরূপে সুপরিচিত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গিত।

ইংরেজ শাসনের সূচনা থেকেই সারা দেশে ঘটে গিয়েছিল একের পর এক কৃষক অভ্যুত্থান। কারণ বিদেশী শাসনে তাদের স্বাধীন সবথেকে বেশী বিপ্লব হয়েছিল। কিন্তু পাবনার বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩) সেই অভ্যুত্থানের ইতিহাসে একটা নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছিল। পূর্ববর্তী স্বতন্ত্র ভাষ্যকর অভ্যুত্থানগুলির ব্যর্থতা থেকে কৃষক নেতৃবৃন্দ শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন। এই পর্বায়ে তারা সীমিত ক্ষমতাসাধনে আর্থিক সংগ্রামের এক নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন। তাৎক্ষণিকভাবে যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা

করলেন, যদিও জমিদারদের প্ররোচনার ফলস্বরূপ শাস্ত্রশ্রম্ভা ভগ্নের অল্প ঘটনাই ঘটেতে লাগল। এই পর্যায়ে আন্দোলনকারী কৃষকেরা একদিকে যেমন অ-ইন-আদালতের সুযোগটুকু সম্ভাবহারের চেষ্টা করতে লাগল ; এটা একটা লক্ষ্যণীয় নতুনত্ব, আর একদিকে তেমন প্রধানত সংগ্রামশীল গণকাষ'বলাপের মাধ্যমেই সংগ্রাম পরিচালনা করতে লাগল। অর্থাৎ কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার ক্ষীণ আভাষ লক্ষ্য করা গেল। আবার এই পর্যায়ে কৃষক সংগ্রাম শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের প্রগতিশীল অংশটির উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করল। তারা উপলব্ধি করলেন কৃষকের সমস্যা সমগ্র জাতির মরণ-বাঁচনের সমস্যা এবং সেইজন্যই এই সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। তাই তারা বিদ্রোহী কৃষকদের গভীর সহানুভূতি নিয়ে সমর্থন জানালেন, যদিও তাঁদের স্বভাবসুলভ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি। কৃষকের স্বাধের সমর্থনে তারা তাঁদের ক্রিকাভ প্রদর্শন করতে লাগলেন দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকায় এবং জনসভায় বক্তৃতামতে। রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সাম্রাজ্যবাদ তথা সামন্ততন্ত্রবিরোধী এই বিক্ষোভ তুঙ্গে উঠলো ইংরেজ সরকারের প্রস্তাবিত রেন্ট বিল প্রকাশিত হলে। প্রস্তাবিত রেন্ট বিল প্রগতিশীল শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনীতি চর্চার হাতিয়ারে পরিণত হলো। তাঁদের রাজনৈতিক সংগঠন "ইন্ডিয়ান আ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে "রেন্ট বিলের" প্রতিবাদে সংগঠিত হলো সংগ্রামরত কৃষক জনগণের বিশাল বিশাল সমাবেশ। বিরাট শক্তির উৎস, প্রচুর সম্ভাবনাময় কৃষক-শ্রমজীবী দেশের ব্যাপক অংশ ও রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এমনি করে পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি হলো। দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ধারা সবল হয়ে উঠতে লাগল। সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ইংরেজ সরকারের ভীষণ হাশ হলো। ইংরেজ সরকার একদিকে তাই "ভানিকুলার প্রেস অ্যাক্ট" (১৮৭৪) পাশ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের রাজনীতি চর্চার টুপি চেপে ধরবার চেষ্টা করলেন ; আর একদিকে কৃষক বিক্ষোভ সামাল দিতে "গরীবের মা-বাপ" সাজবার চেষ্টা করলেন, রেন্ট বিল (১৮৭৯)-এ তাদের ছোট একটা অংশকে কিছু কিছু সুবিধা দিয়ে তোলাজ করে দলে টানবার চেষ্টা করলেন। এই ঐতিহাসিক পটভূমিতে এই আগস্ট ১৮৮১ অভ্যুত্থানের "দ্য ইন্ডিয়ান রায়তের" প্রকাশ।

গ্রন্থের মূলবস্তুে অভ্যুত্থানের লিখেছেন কন'ওয়ার্লিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা এদেশের কোটি কোটি কৃষক-শ্রমজীবীর প্রতি যে অন্যান্য-আঁচর করা

হয়েছে তাতে মর্মান্বিত হয়ে প্রতিকারের উদ্দেশ্যে ঐ ব্যবস্থার শতসহস্র কৃষক জনসমক্ষে উদ্ঘাটিত করতেই তিনি এই সংকলনখানি প্রকাশ করেছেন। পরিশেষে প্রস্তাবিত রেট বিলের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন “যতদিন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অক্ষুণ্ণ থাকবে, শত শত আইন পাশ করলেও কোনই উপকার হবে না।” তাই তিনি প্রস্তাব করেছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রোহিত করা হোক এবং রায়তকেই দেওয়া হোক জমির মালিকানা।”

কাগজ রায়তরাই হচ্ছে ভূমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী এবং জমিদার হচ্ছে কর সংগ্রহকারী মাত্র। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্বত্ববান চাষীকে তার সেই অবস্থান থেকে বহুতুতপক্ষ ভূমিদাসের পর্ষায়ে অবনমিত করেছে, অপরপক্ষে জমিদারকে কর সংগ্রহকারীর অবস্থান থেকে উন্নীত করেছে ভূস্বামীর পর্ষায়ে।^{১০} চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কৃষকগণের উদ্ঘাটন করতে গিয়ে গ্রন্থাকার শত্রু করেছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত এই মৌলিক পার্থক্যের কথা দিয়ে। অতঃপর, তিনি লিখেছেন, সরকার জমিদারকে তার রাজস্বের দাবী পূরণে জমিদারকে সক্ষম করে তুলতে আরা করলেন ‘হুপ্রম’ বিধি নামে পরিচিত ক্রোক আইন (১৭৯৯)। তারপর ১৮১২ সালে রচনা করলেন ‘পল্লম’ বিধি নামে পরিচিত আর একটি আইন, যাতে জমিদারকে কৃষকের উপর দৈহিক জুলুম করার অধিকার যোগান হলো। ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রায়তের দূর্গত যত্নের হতে পারে, তা হলো।^{১১} এ ব্যবস্থা এমানভাবেই সরকার নিজেকে জনগণের অভিভাবকের পরিবর্তে জমিদারদেরই মূখপট হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন। তাই দেখা যায় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে আবার একটু আইন প্রণয়ন করে সরকার জমিদারদের জমি পত্তনীয় দেবার অধিকারও স্বীকার করে নিলেন। এর ফলে জমি নিয়ে চলতে লাগল প্রচণ্ড ফাটকাবাগী। এমন করে জমিদারদের রাজস্বের পরিমাণ যতদূর সম্ভব টেনে বাড়িয়ে নেবার সুযোগ করে দেওয়া হলো। জমিদারদের কাছে এই ব্যবস্থা ছিল মুনোফার পর মুনোফা লুটে নেবার বন্দোবস্ত। আর এর ফলে রায়তদের জীবনে দেখা দিল স্বর্গবর্নীয় দুঃখদর্দশা।^{১২} সেইসাথে এই দেশে সৃষ্টি হলো একদল অসম, পরজীবী, ভোগসর্বস্ব অত্যাচারী জামিদার সম্প্রদায়। লেখক এদের “কন’ওয়া-লিসের অভিজাত সম্প্রদায়” নামে অভিহিত করেছেন। এরা বাংলার গ্রামজীবনে চরম অত্যাচারের স্রোত বইয়ে দিল। জমিদার কর্তৃক গ্রামে অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, বে-আইনী আটক, শূন্য-অর্থম নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়াল।^{১৩}

লেখক মনে করেন, জনগণ ছিল শিক্ষার আলোক থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। তিনি তাই জনগণের মধ্যে ব্যাপকহারে শিক্ষা বিস্তারের স্বপ্নকে তাঁর জোরালো বক্তব্য পেশ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বর্তমানে শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের কথা স্বীকার করে নিয়ে তার সম্ভব কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে সেই কারণ হলো তাদের উপযুক্ত জীবিকা অর্জনের সুযোগনা পাওয়া। জীবিকা হিসাবে যারা তাদের কৃষিকাজ অবলম্বনের উপদেশ বর্ষণ করেন, লেখক তাঁদের উদ্দেশ্য করে মন্তব্য করেছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মর্তাদিন বজায় আছে, তত্বাদিন কৃষিকাজ কোনমতেই একটি লাভদায়ক জীবিকা বলে গণ্য হতে পারবে না। কৃষিকাজ একটি লাভদায়ক জীবিকা হয়ে ওঠার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হলো, লেখক মনে করেন, এইদেশে প্রচলিত বিপুল পরিমাণ ভূমি-করের আশঙ্ক। কাজেই তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রোহিত করে ভূমিকরের পরিমাণ হ্রাস করার প্রস্তাব তুলে ধরেছেন।^১

অতঃপর গ্রন্থকার লিখছেন, ইংরেজ শাসনাধীনে যে কোন অন্যান্য-অবিচার আর আচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে দেশে ইংরেজ সরকারের আইন-আদালতের অভাব নেই এবং তার দ্বারা সকলের ভয়েই খোলা আছে কটে, কিন্তু এদেশের অভ্যচারিত রায়তরা সেখানে তাদের রক্ষা করতে পারে না, কারণ, তাদের আভিজাত্য সেই আইন-আদালত বস্তুতপক্ষে ধনীর হাতের খেলনা ছাড়া আর কিছুই নয়।^২ লেখক তাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, রায়তের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিঘ্ননই হলো যেকোন সমাজের দুঃসভা বলে গণ্য হবার অন্যতম মৌলিক শর্ত।^৩

গ্রন্থকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে দেখেছেন বিদেশী সরকারের সার্বিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থারই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে। তাই কৃষক-শ্রমজীবী জনগণের জীবনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফলগুলি উদ্ঘাটন করতে গিয়ে, সমস্ত কারণেই, তিনি পুর্লিগি নির্বাসনের প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন। পুর্লিগি, তাঁর চোখে, এক কথায়, নীলকর আর জমিদারেরই পুর্নোচিত পরায়ণ দোষের ছাড়া আর কিছুই নয়।^৪ কাজেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তাধীন বঙ্গদেশে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। বর্তমানে জমিদাররা এতদূর বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে পাবলিক জার্নালের সম্পাদককেও আবশ্যক হলে গুম করে ফেলে!^৫

জমিদারের লোভের অন্ত নেই। একটা না একটা অজুহাতে তাঁরা বে-

বে-আইনী করের পরিমাণ টাকা প্রতি চার আনা থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে আট আনা। প্রসঙ্গক্রমে লেখক মনে করেন, এই বে-আইনী কর আরোপ করাই ছিল পাবনার কৃষক বিদ্রোহের মূলে প্রধান কারণ।^{১২} বে-আইনী কর আরোপ (জামাই খতরা নামে পরিচিত) করার জন্যই ফরিদপুরের একজন জমিদার রায়তদের হাতে খুনও হয়েছেন।^{১৩} জমিদারের ক্রমাগত অত্যাচারে এমনিভাবে অজান্তে হতে হতে শেষে রায়তরাও বাধ্য হয়ে একজোট হয়, তারা প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে। ফলে তাদের উপর জমিদারের অত্যাচারের মাথা আরও বৃদ্ধি পায়।^{১৪} রায়তের ভয়ে কোনরকম প্রতিরোধের চেষ্টা হলেই জমিদারের পোষা দু’ধ’ লাঠিয়াল বাহিনী গ্রামে কাঁপিয়ে পড়ে; শত্রু হয় লুণ্ঠিতরাজ, অধিসংযোগ আর খুনজখম। জমিদার নীলকরের লাঠিয়াল বাহিনী বাংলার গ্রামজীবনে সর্বদা প্রচণ্ড সংহাস সৃষ্টি করে চলেছে। গ্রামেরই নিম্ন-শ্রেণীর মানুুষের মধ্যে থেকে এই লাঠিয়ালদের সম্ভ্রম করা হয়। তারা বর্তমানে এতই দরিদ্র ও নিরক্ষর যে পেটের দারে বাধা হলেই জমিদার-নীলকরের কাছে এই কাজ নের।^{১৫}

খাজনা বৃদ্ধির স্বপক্ষে বর্তমানে জমিদাররা অজুহাত দেখায় জমির দর আগের চেয়ে বর্তমানে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। লেখক মনে করেন, সেকথা ঠিকই; কিন্তু তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, জমির দর বৃদ্ধি হয়েছে, তাতে জমিদারের মূলধন বিনিয়োগের ফলে মোটেই নয়, বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে রায়তের শ্রমের সংযোগের ফলেই।^{১৬} প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার এই দেশে কৃষিতে অনগ্রসরতার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন; তিনি উৎসাহপ্রদ সহযোগে দেখিয়েছেন সেই অনগ্রসরতার মূলে রয়েছে এই দেশে প্রচলিত জমির একচেটিয়া কারবার (অর্থাৎ চিরস্থায়ী বংশদাত্ত) ও মাধ্যতিবিত্ত পরিমাণ খাজনা বৃদ্ধি।^{১৭}

যাহোক গত ঘাট বজ্রর শব্দে রায়তদের জীবনে বহু দুখ কষ্ট সৃষ্টিকারী পরীক্ষাকর্মের পর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং বাহাদুর কুখ্যাত সন্ত্রাস ও পক্ষম আইন রোহিত করলেন এবং জমিদারের অত্যাচারের হাত থেকে রায়তদের রক্ষা করার জন্যে দশম আইন নামে আর একটি আইন প্রণয়ন করা হলো। কিন্তু এই আইনটি পাশ হবার ফলে, লেখক দেখিয়েছেন রায়তদের অবস্থা ভাল হওয়া তো দূরের কথা, বরং তার আরও অবনতি হলো। জমিদারদের তখন ভয় হলো নতুন আইন অনুসারে জমির উপর হয়তো বা রায়তদের দখলী স্বত্ব সাব্যস্ত হবে, তাহলে তখন তাদের এখনকার মত খাজনা বৃদ্ধির সংযোগ থাকবে

না। এই আশঙ্কার বশবর্তী হয়ে আইনটি পাশ হবার সাথে সাথেই জমিদারদের মধ্যে খাজনা বাড়িয়ে নেবার ধুম পড়ে গেল। তার ফলে কোন কোন জমিদারীতে খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় নির্দিষ্ট সরকারী অংশের পরিমাণের ১০, ১৫, ৬০, এমনকি ১২০ গুন। লেখক তাই মন্তব্য করেছেন, যতদিন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অক্ষুণ্ণ থাকবে ততদিন শত শত আইন পাশ করলেও রায়তদের অবস্থার কোনই উন্নতি হবে না।^{১৮}

অতঃপর গ্রন্থকার লিখেছেন, এদিকে দেখা যাচ্ছে আমাদের সরকারবাহাদুর এইসব অপদার্থ জমিদারদের একের পর এক বড় বড় খেতাব বিলিয়ে চলেছেন; তারা মনে করেন এইভাবেই এদেরকে জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে পারবেন, আর এই “অভিজ্ঞাতরা” যতদিন তাঁদের পাশে আছে, ততদিন তাঁদের আর কোন ভয় নেই!^{১৯}

বাংলার গ্রামজীবনে এই জমিদারী অত্যাচারের সাথে আবার আছে নীলকরের অত্যাচার। লেখক দেখিয়েছেন, নীলকররা যে কৃষকদের উপর এত অত্যাচার চালাতে পারে তারও প্রধান কারণ হলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। দু’টি বিষয় এমনভাবে পরস্পরসম্পৃক্ত যে গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন, জমিদারের অত্যাচারের কথা বাদ দিয়ে নীলকরের অত্যাচারের কথা আলোচনা করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার।^{২০} এর উপর আরও আছে মহাজনদের শোষণ আর অত্যাচার। বর্তমানে জমিদারের অত্যাচারের সাথে সাথে কৃষকদের উপর সুদখোর মহাজনদের অত্যাচারের আর শেষ নেই। সামান্য সামান্য পরিমাণ ঋণের বাবদ ঋণী সুদের সর্বনিম্ন পরিমাণ শতকরা ৭৫ ভাগ। ঋণের দায়ে মহাজন কর্তৃক ক্রোক করে জমির ফসল কেটে নেওয়া, রায়তকে পিতৃ-পিতামহের ভিটা থেকে উচ্ছেদ করা বর্তমানে গ্রামজীবনের নিত্যকার ঘটনা। ইংরেজ সরকারের আইন আদালত দেগের কৃষক-গ্রামজীবী জনগণকে সুদখোর মহাজনের লোভের আগুন থেকে রক্ষা করে না। তাই তারা আইন-আদালতকে দেখে তীব্র ঘৃণার চোখে। ভারতীয় জনগণের চোখে ইংরেজ সরকারের আইন-আদালতগুলো সুদখোর মহাজনদের অবিহ্বাস্য পরিমাণ লোভ চরিতার্থ করার এক স্বর্গবিশেষ।^{২১} বর্তমানে কৃষক-গ্রামজীবী জনগণ আর করে বসামান্য। তাঁরা উপর তাদের জীবনে আসে বছরে বছরে ভরৎকর বন্য়ার তাজবের মত প্রাকৃতিক দুর্য্যাপাক, আর অন্যো অনেকাংশেই দারী সরকারের পূর্তবিভাগ।^{২২} এদিকে বর্তমানে আদালতগুলো খাজনা বৃদ্ধির মোকদ্দমায় ভরে গেছে, রুজু করা মোকদ্দমানামূলিক শতকরা পঞ্চাশ ভাগই হলো খাজনা বৃদ্ধি সত্ত্বেও।^{২৩} জন-

সাধারণ অনুভব করে তাদের উপর সরকারের অন্যান্য-অবিচারের আর অস্ত নেই। পরিস্থিতি এমনই মারাত্মক আকার ধারণ করেছে যে, গ্রন্থকার মনে করেন, এ থেকে যেকোন মনোবৃত্তি যেকোন প্রকার রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটে যাবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।^{১৬}

মেদিনীপুরে, বাঁকুড়া, বীরভূম, হাওড়া ও হুগলী জেলার জনগণের এক বৃহৎ অংশ ভূমিহীন দিন-মজুর যাদের সারা বছর কাজও জোটে না, মাসিক গড়-পরতা আর ২৫০ আনা থেকে ৩৫০ আনা, সেই আয়ে তার নিজের, তার স্ত্রীর ও তাদের তিনটি সন্তানের ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। তাদের দুঃখ-দুর্দশা বর্ণনাতীত।^{১৭}

দেশের গরীব কৃষক আর শ্রমজীবী জনগণের উপর যতরকম উপায়ে অত্যাচার করা হয়, তার মধ্যে একটি হলো লবণের উপর দার্ষ শুল্ক। গ্রন্থকার দেখিয়েছেন, লবণের মত অপরিহার্য বস্তু উপর চড়া হারে শুল্ক দার্ষ করে সরকার বাহাদুর কীভাবে দরিদ্র রাস্তাদের রক্তমোক্ষণের বাবস্থা করেছেন। এর জন্য তাদের যে বিধিত পরিমাণ মূল্য গণ্য দিতে হয়, তাতে একাইসেবেলা চলে তাদের ঐ সামান্য আয় হতে শতকরা চার টাকা হারে আরকর দিতে বাধ্য করা হয়।^{১৮}

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপরোক্ত পর্যালোচনার দ্বারা গ্রন্থকার এই বন্দোবস্তের ফলে ১৭৯০ খ্রীঃাব্দের পর থেকে রাস্তাদের অবস্থা কীভাবে ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে তা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। পরিশেষে মন্তব্য করেছেন কাজেই দেখা যাচ্ছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এমনি করেই স্বল্প সময়ের মধ্যে একদল ফাটকাবাজকে বিপুল পরিমাণ অর্থ রোজগার করে নেবার সুযোগ করে দিয়েছে।^{১৯} কাজেই আইন-আদালতের সাহায্যে খাজনা বাবদ জমিদারদের যথেষ্ট আদায় করা আর কোনমতেই বন্ধ করা সম্ভব নয়। অতএব তাদের অত্যাচারের হাত থেকে কৃষকদের মুক্তি দিতে হলে, একমাত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিত করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই।^{২০}

তাছাড়া গ্রন্থকার দেখিয়েছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেশের বাণিজ্য বিভাগের পক্ষেও বিরাট অন্তরায়স্বরূপ। লোকে বাণিজ্যের পরিবর্তে জমিদারী কিনে টাকা খাটোন বেশী পছন্দ করে। কারণ সেটা অনেক বেশী লাভজনক, সেই তুলনায় বাণিজ্য করা যেমনি হীন কাজ তেমনি তাতে লাভও হয় অনেক কম। গ্রন্থকার তাই মনে করেন, বর্তমান চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত থাকবে ততদিন দেশে মূলধন সঞ্চিত হতে পারবে না কোনমতেই, তার ফলে বাণিজ্যেরও বিস্তার

ক নই সম্ভব হবে না। মূলধনের অভাবের জন্যই দেশে শতসহস্র মানুষ জীবিকা হিসেবে চাকুরী অবলম্বনে বাধ্য হয়, যদিও তা কায়ক্রেমে জীবন ধারণে সাহায্য করে মাত্র। কাজেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত থাকায়, এই দেশে ধনীদেব হাতে সঞ্চিত ধন ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগিত হয়ে, দেশের সমৃদ্ধির হেতু না হয়ে, তার বিরাট বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।^{১০০} গ্রন্থকার তাই মন্তব্য করেছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে কন'গ্রেগালিস বাংলার জমিদারদের তৈরী করতে গিয়েছিলেন ইংরেজ কুম্বামী, কিন্তু বস্তুত তারা তৈরী হয়েছে আরারল্যান্ডের জমিদার।^{১০১} এই জমিদারেরা যে কত লোভী আর নিলম্ব তার পরিচয় পাওয়া গেছে ১৮৭৬ সালের ভূমির দরজিরের সময়ে। সেই সময়েও রায়তদের কাছ থেকে জ্বরবর্ষান্ত খাজনা আদায় করে ও দরজির পীড়িতদের জন্য সাহায্যভাবে বরাদ্দ সরকারী অর্থ-জীবিলের অপব্যবহার করে তারা চরম মনুষ্যত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে।^{১০২}

কাজেই সর্বদিক বিচার করে দেখা যাচ্ছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে ইংরেজ সরকার দেশের কৃষক-শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সম্পূর্ণ অন্যায্য-অবিচার করেছেন যা তাদের পুরোপরি ধ্বংস আর বিপর্যয়ের মূখে ঠেলে দিয়েছে। এই অবস্থার প্রতিকারের কোন পথ না পেয়েই প্রবাদ প্রাচীণ শাস্ত্র নিরীহ এদেশের কৃষক-শ্রমজীবী জনগণ শেষপর্যন্ত বাধ্য হবেনই অভ্যুত্থানের পথ ধরেছে। গ্রন্থকার স্বর্ধহীন ভাষায় মন্তব্য করেছেন, আজ পর্যন্ত এদেশে যত কৃষক অভ্যুত্থান ঘটেছে সেগুলির মূলে ছিল কৃষকদের কাছ থেকে জমিদারদের অত্যাচার আর জন্ম করে অর্থ আদায় করার ঘটনা।^{১০৩} সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অভ্যুত্থানের মূলেও ছিল অস্বাভাবিক চড়া হারে খাজনা বৃদ্ধি।^{১০৪} অতঃপর লিখেছেন, শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন প্রণালীর অনুগামীরূপে চিরস্মরণীয় বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য-আলোকপ্রাপ্ত সরকারের শাসনাধীনে বসবাসকারী একটি জনগোষ্ঠীকে আজ বিদ্রোহের পথে ঠেলে দিয়েছে এমন একটি ধনীকগোষ্ঠী যারা সর্বতোভাবে অলস, আত্মসী ইন্দিরপরাধণ আত্মসম্বোধনহীন, ইংরেজ সরকারের এক কলমের আঁচড়ে যাদের অস্তিত্ব নির্মূল হয়ে যেতে পারে। জগতে এরচেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি আছে।^{১০৫}

১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পাবনার কৃষক বিদ্রোহ থেকে শুরু হয়ে সারা বাংলা-দেশজুড়ে সাতের ও আটের দশকব্যাপী যে তীব্র জমিদার-প্রজা বিদ্রোহ চলতে থাকে সেই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার লিখেছেন, বর্তমানে “জমিদার ও রায়তের বিবাদ বঙ্গদেশকে দুই বিশাল শিবিরে বিভক্ত করেছে যারা উভয়েই উভয়ের বিরুদ্ধে

ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণে উদাত। গুরুতর দাঙ্গাহামা, রক্তপাত ও হত্যাकाণ্ড, গ্রামে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ, ফসল কেটে নেওয়া ও ঐ ধরনের অত্যাচার—এসব এখন প্রাত্যহিক ঘটনা।^{১০১} উনিশ শতকের দ্বিতীয়াধারে জমিদার-প্রজা বিরোধের নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন গ্রন্থকার। তিনি মনে করেন, জনগণের এইভাবে অত্যাচারিত হবার কারণ হলো দুটি—প্রথমত অত্যধিক পরিমাণ ভূমি-কর এবং দ্বিতীয়ত সুদের অত্যধিক চড়াহার; প্রথমটির মূলে হলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর দ্বিতীয়টি হলো তারই ফল।^{১০২} পাণ্ডার কৃষক বিদ্রোহের পরবর্তী পর্যায়ের তীব্র জমিদার-প্রজা বিরোধ লক্ষ্য করে তিনি আরও মন্তব্য করেছেন মধ্যে মধ্যে রায়তারা যে মাঠ ছাড়িয়ে যাচ্ছে তারজন্য মূল্যবতঃ তারা নিজেরা দারী নয়; তারা যে হিসাবপ্রয়ী হয়ে ওঠে সে সম্পূর্ণ জমিদারদের তরফ থেকে প্রচণ্ড প্ররোচনার ফলেই। অন্যথা তারা স্বভাবতই শান্তিপ্ৰিয়। তার সাথে আইন-আদালতও তাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠায় তারা একেবারে নিস্পায় হয়ে পড়েছে। এইরকম চরম দুঃখজনক পরিস্থিতিতেই তারা বাধ্য হয় জোটেবদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ জানাতে।^{১০৩} এই অত্যাচারিত বিদ্রোহী কৃষকদের প্রতি গভীর সহানু-ভূতিসম্পন্ন লেখক তাঁর পাঠকবর্গকে একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ জানিয়েছেন, সমাজ বিধানের বিরুদ্ধে এইভাবে রুখে দাঁড়বার পূর্বে কী নিদারুণ অত্যাচারই না সহ্য করতে হয়েছে এই হতভাগ্য কৃষককুলকে।^{১০৪}

অতঃপর তিনি লিখেছেন, বর্তমানে সারা দেশে যে একটা সর্বাঙ্গিক বিদ্রোহের পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে, এই কৃষক অভ্যুত্থানগুলি তারই ইঙ্গিত বহন করছে। ভারত সরকারের পক্ষেও এটা অত্যন্ত মর্বাদাহানিকর যে এই অত্যাচার ও নিষে-জনের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করতে তাঁরা একটি ব্যবস্থাও গ্রহণ করেননি। পরবর্তে তাঁরা কেবল অগ্নিতে হুতাশুতি দেবার কাজ করে চলেছেন। তাই দেখা যাচ্ছে, বাংলার কৃষকদের এই চরম দুর্ভাগ্যের প্রতি যেন উপহাস প্রদানের জন্যই বর্তমানে বাংলা সরকার এমনসব ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করেছেন যেগুলি বস্তুতঃ তাদের হস্তপদাদি আরও দৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলিত করার এবং জমিদারদের সিস্ক আরও ভাল করে ডরে তোলার আয়োজন ছাড়া আর কিছুই নয়। শান্তিশৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা ঘটছে, জনগণের উপর দমন-পাঁড়নের বোকাও তত বেশী করে চাপান হচ্ছে। তাই গ্রন্থকারের বিস্মিত স্নেহাঙ্ক প্রশ্নঃ আমরা সামন্ত প্রধানদের আর গোষ্ঠী সর্দারদের অভ্যুত্থানের কথা শুনোচ্ছি বটে কিন্তু কোথায় লেখা আছে শান্ত কৃষককুল সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে,

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে? অতঃপর কৃষকদরদী গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন, "এইসব কিছুকে (কৃষক বিদ্রোহগুলিকে) যে যে-চোখেই দেখুক না কেন আমরা মনে করি এইগুলির মধ্যে রয়েছে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। আমরা ত্র্যাক্ষরে আছি সেই দিনের জন্য যখন কৃষকেরা আর জমিদারের ক্রীতদাস হয়ে রইবে না, যখন তারা হয়ে উঠবে—খাদ্যরসে পরিপুষ্ট, সুখী এবং সম্পূর্ণ কৃষক-ভূস্বামী।"^{১১}

পুনরায় তাঁর সতর্কবাণী উদ্ধারণ করতে গ্রন্থকার লিখেছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং ইংরেজ সরকারের আচরণে উত্থাপ্ত হয়ে ভারতীয় কৃষকেরা বর্তমানে একেবারে বিদ্রোহের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান জমিদার-প্রজা বিরোধ ও তৎজনিত কৃষক-অভ্যুত্থানগুলি বস্তুত ইংরেজ সরকারের প্রতি ভারতীয় কৃষিজীবী জনগণের গভীর বিতৃষ্ণার পরিচায়ক। পরিস্থিতি এইরকমই চলে থাকলে অদূর-ভবিষ্যতে দেশে ইতিহাসের বৃহত্তম কৃষক অভ্যুত্থানটি ঘটে যাবে।^{১২}

এই অগ্নিগর্ভ অবস্থা থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে, গ্রন্থকার প্রস্তাব রেখেছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিত করে রায়তকেই জমির মালিকানা স্বত্ব দিতে হবে। এতে জমিদারদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে বটে, কিন্তু তার দায় তাঁদের দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছিলেন এবং তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হলে, তা দিতে হবে শুধু জমিদারদেরই নয়, সেই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্বারা জমিদার নয়, যারা বছরের পর বছর ধরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত আনুপাতিক কর বাবস্থার কবলে পড়ে নিগ্ৰহীত হয়েছে।^{১৩} গ্রন্থকার তার উপরোক্ত বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রধানত Administration Reports, Parliamentary Blue Books, Official Minutes ইত্যাদির মত সরকারী দলিলপত্র, Political Economy শাস্ত্রের সমকালীন বিদগ্ধ পাণ্ডিত্যবর্গের রচনাবলী, এদেশের কৃষক ও ভূমিসম্পর্কিত প্রশ্নটি নিয়ে গভীরভাবে চর্চা করেছিলেন এমনসব পদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষদের মননশীল রচনাবলী, ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রাদি, কৃষকদরদী দেশী-বিদেশী প্রখ্যাত জননেতাদের বক্তৃতা, রচনাবলী, মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত পত্রপাঠকা, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মতপত্র ইংরেজ সরকারের সমর্থক সংবাদ ও সাময়িকপত্রাদি ও দেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত পত্রপাঠকা হতে উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি তুলে ধরে। ৬৬১ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থখানি স্বীতিস্বত গবেষণাধর্মী। নিজের রচনা সম্পর্কে গ্রন্থের মতবশেষ লেখকের বিনীত নিম্নোক্ত—

করলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, সত্যিই তিনি উক্তির মালা গেঁথে চলেছেন ; কিন্তু মননশীল পাঠক ঠিকই লক্ষ্য করবেন তাঁরই ফাঁকে ফাঁকে লেখক তাঁর নিজস্ব বক্তব্যই তুলে ধরেছেন অসাধারণ নৈপুণ্যের সাথে । বইটির পর্যালোচনা করতে গিয়ে ইংরেজ সরকারের সমর্থক সেকালের বিখ্যাত অ্যাডভোকেট ইন্ডিয়ান পত্রিকা “দ্য ইন্ডিয়ান”, যদিও স্বভাবতই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল ও কৃষক অভিযানগুলি সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গী আদৌ তার মনোপুতজনক নয়, তথাপি মন্তব্যেই স্বীকার না করে পারে নি যে : “the work is written with considerable ability, and may be fairly said to set forth exhaustively all that can be brought forward, in the way of either argument or authority, in favour of the writer's views.”^{১০} সেকালে ঈশদাস প্রজা বিরোধে প্রজার সমর্থক “ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের” মুখপত্র “দ্য বেঙ্গলী” বইটিকে একখানি “মহামূল্যবান সংকলন” বলে অভিহিত করে লিখেছে “... it places within a moderate compass a vast body of useful information collected from sources, which are in some cases unknown to the ordinary reader.”^{১১} বইটির পর্যালোচনায় সেকালের আর একখানি প্রগতিশীল দেশীয় পত্রিকা “দ্য ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন” এটিকে একজন রায়ত কতৃক রায়তদের প্রকৃত অবস্থা চিহ্নিত করার প্রয়াস বলে বর্ণনা করে, এতে বিপুল পরিমাণে মহামূল্যবান তথ্য-সম্ভার পরিবেশনের কথা উল্লেখ করেছে ।^{১২} বস্তুতপক্ষে গ্রন্থখানি রচনায় ব্যবহৃত উপাদান সমূহের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় লেখক তাঁর অভীষ্ট সাধনে উপযুক্ত উপকরণসমূহ সংগ্রহ করেছেন দীর্ঘকাল ধরে তিল তিল করে সাধনাসম অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধৈর্যসহকারে ।

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে কে এই বিস্ময় গ্রন্থকার “অন্তরঙ্গ্য দাশ”, কি তাঁর প্রকৃত পরিচয়, যিনি নিজেকে কেবলমাত্র একজন “রায়ত” বলে উল্লেখ করে, সম্বন্ধে আত্মপরিচয় এঁড়িয়ে গেছেন ? গ্রন্থে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের প্রকৃতি, বৈচিত্র্য ও বিশালতার কথা মনে রাখলে একথা মনে করা আদৌ অসংগত হবে না যে সম্ভবত তিনি ছিলেন তৎকালে সরকারের ভূমিরাজস্ব বিভাগের এমন একজন পদস্থ কর্মচারী যার সংশ্লিষ্ট বিভাগের দলিলপত্র নাড়াচাড়া করার ক্ষেত্রে সুযোগ ছিল এবং সেই সূত্রে ইংরেজ শাসনে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও দেশে কৃষকের সমস্যা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চার করতে পেরেছিলেন । কারণ বিষয়বস্তুর পর্য্য-

লোচনায় যে অসাধারণ মূন্সিয়ানার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন, বাস্তব অভিজ্ঞতা বাতীত কেবলমাত্র পটুপিগত জ্ঞানের সাহায্যে তা কখনই সম্ভব নয়।

এই মূল্যবান গ্রন্থখানি সম্পর্কে পরিশেষে বলতে হয় বুদ্ধোন্নত গণতান্ত্রিক-তার উদার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উনিশ শতকে আমাদের দেশে রামমোহন, “ইয়ং বেঙ্গল” দল রায়ভের স্বার্থের স্বপক্ষে লেখনী ধারণ করে যে ধারার সূচনা করেছিলেন, সেবেঙ্গল নাথ-অক্ষর দস্তের তত্ত্বাবধানী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-শারকানাথ বিদ্যাভূষণের সোমপ্রকাশ যে ধারাকে নিরন্তর পুষ্টি করেছিল, রমেশ দস্তের “The Peasantry of Bengal”, অক্ষর চন্দ্র সরকারের “সাধারণী”, বঙ্কিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শন” যে ধারাকে আরও পরিষ্কৃত করেছিল, অভয়চরণ দাশের “The Indian Ryot”-এ তারই পূর্ণ বিকাশ, চরম অভিব্যক্তি ঘটেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে মিরাত বড়ুয়ন্ত্র মামলায় অভিব্যক্তি এদেশের ১৮ জন কমিউনিষ্টের বিবৃতির কৃষি ও কৃষক সংক্রান্ত অংশটির রচনায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল অভয়চরণ দাশের “The Indian Ryot”। তাই বলা চলে কৃষকসমস্যা সম্পর্কে আমাদের দেশে বুদ্ধোন্নত লিবারেল চিন্তাধারা ও কমিউনিষ্ট চিন্তাধারার মাঝে একটা সেতু রচনা করেছেন “The Indian Ryot.”

নির্দেশিকা

- ১। সংসদ বাঙালী চরিত্রাভিধান—পৃঃ ২১. ২। “দ্য ইন্ডিয়ান রায়ট”—
 পৃঃ ২৪২, ৩। পৃঃ ৩-২২, ৪। পৃঃ ৩২-৪৪, ৫। পৃঃ ৪৪- ৬. ৬। পৃঃ
 ৫৭-৭২, ৭। পৃঃ ৮৫-৯২, ৮। পৃঃ ৯৩, ৯। পৃঃ ১০৪, ১০। পৃঃ ১০৫-
 ১১৮, ১১। পৃঃ ১৬০, ১২। পৃঃ ২৪২-২৫৩, ১৩। পৃঃ ২৬৭-৬৮,
 ১৪। পৃঃ ১৬০-১৬৪, ১৫। পৃঃ ১৭২, ১৬। পৃঃ ২০৮-২০৯, ১৭। পৃঃ
 ২১৪-২১৫, ১৮। পৃঃ ২৮২-৮৪, ১৯। পৃঃ ২৯৯, ২০। পৃঃ ২৯২-২৯৩,
 ২১। পৃঃ ৩২১, ৩৫৬-৩৫৭, ২২। পৃঃ ৩৪২, ২৩। পৃঃ ৩৪২,
 ২৪। পৃঃ ৩৫৮, ২৫। পৃঃ ৪১৭, ২৬। পৃঃ ৩৬০, ২৭। পৃঃ
 ৩৬৫-৬৭, ২৮। পৃঃ ৫০০, ২৯। পৃঃ ৫৩২-৩৩, ৩০। পৃঃ ৫৩২,
 ৩১। পৃঃ ৫০৪-৫০৫, ৩২। পৃঃ ৫৩২-৫৫৬, ৩৩। পৃঃ ৫৫৬,

৩৪। পৃঃ ৫৫৯-৫৬০, ৩৫। পৃঃ ৫৫৬, ৩৬। পৃঃ ৩৭। পৃঃ ৬৩২,
৩৮। পৃঃ ৫৭৮-৫৮৩, ৩৯। পৃঃ ৫৮২, ৫৮৩, ৪০। পৃঃ ৫৫৬,
৪১। পৃঃ ৬৩৪, ৪২। পৃঃ ৬৪০, ৬৫৫, ৪৩। দ্য ইংলিশম্যান,
ফেব্রুয়ারী ৪, ১৮৮২, ৪৪। দ্য বেঙ্গলী, জানুয়ারী ২৮, ১৮৮২, ৪৫।
দ্য ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন, জানুয়ারী ১২, ১৮৮২।

অভয়চরণ দাশের বংশপরিচয় ও কর্মজীবন সম্পর্কে কারুর কিছু জানা থাকলে ১০ বঙেল রোড, কলিকাতা-১৯ এই ঠিকানায় জানালে বিশেষ স্বাধিত হবে—

সম্পাদক, "মুন্সীফারন"

সমাজবাদ, গণতন্ত্র ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

১

সমাজতন্ত্রের সংহতি ও গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ,—উভয়ের সম্পর্কের গভীর
রাজনৈতিক তাৎপর্যকে বর্তমান সোভিয়েত নেতৃত্ব বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে
গিহিত করেছে। এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে সমাজতন্ত্র
ও গণতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সম্পর্কে সোভিয়েত পার্টি ও
নেতৃত্ব এতদিন সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। প্রাক-গরবাচভ-পরে প্রসঙ্গটি
একাধিকবার উত্থাপিত হয়েছে; কিন্তু বর্তমান সোভিয়েত নেতৃত্ব যে সম্পৃক্ততা,
গভীরতা ও সাহসিকতার সঙ্গে সমস্যাটির বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হয়েছে এক
কথায় তা অতিনব ও সমাজবাদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির সঙ্গে অত্যন্ত তাৎপর্য-
মণ্ডিত। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ২৩ এপ্রিল ১৯৪৫ সালে অনুষ্ঠিত
সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত গরবাচভের
ভাষণ, ১৫ অক্টোবর ১৯৪৫ সালে অনুষ্ঠিত সি. পি. এস. ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির
আরও একটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গরবাচভের রিপোর্ট, ২৭তম সি. পি. এস.
ইউ. কংগ্রেস গৃহীত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নতুন সংশোধিত কর্মসূচী ও
গরবাচভ প্রদত্ত কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট এবং ১৬ জুন ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত
সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গরবাচভের ভাষণ।

গরবাচভ নেতৃত্ব যে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন, তার পটভূমিকাটি প্রথমে
সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র
প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে দেশের সামগ্রিক প্রগতি আশানুরূপ
ভাবে না হয়ে অনেকক্ষেে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এক ধরনের আমলাতান্ত্রিক মান-
সিকতা, আনুষ্ঠানিক মনোভাব, বহু ক্ষেত্রে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি
উদাসীনতা পার্টি, প্রশাসন ও জনসাধারণের মধ্যে এক কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি
করেছে। তার পরিণতিতে দেখা যাচ্ছে যে সমাজতন্ত্রকে দ্রাব্যীভূত করার প্রক্রিয়াতে
সহচরনভাবে অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন সাধারণভাবে নিরুৎসাহী,

অনেকক্ষেত্রে উদাসীন বা বিমূৰ্খ। বিষয়গতভাবে সোভিয়েত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজতন্ত্রের সামগ্রিক অগ্রগতি যে আরও অনেক দ্রুত হওয়া উচিত ছিল, এই বিষয়ে এখন সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। স্বাভাবিকভাবেই তাই প্রায় উঠেছে যে বিষয়গত পরিমার্জিত অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের আশানুরূপ অগ্রগতি না হবার পিছনে প্রধান কারণটি হল সোভিয়েত ব্যবস্থার রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের অভাব। সমাজতন্ত্রের মূল শক্তি যে শ্রমজীবী জনসাধারণ, তাঁদের সক্রিয়তা ও সচেতনতা যদি বিকাশ-লাভের পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের সার্বিক প্রকাশ যদি না ঘটে, তবে সমাজতন্ত্রের সামগ্রিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হবে, একথা অনস্বীকার্য। পশ্চিমী উদারনৈতিক ধনতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের পার্থক্যটি এখানেই নিহিত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব ভোটদানের অধিকারটিকেই গণতন্ত্রের চরম প্রকাশ রূপে চিহ্নিত করা হয়। ভোটদানের এই তথাকথিত আইনগত অধিকারটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক চরিত্র সম্পর্কে ভোটদাতার রাজনৈতিক চেতনা দ্বারা কতটা বা অদৌ পরিচালিত হয় কিনা, সে প্রশ্নটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থেকে যায়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণের সার্বিকতার প্রশ্নটি যে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ সম্পর্কে ব্যক্তির রাজনৈতিক সচেতনতার সঙ্গে অন্তর্নিহিতভাবে জড়িত, পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে এই বিষয়টিকে অত্যন্ত কৌশলে অস্বীকার করে সমাজান্নিপেক্ষভাবে ব্যক্তির অধিকার প্রয়োগকেই গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিরূপে গণ্য করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির চেতনাকে সমাজমুখী করে তোলার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণের দায় পার্টির। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ, সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সর্বোপরি সমাজতন্ত্রকে সুসংহত করার প্রক্রিয়ার ব্যক্তির সচেতন, প্রাণবন্ত অংশগ্রহণকে ব্যক্তির মননে সজীবিত করার রাজনৈতিক দায়িত্ব নাস্ত থাকে পার্টির ওপরে। স্বাভাবিক কারণেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তথাকথিত 'স্বতঃস্ফূর্ত', পার্টি-নিরপেক্ষ গণতন্ত্রের ধারণা অপ্রযোজ্য। সোভিয়েত ইউনিয়নেও নীতিগতভাবে সমাজবাদী গণতন্ত্রে ব্যক্তির সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পার্টির গুরুত্বকে স্বীকার করা হয়েছে; কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে পার্টি বহু ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব যথোপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে গণতন্ত্রের যে সার্বিক ও সার্বিক বিকাশ সমাজতান্ত্রিক

বাবস্থায় অভিপ্রেত ছিল তা ঘটে নি। অনেক ক্ষেত্রেই পার্টির নিষ্কর্তৃত্ব গণ-
তান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে সমাজতন্ত্রের প্রতি জনগণকে বিমূঢ় বা উদাসীন
করে তুলেছে। সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির পক্ষে নেতিবাচক এই ঘটনার পিছনে
প্রশ্নাত্ত দৃষ্টি কারণকে বর্তমান সোভিয়েত নেতৃত্ব চিহ্নিত করেছেন। প্রথমতঃ
পার্টির কার্য পদ্ধতি ও পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মানসিকতার অভাব ;
দ্বিতীয়তঃ অনেক ক্ষেত্রে জনগণের সঙ্গে পার্টির প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের
অভাব পার্টি-নেতৃত্বের একাংশকে আসবৃষ্ট ও অমলা মনোভাবাপন্ন করে তুলেছে।
সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিকে হ্রাসান্বিত করতে হলে তাই প্রয়োজন হল
পার্টির সঙ্গে জনগণের এবং জনগণের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সেতু-
বন্ধনকে সুনিশ্চিত করা, অর্থাৎ, শ্রমজীবী মানুষের গণতন্ত্রকে, সমাজতন্ত্র
ও গণতন্ত্রের সম্পর্কে দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষা ও প্রসারিত করা, এবং এই প্রক্রিয়ার
নিরামক ভূমিকা পালন করতে হবে সোভিয়েত পার্টিকে। গরবাত্ত সঠিক
ভাবেই বলেছেন, এট কথাগুলো কিছুই নতুন নয় ; পার্টি, সমাজবাদ ও
গণতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই নীতিগূলি লেনিনই চিহ্নিত
করে গিয়েছিলেন। যে কথাটা ভালোে বিস্মিত হতে হয়, তা হল আজকের দিনে
তার প্রাসঙ্গিকতা আরও অনেক তীব্রভাবে আমরা অনুভব করছি।

২

এই পটভূমিকাটি স্মরণে রাখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ২৭তম
সোভিয়েত পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত সংশোধিত পার্টি কর্মসূচীতে সোভিয়েত
গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার উদ্দেশে সমাজতান্ত্রিক বিধিবাবস্থা ও জনগণের
অধিকারগুলিকে সুদৃঢ় করার প্রস্তুতিতে কেন অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা
করা হয়েছে। প্রাক-কংগ্রেসপর্বে গরবাত্ত তাই ঘোষণা করেন যে আসন্ন
পার্টি কংগ্রেসে আলোচ্য দলিলগুলি সম্পর্কে জনসাধারণের মতামতকে গ্রহণ
করার বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। প্রাক-কংগ্রেসপর্বে দলিলগুলিকে যখন
জনগণের মধ্যে আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করা হয়েছে, তখন তাঁদেরকে এটা
স্পষ্টভাবে বোঝান প্রয়োজন যে এগুলি সম্পর্কে তাঁদের মতামত, সমস্ত
রকম সমালোচনা ও প্রস্তাব সাদরে এবং বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত
হবে। পার্টি-কর্মসূচীর আলোচনার শ্রমজীবী মানুষের সক্রিয় ও সচেতন
অংশগ্রহণ লেনিনবাদী নীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই প্রক্রিয়াকে সুনিশ্চিত
করার ওপরই নির্ভর করবে পার্টি কংগ্রেসের সাফল্য। এই আলোচনা পর্বে

স্থানীয় প্রশাসনের গলদগুলিকে চিহ্নিত করতে গরবাচভ তাঁর ভাষণে জন-সাধারণের কাছে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তার তাৎপৰ্য গভীরভাবে লক্ষ্যণীয় (সি.পি.এস.ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্বাভাস অধিবেশনে গরবাচভের ভাষণ, ১৫ অক্টোবর ১৯৮৫, মিখাইল গরবাচভ, সিলেকটেড স্পীচেস এ্যান্ড আরটিকেলস, পৃ: ৪১৬)। এ কথা এখন আর অজানা নয় যে সোভিয়েত ইউনিয়নে জালিন-পর্বের এক বিশেষ সময়ে সমাজতান্ত্রিক বিবি-বাবস্থা ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি যথেষ্ট পরিমাণে খর্ব হয়েছিল এবং তার পরিণতিতে পার্টি ও প্রশাসন সম্পর্কে সমালোচনাকে অনেক ক্ষেত্রেই অমানবিক পদ্ধতিতে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির পটিকা লুমানির সঙ্গে ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ সালে প্রদত্ত একটি সাক্ষাৎকারে এই প্রসঙ্গটি উঠলে গরবাচভ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে অতীতের সেই পর্বের সম্পূর্ণ ইতি ঘটেছে সোভিয়েত ইউনিয়নে; বরং এখন যে প্রসঙ্গটিতে সোভিয়েত পার্টি সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে তা হল বোধ নেতৃত্ব, পার্টির অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের বিপুল সম্প্রসারণ, সমাজতান্ত্রিক বিবিবাবস্থা ও গণতন্ত্রের সর্বোত্তম প্রকাশকে (লুমানি পত্রিকার সঙ্গে গরবাচভের সাক্ষাৎকার, ইংরেজী সংস্করণ পৃ: ১৬)।

এই প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যাবে কেন ২৭তম কংগ্রেসে গৃহীত সংশোধিত পার্টি কর্মসূচীতে প্রশাসনের সর্বস্তরে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্থানীয় সোভিয়েতগুলির ভূমিকাকে জোরদার করার প্রসঙ্গটিকে প্রচণ্ড গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্বের চতুর্থ অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গটির অত্যন্ত বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে স্থানীয় সোভিয়েত-গুলিকে ব্যাপকতম গণতান্ত্রিক নিষ্ঠার পরিচয় দিতে হবে। নির্বাচিত ডেপুটিদের সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে এবং তাদের ওপরে যে রাষ্ট্রনৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে, তার সূক্ষ্ম ও বাস্তব রূপায়ণের জন্য নির্বাচকদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে, প্রয়োজন হলে নির্বাচকমণ্ডলী জনগণের সংশ্লিষ্ট ডেপুটিকে তাঁর কার্যকাল শেষ হবার আগেই অপসারিত করতে পারবেন। জনগণের কাছে পার্টির দায়বদ্ধতাকে সূক্ষ্ম ও সুনিশ্চিত করার জন্য কর্মসূচীতে ব্যৱেবাবেই একথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বলা হয়েছে যে জনগণকে আরও সক্রিয়ভাবে প্রশাসনের সর্বস্তরে অংশগ্রহণ করে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রয়োগ করতে হবে; এক কথায়, প্রশাসনের গণাধীনতাকে সম্প্রসারিত করে সমাজবাদী গণতন্ত্রকে ব্যাপকতম রূপ দিতে হবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই গরবাচড ২৭তম পার্টি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কর্মটির রিপোর্টে এ কথা বলেছেন যে ইদানীংকালে সোভিয়েত পার্টির কাজকর্মের মধ্যে যে প্রথতা, বহু ক্ষেত্রে দারিদ্র্যজনহীনতা, জনগণের প্রতি উদাসীনতা প্রভৃতি অব্যাহত বৈকল্য দিচ্ছে, তার অন্যতম কারণটি হল প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপরে জনগণের সক্রিয় ও সচেতন নিরক্ষণের অভাব, সোভিয়েত ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলির নৈশ্চলতা। সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা জনগণকে যে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের অধিকার প্রদান করেছে, তার ব্যাপক ও সক্রিয় প্রয়োগই একমাত্র পার্টি ও জনগণের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনকে দৃঢ়তার ভিত্তিতে সংহত করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে যেটি উল্লেখযোগ্য, সেটি হল, বর্তমান সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ এই লেনিনবাদী নীতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর যে সমাজবাদের অগ্রগতি ও তার গতিশীলতা একান্তভাবে গণতন্ত্রের ব্যাপকতম সম্প্রসারণের ওপরে নির্ভরশীল। ওপর থেকে ফতোয়া দিয়ে নয়, সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক গণসংগঠনগুলিকে (ট্রেড ইউনিয়ন, কমসোয়ল, যুব কমিউনিষ্ট লীগ, প্রভৃতি) একেবারে সর্বনিম্ন স্তরপর্যায়ের জনগণকে সৈনির্দশন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজে সক্রিয় অংশীদার করে গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে ; এক কথায়, জনগণকে উপলব্ধি করতে হবে যে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের হাতেই ন্যস্ত রয়েছে এবং তাঁদের সশ্রমিলিত শক্তির সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত ও সুনিশ্চিত করবে (সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীয় কর্মটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত গরবাচডের ভাষণ, অক্টোবর ১৫, ১৯৮৫ ; সোভিয়েত রিভিউ, ১৪ নভেম্বর ১৯৮৫, পৃঃ ১০)।

২৭তম সোভিয়েত পার্টি কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ভার্মানীর এস. ই. ডি-র একাদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণে গরবাচড খুব খোলাখুলিভাবেই বলেন যে এই প্রগ্ন অনেকে ভুলেছেন যে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার নামে সোভিয়েত পার্টি কি মাত্র ছাড়িয়ে যাচ্ছে না ? এত স্পষ্ট আত্মসমালোচনা কি কমিউনিজম বিরোধিতাকেই শেষ পর্যন্ত মদত যোগাচ্ছে না ? গরবাচড তার উত্তরে বলেছেন যে এ শিক্ষা মার্কস ও লেনিনই দিয়ে গেছেন যে একটি প্রকৃত বিপ্লবী পার্টির সাফল্য কখনই সুনিশ্চিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার নিজের কার্যকলাপ সম্পর্কে সঠিক আত্মসমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে। সোভিয়েত পার্টি এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই গোটা পার্টির কর্মপদ্ধতির পুনর্মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছে। এই প্রসঙ্গে গরবাচড খুব স্পষ্ট করেই বলেন যে

অনেক ক্ষেত্রে পার্টির স্থানীয় নেতৃবৃন্দের অসহযোগিতামূলক মনোভাব, উদাসীনতা ও আত্মত্যাগের মনোভাব জনগণের সক্রিয়ভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশীদার হবার সম্ভাবনাকে খর্ব করেছে। ২৭তম সোভিয়েত পার্টি কংগ্রেসের অন্যতম অঙ্গীকার হল এই জাতীয় প্রবণতার চিরন্তনে অবসান ঘটানো (সোভিয়েত রিভিউ, ১২ মে ১৯৮৬, পৃঃ ৯, ১১)।

০

শৃঙ্খলা প্রশাসনের ক্ষেত্রে নয়, পার্টির দৈনন্দিন কার্যপদ্ধতিতেও গণতন্ত্রের ব্যাপক সম্প্রসারণ প্রয়োজন—বর্তমান সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তথাকথিত দলীয় ঐক্য ও শৃঙ্খলার নামে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনাকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে কোনমতেই বরদাচল করা হবে না এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্য ও ব্যর্থতার জন্য পার্টি নেতৃবৃন্দের জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। পার্টির অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের প্রসারের তাৎপর্য কতখানি, তার গুরুত্বকে গুরুত্বাচল স্পষ্টভাবে প্রথম চিহ্নিত করেন সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ২০ এপ্রিল, ১৯৮৫ সালে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে। গুরুত্বাচল বলেন যে পার্টি কমিউনিস্টদের অন্যতম দায়িত্ব হবে এ বিষয়ে নজর রাখা যে পার্টির প্রাইমারী ইউনিটগুলির অধিবেশন নিয়মিতভাবে এবং আত্মসমালোচনামূলক মনোভাব নিয়ে যেন অনুষ্ঠিত হয়, বিশেষভাবে প্রয়োজন পার্টির প্রতিটি সদস্যকে তাঁর মতামত খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া, যাতে সদস্যদের পার্টির কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে প্রতিটি সমালোচনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। শৃঙ্খলাই নয়, গুরুত্বাচল এই আশা ব্যক্ত করেন যে প্রাক-কংগ্রেসপূর্বে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় প্রধানগণ পার্টি সম্মেলন ছাড়াও প্রাইমারী পার্টি ইউনিটগুলির সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন এবং আত্মসমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত হবেন।

পার্টি সম্পর্কে সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের গুরুত্বকে গুরুত্বাচল বিশেষভাবে চিহ্নিত করেন ২৭তম সি. পি. এস. ইউ. কংগ্রেসে প্রদত্ত কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে। মিখাইল গুরুত্বাচল তাঁর প্রতিবেদনে বলেন যে পার্টির সাফল্য বহু অংশে যৌথ নেতৃবৃন্দের সার্থক বিকাশের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে পার্টি সংগঠনগুলির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ইচ্ছাকৃতভাবে ডাকা হচ্ছে না বা যৌথভাবে গৃহীত অনেক সিদ্ধান্তকে বিশেষ

কোন ব্যক্তির ইচ্ছায় বাস্তবে রূপান্তরিত করা হচ্ছে না। এই ঘটনা ঘটে কিংবাঞ্জিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিতে। এই প্রসঙ্গের আলোচনার গরবাচড পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেন যে আত্মতৃপ্তির মনোভাব এবং সমালোচনাবিরোধী আত্মাওরা পার্টির সাফল্যের পথে চরম প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে বাধ্য।

গরবাচড তাঁর সমালোচনার সূত্রে বলেন যে বিভিন্ন স্থানীয় পার্টি কর্মিটিতে এমন কি খোদ পার্টি সেন্টারে এখনও এমন ধরনের মানসিকতা-সম্পন্ন নেতা আছেন যারা সমালোচনা সহ্য করতে অপারগ এবং সমালোচকদের বিভিন্ন ধরনের হুমকি প্রদান করতে সক্ষম। খোদ মস্কো শহরের পার্টি সংগঠন সম্পর্কেই গরবাচড এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে মস্কোর শ্রমজীবী জনগণের সাফল্যকে ছোট করে না দেখলেও এ কথা অস্বীকার করে কোন লাভ নেই যে মস্কো পার্টি সংগঠন বেশ কিছুকাল থেকেই আত্মসমালোচনার প্রতিবন্ধক মনোভাবের পারচর দিতে শুরু করে ও তার পরিণতিতে একদিকে যেমন কতকগুলো কৃত্রিম সাফল্য ও এক ধরনের আত্মতৃপ্তির মনোভাবকে ফাঁদে ফাঁপরে বড় করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়, অপরদিকে বাস্তবক্ষেত্রে মারাত্মক দুর্ভাগ্যবশত পারিলক্ষ্য হতে থাকে এবং যা শেষ পর্যন্ত উপেক্ষিত হয়ে গুরুতর সংকটের সৃষ্টি করে। একই ধরনের সমস্যা দেখা দেয় উজবেকিস্তানের পার্টিতে। সেখানকার পার্টি নেতৃত্ব শৃঙ্খমাত্র সাফল্যের জ্ঞানিনাদে নিজেদেরকে আশ্রিত রেখে পার্টির কর্মসূচীতে সম্পূর্ণ সমালোচনাকে ভুল করে দেবার চেষ্টা করে। এই অসংতান্দ্রিক মানসিকতার ফলে সেখানকার পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে কমিউনিস্ট মূল্যবোধ বিরোধী বিভিন্ন কোঁক, যেমন উৎকোচ গ্রহণ, সমাজতান্ত্রিক বিধবান্ধার, যথেষ্ট লংঘন, স্বজনপোষণ, প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কর্মিটির হস্তক্ষেপের মাধ্যমে উজবেকিস্তানের পার্টিতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হয়।

গরবাচড তাঁর রিপোর্টে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেন যে পার্টি নেতৃত্ব, যে কোন ভাবেই হোক না কেন, সমালোচনার উদ্দেশ্য কখনই থাকতে পারে না। এই দৃষ্টান্তের অভাব থেকেই উৎসারিত হয় সামাজতান্ত্রিক মানসিকতা, আত্মতৃপ্তিরতা ও অসহনীয়তার মনোবৃত্তি; তার পরিণতিতে হ্রাস হয় পার্টির সঙ্গে জনগণের আশ্রয়তা বন্ধন ও শেষ পর্যন্ত তা রুদ্ধ করে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিতে। এক কথায়, পার্টি নেতৃত্ব যদি গণতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলি মেনে চলার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন না হয়, তবে তা পার্টির মধ্যে সংকট সৃষ্টি করতে বাধ্য। এই

কারণেই গরবাচভ তাঁর রিপোর্টে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অঙ্গুলের পার্টির কাজকর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে (যেমন, আল্‌মা-আটা) বলেন যে, সেসব জারগার উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন একাধিক নেতাকে অপসারিত এমন কি পার্টি থেকে বহিস্কৃত করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও গণতান্ত্রিক নীতিনীতি লংঘনকারী কোন পার্টি'কর্মীকেই বরদাস্ত করা হবে না।

পার্টির সঙ্গে গণতন্ত্রের গভীর সম্পর্কের প্রমাণটি ২৭তম সি. পি. এস. ইউ. কংগ্রেস যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করে, তা পর্যালোচনা করতে গিয়ে গরবাচভ ১৬ জুন ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে বলেন যে এর ফলে একাধিকে যেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বেশ সফল পাওয়া যাচ্ছে, তেমনই এই প্রমাণটির গুরুত্বকে অনুধাবন না করার মত ঘানাসিকতাও যথেষ্ট পরিমাণেই বিদ্যমান আছে। অনেক ক্ষেত্রেই (যেমন তালশন্দ পার্টি কমিটি) স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলি জনগণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত। প্রস্থ প্রস্থ চিঠি, প্রশাসনিক নির্দেশ প্রকৃতির মাধ্যমেই পার্টি শ্রমজীবী জনগণের কাছে তার দায়িত্বকে সম্পন্ন করতে চায়। বলাবাহুল্য এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভুল ও লেনিনীয় নীতিবিরোধী। গরবাচভ এমন ঘটনার কথাও উল্লেখ করেন যেখানে দেখা গেছে যে, পার্টি নেতৃবৃন্দের আমলাতান্ত্রিক ও সমালোচনাবিরোধী মনোভাবের জন্য একজন দক্ষ, সৃষ্টিশীল শ্রমিককে পার্টি থেকে বহিস্কৃত হতে হয়েছে। সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির পক্ষে এই ধরনের মানসিকতা যে কি মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে, গরবাচভ তাঁর রিপোর্টে সে কথা একাধিকবার স্মরণ করিয়ে দেন।

উপসংহারে এ কথা বলতেই হয় যে বর্তমান সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ সমাজের সর্বস্তরে গণতন্ত্রের প্রসারের প্রমাণটিকে যে গুরুত্বের সঙ্গে চিহ্নিত করেছেন, তার তাৎপর্য সুস্বরপ্রসারী। গত কয়েক দশকে এই প্রমাণটি এত তীক্ষ্ণতা ও চিকিৎসাতার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নে আলোচিত হয় নি। যেসব পশ্চিমী সমালোচক সর্বদাই এ কথা বোকাতে চেষ্টা করেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে আর যা কিছুই থাকুক না কেন, অন্ততঃ গণতন্ত্র সেখানে নেই, তাঁদেরও আজ এ কথা বোধ হয় অস্বীকার করার উপায় নেই যে প্রায় সাত দশক আগে অক্টোবর বিপ্লব যে সমাজবান্ধব ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত করেছিল, তারই ফলশ্রুতি আজকের এই নিভীক, অকুতোভয় আত্মসমালোচনা। এই আত্মসমালোচনা সোভিয়েত গণতন্ত্র ও সমাজবাদকে নূর্বল করবে না, তাকে মর্যাদা দেবে, সুসংহত করবে।

সাবালটার্ণ ইতিহাস চিন্তায় ভারতের শ্রমিকশ্রেণী

দীপিকা বসু

ভারতের শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে সাবালটার্ণ ইতিহাসবিদদের চিন্তাব্যবহার
কিছু পরিচয় মেলে দীপেশ চক্রবর্তীর দু'টি প্রবন্ধে—

১) Conditions for Knowledge of Working Class Condi-
tions : Employers, Government and Jute Workers of Cal-
cutta 1890-1940 : Subaltern Studies, Vol II.

২) Trade Unions in a Hierarchical Culture : The Jute
Workers of Calcutta 1920-50 : Subaltern Studies, Vol III.

বাংলাদেশের চটকল শ্রমিকদের সম্পর্কে একেবারে ভিন্ন গোষ্ঠীর দু'টি
সমস্যা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে প্রবন্ধ দু'টিতে। আলোচ্য সময়-
কাল ১৯৪০-৫০-এর দশক পর্যন্ত। একেবারে ভিন্ন জাতের সমস্যার আলোচনা
হলেও দু'টি লেখার মধ্যে দিয়ে লেখকের একটি মৌলিক বক্তব্য পরিচ্ছদ হয়েছে।
লেখকের জটিল যুক্তিভাজন যথাসম্ভব পরিহার করে বোধগম্য সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা
করলে বক্তব্যটিতে এইভাবে হারিয়ে যায় যে যেহেতু এসেলে উন্নত ধনতান্ত্রিক
উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি (লেখক অবশ্য একে ব্যাখ্যা করেছেন সংস্কৃতি বা
কাল্চার (Culture) পরিমন্ডলে) তাই মার্কস বা লেনিন উন্নত ধনতান্ত্রিক উৎপা-
দন সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেসব তত্ত্ব পেশ করেছেন, ভারতের প্রাক পুঁজিবাদী সামন্ত-
তান্ত্রিক কাল্চার পরিমন্ডলে সেই তত্ত্ব অচল। তাঁর কথায়—“...How
different Capitalism in Colonial Bengal from one described
by him (Marx)...“Theirs (Calcutta Jute mill workers) was
largely a precapitalist, inegalitarian culture marked by
strong primordial loyalties of community, language, religion
Caste and kinship”

প্রথম প্রবন্ধটিতে লেখক দেখিয়েছেন যে ইংল্যান্ডের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে
শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান, তথ্য সংগ্রহ ও তা নথিভুক্ত করা—ধন-
তান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল; যে তথ্যাদির ওপর নিত্য

করেই মার্ক'স ইংল্যান্ডের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার এক বিশদ বিবরণ তুলে ধরেছেন। এদেশের চটকলগদুলিতে তা কোনভাবেই পাওয়া যায় না কারণ এদেশের ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী ও অন্যান্য আদিম আনুগত্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতির সঙ্গে বুদ্ধিজীবি সমাজের কারখানার নিয়মশৃঙ্খলা একেবারেই সামঞ্জস্যহীন।

এই একই বস্তুকে কেন্দ্র করে লেখক দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে আরও অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন। এই প্রবন্ধে লেখক মূলতঃ একটি বৈপরীত্য (paradox) তুলে ধরেছেন—বাংলাদেশের চটকলগদুলিতে এত ব্যাপক জঙ্গী আন্দোলন সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও কোন স্বাধীন, স্থিতিশীল, প্রকৃত গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে নি। আর এই বৈপরীত্যের যথাযথ কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়েই লেখক তাঁর নিজস্ব তত্ত্বটি হাজির করেছেন। তাঁর মতে এই সাম্প্রতিক দূর্বলতার দুটি কারণ : (১) শ্রমিকদের নিম্নমানের চেতনা, (২) তাদের প্রশিক্ষকদের রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব। তাঁর মতে বর্তমানে একথা স্বীকৃত যে লেনিনীয় ধারণা অনুযায়ী কিছু বুদ্ধিজীবী তাদের তত্ত্ব নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে হাজির হলেই সমস্যা মেটে না। অনেক সময়ে দেখা যায়, এইসব (কমিউনিস্ট) বুদ্ধিজীবী বা প্রশিক্ষকদের শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয় নি। তাঁর ভাষায় “the educator himself needed some education as well ...”

কাজেই দূর্বলতার কারণ আরও অনেক গভীর। তিনি দেখিয়েছেন যে এই দূর্বলতার কারণ হল এদেশের প্রাক-পুঞ্জবাদী, সামন্ততান্ত্রিক, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতির দ্বারা রাজিত সংস্কৃতির পরিমন্ডল যার মধ্যে শব্দ শ্রমিকরাই নয়, শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠকরাও, এমনকি কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতারাও ছিলেন বন্দী। তাঁর মতে এই পরিমন্ডলে লেনিনীয় ধারণা অনুযায়ী প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রাতিনিষিদ্ধমূলক ট্রেড ইউনিয়ন গঠন সম্ভব নয়। এদেশে সামরিকভাবে যেসব ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল তা ছিল ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের “জমিদারী”—নেতাদের সঙ্গে শ্রমিকদের ছিল প্রভু-ভূতোর সম্পর্ক। তিনি এই সম্পর্কে “বাবু-কুলি” সম্পর্ক বলে চিহ্নিত করেছেন। লেখকের আরও অভিযোগ হল এবং যা তাঁর কাছে আরও বিস্ময়কর ‘বৈপরীত্য’—শব্দ যে আশ্বিনী কুমার ব্যানার্জী, প্রভাবতী দাশগুপ্তা, কে. সি. রায়চৌধুরীর মত বুদ্ধিজীবি জাতীয়তাবাদী শ্রমিক সংগঠকরাই শ্রমিক আন্দোলনে এই প্রভু-ভূতোর মনোভাবের পরিচর দিয়েছেন, এই বাবু-কুলি সম্পর্কের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রেখেছেন, (যা তাদের ‘ভুল্লোলক’জনিত মানসিকতার কিছুটা স্বাভাবিক ছিল) তাই নয়, পরবর্তীকালে বামপন্থী কমিউনিস্ট সংগঠকরাও কিন্তু এই বাবু-কুলি সম্পর্কের

উদ্বেগ উঠতে সক্ষম হন নি। শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে তাদের আদর্শগত অবস্থান সত্ত্বেও, লেনিনীয় তত্ত্বে দীক্ষিত হয়েও এই কমিউনিস্ট সংগঠকরা বাস্তবক্ষেত্রে, শ্রমিক সংগঠনের কাজে এট প্রাক-পুঞ্জিবাদী সামন্ততান্ত্রিক ‘বাবু-কুলি’ সম্পর্কের খোঁজের মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছেন (যেমন, গোপেন চক্রবর্তী, আবদুল মোমিন, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত প্রভৃতি)।

লেখকের প্রশ্ন—এই বাবু-সুলভ প্রভুত্বের মনোভাব নিয়ে কোন অধিকারে তারা শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন? উত্তরে তিনি বলছেন যে লেনিনীয় তত্ত্ব অনুযায়ী উন্নত বিজ্ঞানসম্মত চেতনার দ্বারা তাঁরা নেতৃত্ব দেবার অধিকার অর্জন করেন নি; তারা শ্রমিকদের জন্য ত্যাগ স্বীকারের সুযোগ নিয়ে, এক নৈতিক অধিকারের দাবীতে নেতৃত্ব লাভ করেছেন। আর ত্যাগস্বীকার করতে সক্ষম কারা? লেখকের যুক্তি: যাদের আছে ক্ষমতা ও সম্পদ—যার সঙ্গেই যুক্ত হচ্ছে অধিপত্য ও প্রভুত্বের প্রশ্ন।

কাজেই প্রকৃত গণতান্ত্রিক, প্রতিনিধিত্বমূলক গ্রেড ইউনিয়ন গঠন করার লেনিনীয় শিক্ষার দীক্ষিত হলেও এট প্রভু-ভূতা সম্পর্কের মানসিকতার পরি-মণ্ডলে গড়ে-ওঠা বাঙালী বামপন্থী শ্রমিক সংগঠকরা যে সংগঠন গড়ে তুলে-ছিলেন তা প্রকৃত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংগঠনের পর্ষায়ে উঠতে পারে নি। আসলে তাহল সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব থেকে উদ্ভূত—অধিপত্য-আনুগত্যের সম্পর্ক ওপর প্রতিষ্ঠিত এক সংগঠন এবং এখানেই সেই সংগঠনের দুর্বলতা। একদিকে আদর্শ আর অন্যদিকে কমিউনিস্ট ‘বাবু’র মানসিকতা (culture) এই সংঘাতই হল দীপেনবাবুর কাছে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বৈপরীত্য (paradox)।

মার্কস এঙ্গেলস লেনিন দেখিয়েছেন যে পুঞ্জিবাদী সম্পর্কের ঐতিহাসিক বিবর্তনেই শ্রমিকশ্রেণী একটি ঐতিহাসিক category হিসেবে জন্ম নেয় আর শ্রম ও পুঞ্জির যে বৈরী সম্পর্ক তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণী, শ্রেণী হিসেবে আরও বিকাশ লাভ করে এবং শ্রেণীচেতনায় সমৃদ্ধ হয়। চক্র-বর্তী বক্তব্য থেকে এই সিকাত্তই আসতে হয় যে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক ভালোভাবে গড়ে না ওঠায় এবং তারই ফলশ্রুতি হিসেবে বুর্জোয়া সংস্কৃতির ভালোভাবে বিকাশ না হওয়ায় এদেশের শ্রমজীবী মানুষ প্রকৃত শ্রমিকশ্রেণী হিসেবেই আত্ম-প্রকাশ করে নি। দক্ষিণক সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারার মধ্যেই তার চেতনা সীমা-বদ্ধ রয়ে গেছে। পুঞ্জির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার যে উন্নততর চেতনার বিকাশ এবং এই শোষণ ভিত্তিক পুঞ্জিবাদী সম্পর্কের অবসান ঘটাবার কাজে, তার যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব—এই মার্কসবাদী তত্ত্ব এদেশের ক্ষেত্রে অচল।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে ইংল্যান্ডের মত ভারতে কোন শিল্প বিপ্লব সম্পন্ন হয় নি। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির শৃঙ্খলে ভারতে আধুনিক শিল্পায়নের গতি হয়েছে অত্যন্ত মন্দ্র, বিধাজড়িত। ব্রিটিশ শিল্পপতিদের স্বার্থে এদেশে ভারী শিল্পের বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। দেশীয় শিল্পকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করার ফলে যেসব আধুনিক শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছিল সেখানে শ্রমিকরা সরাসরি এসেছিল কৃষকদের গুরু থেকে, তাদের পশ্চাৎপদ, ধর্ম-বর্ণ-রাজত মানসিকতা নিয়ে। ইংল্যান্ডের মতো কৃষক থেকে কারিগর আর কারিগর থেকে আধুনিক শিল্প শ্রমিকে উত্তরণের সুযোগ তাদের ঘটে নি। তাই দীর্ঘদিন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কৃষকস্ফলভ সামন্তভাষিক মনোভাবের, হিংসা, বর্ণ, গোষ্ঠীর প্রভাবের পিছুটান রয়ে গেছে, এবং মাঝে মাঝে ধর্ম-সংক্রান্ত নানা দাবী, সাম্প্রদায়িক স্বেচ্ছাতের মধ্যে সেই মনোভাবের প্রকাশও ঘটেছে। তবুও পরিস্থিতিগত এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এদেশের শ্রমিকরা যে শ্রেণী হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে; একেবারে আদিম স্বতন্ত্রত্ব চৈতন্যের গুরু থেকে গুরু করে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তারা সে উন্নততর চৈতন্য সমৃদ্ধ হয়েছে, উনিবেশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস খোলামনে পর্যালোচনা করলে এই সত্যটি অস্বীকার করা যায় না। একটি ঐতিহাসিক category হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের যে বিশ্বজনীন নিয়ম (universal law) মার্কস এঙ্গেলস লেনিন নির্দেশ করেছেন, এদেশের শ্রমিকশ্রেণীও তার ব্যতিক্রম নয়। যদিও দেশের বিশেষ পরিস্থিতির বিশিষ্টতা তার মধ্যে অবশ্যই আছে।

বাংলাদেশের চটকল শ্রমিকদের আন্দোলনের ইতিহাসের একটি অতি সাধারণ কাঠামোর দিকে তাকালেই চৈতন্য এই বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। চটকল হুপিদের প্রায় গোড়ার যুগ থেকেই শ্রমিকরা শোষণ বণ্ডনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে নানাভাবে। প্রথমদিক তাদের প্রতিবাদ ছিল স্বতন্ত্রত্ব। পরিচিত গ্রামীণ পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কারখানার নিয়ম শৃঙ্খলার যে কঠোর শাসন, কারখানার ম্যানেজার, সুপার-ভাইজারদের অমানবিক আচরণ তাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে তারা প্রতিবাদ জানিয়েছে স্বতন্ত্রত্বভাবে, কারখানার চক্রে দাস্তা, ম্যানেজার-সুপারভাইজারদের দৈহিক পীড়নের মাধ্যমে। ক্রমে ক্রমে যখন তাদের চৈতন্য আরও উন্নত হয়েছে, তখনও শ্রমিক সম্পর্ক তারা বৃহত্তর শত্রু করেছে তখন আর শত্রু দাস্তা মারপিট নয় তারা তাদের নিজস্ব

অফিসারদের শৈবরাচারী ব্যবহারের প্রতিবাদ প্রভৃতি—সেইসব দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন সংগঠিত করেছে, এমন কি ধর্মঘট আন্দোলনেও তারা সামিল হয়েছে। উনিবিংশ শতকের শেষ দশকে তাদের এই ধর্মঘট আন্দোলন আরও সংগঠিত রূপ নিয়েছে এবং তারা আরও দীর্ঘস্থায়ী আরও ব্যাপক ধর্মঘট আন্দোলন পরিচালনা করেছে। অসংখ্য চটকলে এই পূর্বে শ্রমিকরা তাদের নানা দাবীতে (মূলতঃ অর্থনৈতিক) ধর্মঘটে সামিল হয়েছে। যেমন, বঙ্গবন্ধু চটকলের প্রায় ২০০০ শ্রমিক ধর্মঘটে (১৮৯৫-৯৬) চালিয়েছে ৬ সপ্তাহ জুড়ে, যার ফলে কর্তৃপক্ষকে প্রচুর ক্ষতিস্বীকার করতে হয়েছে। শূন্য অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া নয়, এই পূর্বে শ্রমিকদের মধ্যে সংহতি বোধও লক্ষ্য করার মতো। সংকমীদের ছাটাই বা নিষাংনের প্রতিবাদে, অন্য চটকলে ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনেও তারা কাজ বন্ধ করেছে। এক একটি ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে তারা নিজেদের ইউনিয়নও গড়ে তুলেছে যদিও এই ইউনিয়নগুলি ছিল একেবারেই সাময়িক। অবশ্য চটকলে এই ধরনের ধর্মঘট আন্দোলন হলেও তখনও তাদের আন্দোলন সম্পূর্ণ প্রণীতচেতনায় সমৃদ্ধ হয় নি। তখনও এই আন্দোলনগুলি ছিল বিক্ষিপ্ত—এক একটি কারখানায় সীমাবদ্ধ। সমস্ত শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার অবস্থা তখনও সৃষ্টি হয় নি। আর আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে মূলতঃ শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে।

এইসব ধর্মঘটের পাশপাশি ধর্মসংক্রান্ত দাবীতে, গো হত্যাকে কেন্দ্র করে বা মসজিদ নির্মাণের দাবী নিয়েও আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। কখনও কখনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বেধে গেছে। এ সবই এদেশের শ্রমিকদের অনুন্নত চেতনার স্বাক্ষরই বহন করে। কিন্তু তাই বলে এই ধর্মভিত্তিক, গোষ্ঠীকেন্দ্রিক, সাম্প্রদায়িক চেতনাই শ্রমিকদের এই স্তরে প্রধান চেতনা বলে চিহ্নিত করা ঠিক নয়। কারণ শ্রমিক আন্দোলনের ষেটুকু তথ্য সপ্তাহ করা যায় তা থেকে দেখা যায় যে তাদের নিজস্ব নানা দাবী নিয়ে অনেক বেশী ধর্মঘটে তারা পরিচালিত করেছে এবং এইসব আন্দোলনে মালিক ও সরকারের সমস্ত নিপীড়ন সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমান শ্রমিক এক সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলাদেশের চটকল শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার প্রথম প্রকাশ ঘটেছে। কল-কল্লের প্রতিবাদে যখন সারা দেশে ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে চটকলের শ্রমিকরাও সেই জাতীয় আন্দোলন ঘরোয়া ভিত্তিতে। অপরদিকে শ্রমিকদের সমাজনৈতিক চেতনার

আন্দোলন না হলেও এই আন্দোলনগুলিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব নিঃসন্দেহে কাজ করেছে। ১৬ই অক্টোবর (১৯০৬) বঙ্গ-ভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হওয়ার দিনে বিভিন্ন চটকল এলাকার শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ লক্ষ্য করা করা গেছে। ফোর্ট স্টার চটকলের শ্রমিকরা রাখী-বন্ধনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। তাছাড়া এই পর্বে প্রায় ১৮টি চটকলে শ্রমিকরা নানা দাবী নিয়ে আন্দোলন সংঘটিত করেছে। অস্থানীকুমার ব্যানাজী প্রমুখ জাতীয় আন্দোলনের নেতারা শ্রমিকদের এই অসন্তোষকে সংগঠিত রূপ দিতে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন; ১৯০৬ সালে গড়ে উঠেছে চটকল শ্রমিকদের সংগঠন—ইন্ডিয়ান মিল হ্যাণ্ডস্ ইউনিয়ন। অবশ্য শ্রমিকরা তখনও স্বাধীন শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয় নি। জাতীয় বৃক্ষোৎসবের নেতৃত্বেই তখনও তারা পরিচালিত।

এই পর্বেই আবার শ্রমিকদের নিজস্ব দাবীতে আরও সংগঠিত, ব্যাপক, বিস্তারিত এলাকা জুড়ে ধর্মঘট আন্দোলন তাদের আরও অগ্রসর চেতনারই পরিচয় দেয়। এই আন্দোলনগুলির প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এই প্রসঙ্গে রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট (১৯০৬-০৮); সরকারী ছাপাখানা শ্রমিকদের ধর্মঘট (১৯০৬-৬) ও টেলিগ্রাফ কর্মীদের ধর্মঘট (১৯০৮) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথমে বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্বে শ্রমিক আন্দোলন আরও এক নতুন স্তরে উন্নীত হয়েছে। অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্য, রুশ দেশে শ্রমিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সারা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে; এদেশের শ্রমিকরাও পিছিয়ে ছিল না। শ্রমিকরা তাদের শক্তি সম্বন্ধে আরও সচেতন হয়ে গড়ে তুলেছে তাদের নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন। ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হল নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী চেতনার প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল কমিউনিষ্ট পার্টি। এইভাবে শ্রমিকরা অগ্রগামী রাজনৈতিক চেতনায় উদ্ভূত হয়ে এই পর্বে গড়ে তুলল অসংখ্য গঙ্গী আন্দোলন। সংখ্যার দিক থেকে এবং ব্যাপকতা ও গভীরতায় এই আন্দোলনগুলি নিঃসন্দেহে ছিল আগের পর্বের চেয়ে বেশ অগ্রসর।

দীপেশ চক্রবর্তী কমিউনিষ্টদের পরিচালনায় এই বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিবাচক দিককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দেখাতে চেয়েছেন যে আন্দোলনগুলি সামন্ততান্ত্রিক, কৃষকস্বল্পভ চেতনার মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ।

প্রকৃত বিচারে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলনগুলি শ্রমিক-শ্রেণীর সামনে এক নতুন চেতনার ধার উন্মুক্ত করেছিল; আগের পর্বের বৃজোরী নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলনের তুলনায় এগুলি ছিল নিঃসন্দেহে অনেক বেশী শ্রেণী সচেতন ও উন্নতমানের।

বৃজোরী সংস্কারবাদী নেতৃত্বে পরিচালিত গ্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে পরিচালিত গ্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শ্রমিকশ্রেণীর সামনে একেবারে নতুন কিছু ধারণা এনে হাজির করেছিল যেমন—প্রথমতঃ বৃজোরী নেতাদের প্রচারিত শ্রেণী সমকোত্তার ধারণার বদলে তারা ই শ্রমিকদের কাছে শ্রম ও পুঁজির সম্পর্ক যে বৈরীমূলক সম্পর্ক এবং সেই কারণে শ্রেণীসমগ্র্য যে অনিবার্য এই ধারণাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিল। দ্বিতীয়তঃ বৃজোরী নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিকদের স্বাধীন কোন ভূমিকা স্বীকৃত হয় নি। তারা ছিল বৃজোরী আন্দোলনেরই তলপান্নবাহক। বৃজোরীদের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে শ্রমিক আন্দোলনকে তারা কাজে লাগিয়েছিল। অন্যদিকে কমিউনিষ্টরাই শ্রমিকশ্রেণীর একটি স্বাধীন ভূমিকাকে, রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীন স্বতন্ত্র অবস্থানকে গুরুত্ব দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে তার নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল। তৃতীয়তঃ বৃজোরী নেতৃত্ব যখন শ্রমিক আন্দোলনকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই ধরে রাখতে চেরেছিল তখন কমিউনিষ্টরাই প্রথম একটি সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে এই পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থা অবসানের প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং এই সমাজ বিপ্লব সম্পাদনে শ্রমিকশ্রেণীর ভূঁী কা অর্থাৎ তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তুলেছিল। সর্বোপরি কমিউনিষ্টরাই এদেশের শ্রমিক আন্দোলনের সামনে আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গীটি তুলে ধরেছিল। বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনেরই অঙ্গ যে আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলন এই সত্যটি সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীকে সচেতন করে তুলেছিল কমিউনিষ্টরাই। যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বিশাল সমাবেশ, বোম্বাই-এ ১০,০০০ শ্রমিকের একদিনের ধর্মঘট (অক্টোবরী, ১৯৩১) তাদের এই আন্তর্জাতিক চেতনার উজ্জ্বল স্বাক্ষরই বহন করে।

বিশ্বের দশকের শেষদিক থেকে গ্রিন আর্ম চর্চাশেলের দশকের অসংখ্য শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি স্বাধীন শক্তি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর এই উদ্ভব এবং নিজেদের শক্তি সম্পর্কে তাদের সচেতনতার প্রকাশ ঘটেছিল। বাংলা, বোম্বাই, কানপুর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে কেন্দ্রগুলিতে শ্রমিকেরা যে আন্দোলন

সংগঠিত করেছিল সেগুঁলি নিঃসন্দেহে বলিষ্ঠতার, ব্যাপকতার আর চেতনায় ছিল অনেক বেশী অগ্রসর।

দীপেশবাবু বাই বলুন কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলনের এই নতুন চরিত্র সম্পর্কে ইংরেজ সরকার প্রথম থেকেই ছিল খুব সজাগ। তাই নিপীড়নের খুঁড়ি নেমে এসেছিল কমিউনিস্ট কর্মীদের ওপর। অশুভেরই বিনাশ করতে তারা শূরু করেছিল কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৪)। আর ১৯২৭-২৮ সালের শ্রমিক আন্দোলনের যে উত্তাল ভরস তারই পরিপ্রেক্ষিতে তারা শূরু করেছিল ১৯২৯ সালে মীরটে ষড়যন্ত্র মামলা; অভিযুক্ত করা হয়েছিল কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতাদের। অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন গোপেন চক্রবর্তী, শিবনাথ ব্যানার্জীর মতো ট্রেড ইউনিয়ন নেতারাও যাদের “বাবু” সম্বোধিতরাই প্রতিনিধি বলে দীপেশবাবু উল্লেখ করেছেন। তাদের বরণ করে নিতে হয়েছিল দীর্ঘদিনের কারাবাস। কঠোর দমননীড়নের মধ্যেও শ্রমিক সংগঠনের কাজ তারা চালিয়ে গিয়েছিলেন স্থিরপ্রত্যয় নিয়ে।

এদেশের শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতার দিকে চোখবুজে থাকার কথা ঘোটেই বলাই না। আন্দোলনে সাংগঠনিক ও অন্যান্য দুর্বলতা অবশ্যই ছিল এবং এখনও আছে। একটি প্রকৃত শ্রেণীচেতন সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন ইচ্ছে করলেই গড়ে তোলা যায় না। স্বতন্ত্রতার স্তর থেকে ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথে, নানা সংগ্রামের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শ্রেণীচেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে তবেই শ্রমিকশ্রেণী তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের উপযোগী হয়ে ওঠে। বিষয়গত ও বিষয়ীগত, উদ্ভাবন উপাদানের ওপরই নির্ভর করে তাদের এই অগ্রগতির মাত্রা। আমাদের দেশে শিল্পায়নের অসম্পূর্ণতা, তারই ফলে শ্রমিকশ্রেণীর একটি বৃহৎ অংশের মধ্যে কৃষকসুলভ পুরনো সামন্ততান্ত্রিক চেতনার অস্তিত্ব; এদেশের জাতীয় বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ ঐতিহ্যের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর বড় অংশের ওপর জাতীয় বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব, সরকারী দমননীড়ন প্রভৃতি বহুবিধ কারণই শ্রমিকশ্রেণীর একেবারে পথে, অধিকতর সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। শ্রমিক আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে এই দুর্বলতাগুলির যথাযথ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ খুবই প্রয়োজন। শূন্যস্থান বিষয়ীগত দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমিক আন্দোলনের কয়েকজন নেতার কিছু সীমাবদ্ধতা, কিছু চুটি, দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু সংকীর্ণতা দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতাকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

এসেছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে। কাজেই শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি তাদের সমস্ত আন্তরিকতা, তাগত্বাধীকার সত্ত্বেও মধ্যবিত্তসুলভ দোদুল্যমানতা, স্বার্থাচ্ছন্দ্যতা অনেক সময়ে তাদের মধ্যে দেখা গেছে। কখনও কখনও এমনও দেখা গেছে যে বলিষ্ঠ শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার পর কোন কোন নেতা আন্দোলনের পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। আবদুল মোমিন, ইম্রাঞ্জি গুপ্ত শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে আত্মসমালোচনার ভঙ্গীতে এইসব ঘটনা-বিবৃতিগুলির উল্লেখ করেছেন। তাই বলে এইসব ঘটনাবলিগুলিকেই একমাত্র এবং সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে ধরে নেওয়া ঠিক নয়। সব বাধাবিপত্তি দমন পাঁড়ন সত্ত্বেও গোপেন চক্রবর্তী, আবদুল মোমিন, বাস্কম মুখার্জী, ইম্রাঞ্জি গুপ্তের মতো পরীক্ষিত কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতারা মার্কস লেনিনের শিক্ষার আঁচল থেকে আত্মবিন শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে নিজেদের নিযুক্ত রেখেছেন। আর সমাজতান্ত্রিক উন্নত চেতনার সমৃদ্ধ হলে আমাদের শ্রমিক আন্দোলনও যে ক্রমশঃই অগ্রসর হয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না। দীপেন বাবু যা বলতে চেয়েছেন—আমাদের দেশের শ্রমিকও যথার্থ শ্রমিক নয় আর কমিউনিস্টরাও প্রকৃত কমিউনিস্ট নয়—এই অভিযোগ যেনে নেওয়া যায় না।

অবশ্য মনে রাখা দরকার যে শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে দীপেনবাবুর এই অভিমত তাঁর নিজস্ব অসংলগ্ন কোন বক্তব্য নয়। আমাদের দেশের শ্রমিকরা যে শ্রমিকশ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে এটি হল সাবালটার্ন ইতিহাস-বিদদের একটি মূল্য বক্তব্য। সাবালটার্ন স্টাডিজের প্রথম খণ্ডের সূচনার রণজিৎ গুহ ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এই ঐতিহাসিক ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে “..... the workingclass was not still sufficiently mature in the objective condition of its social being and in its consciousness as a class for itself.....” এবং তিনি জানাচ্ছেন যে, “.... it is the study of this (historic) failure which constitutes the central problematic of the historiography of colonial India.....”

ভারতের বিশেষ পরিস্থিতির প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী সর্ব ঐতিহাসিক সত্ত্বেও পরিচালনা করেছে, ধাপে ধাপে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাদের চেতনার ক্ষর যে আরও উন্নত হয়েছে, সেই বিষয়টিকে সহানুভূতি দিয়ে কিংবা না করে সাবালটার্ন ইতিহাসবিদরা শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগতির পথের এই সীমাবদ্ধতাকে তাদের ইতিহাসনির্দিষ্ট ব্যর্থতা বলে চিহ্নিত করে একান্ত

সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত

সৌরি ঘটক

বিশ্ব রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী হস্তক্ষেপের বিষয়টি এখন মোটামুটিভাবে বিশ্বের সব দেশের মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে এসে গিয়েছে। বিশেষভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সি. আই. এর ধ্বংসাত্মক ভূমিকা এখন নানা ঘটনার নগ্নভাবে প্রকাশিত হওয়ার ফলে কোন দেশে রাষ্ট্রনেতা খুন হলে কিম্বা কোন দেশে ষড়যন্ত্রমূলক অভ্যুত্থান হলে মানুষ প্রথমেই ধারণা করে নেয় যে এর পেছনে রয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বা সি. আই. এ।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত মানুষের এই সচেতনতা রাজনৈতিক পরিপক্বতার লক্ষণ।

কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও ভাবাদর্শগত ক্ষেত্র বিশেষ করে লিঙ্গ ও সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসাত্মক কাজ সম্পর্কে মানুষ ততখানি সচেতন নয়। অথচ ভাবাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রটিই হল মূল ক্ষেত্র, যেখানে জয়ী হতে না পারলে বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করা সম্ভব হয় না বা সাময়িকভাবে জয়ী হলেও তার সাফল্যকে রক্ষা করা যায় না।

বস্তবকে সরলীকরণের জন্য এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাক : যাদ মার্কস এবং এঙ্গেলস সাম্রাজ্যবান কঠোর পরিপ্রভা করে দেনতাম্বিক শোষণের মূল স্ট্রাটি উদ্ভাবন না করতেন তাহলে রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব তার আদর্শগত ভিত্তি খুঁজে পেত কি ?

মার্কসের তত্ত্বই ছিল লেনিনের হাতে সবচেয়ে শানিত অস্ত্র যাকে বিকসিত ও প্রয়োগ করে তিনি শোষণবাদী ও সংকীর্ণতাবাদী প্রতিপক্ষদের পরাস্ত করে বিপ্লবকে বাস্তবায়িত করেন ও তাকে রক্ষা করেন।

ইতিহাসে দেখা যায় এইভাবেই সমাজ পরিবর্তনের তাত্ত্বিক ক্ষেত্রটি আগে

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র

সাধারণ মানুষের চেতনার রাজনৈতিক ওজ্জ্বল্যের চেয়েও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রটি আরও সুস্পষ্টভাবে ত্রিাশীল ও গভীরভাবে প্রভাব বিস্তারকারী। এই ক্ষেত্রটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভ্যালিন বলেছিলেন : এই ক্ষেত্রের কর্মীরা হলেন মানব মনের কারিগর ।

এই কথাকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার ভাষায় এইভাবে রূপ দিয়েছিলেন :

“গানে গানে ফুটিয়ে তুলি

প্রাণের কায়া হাসি।”

মানুষের প্রাণের কায়া ও হাসিকে শিল্পাৱিত করা যেমন জটিল ও কঠিন কাজ তেমন এর প্রভাবও গভীর ও সুদূরপ্রসারী ।

যেমন তুলনা হিসাবে বস্কমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসটি উল্লেখ করা যেতে পারে । এই উপন্যাসটি সাংপ্রদায়িক কিনা এবং কতজন এ থেকে প্রেরণা পেয়েছে সেই বিষয়ে না গিয়ে মোটামুটিভাবে এ কথা বলা চলে যে দেশের হাজার হাজার তরুণ এই আনন্দমঠের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঘর-সংসার ছেড়ে বন্দেমাতরম বলে স্বাধীনতা আন্দোলনে কাঁপিয়ে পড়েছিলেন, প্রাণ দিয়েছিলেন ।

আবার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গোর্কির ‘মাদার’ উপন্যাস বিখ্যে হাজার হাজার তরুণকে সাম্যবাদী আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করেছিলেন ।

কিন্তু এ শুধু মূল একটি উপন্যাস বা গল্প কবিতার বিষয় নয় । সমাজের এক পর্ব্বারের সংস্কৃতির ছাপ মানুষের চেতনার শতাব্দীর পর শতাব্দী ত্রিাশীল থাকে । সেজন্য সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সংস্কৃতিকে বাতিল করে সম্পূর্ণ নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলা যায় না । পুরাতন সংস্কৃতিতেই বিকশিত করে নতুন যুগের উপযোগী করে তুলতে হয় ।

রাশিয়ান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর অনেক তথাকথিত বিপ্লবী সংস্কৃতিবিদ পুরাতন সংস্কৃতিকে বাতিল করে একবারে নতুন ‘সর্ব্বদ্বারা সংস্কৃতি’ গড়ে তোলার দাবী তুলেছিলেন ।

যেমন সর্ব্বদ্বারা সংস্কৃতির একজন প্রবক্তা প্রেজনেভ ১৯২২ সালে ২৭ সেপ্টেম্বর প্রান্তদার এক প্রবন্ধে বলেছেন—“মূল লক্ষ্য হল একটি নতুন

লেনিন লেখাটার পাশে বিদ্রূপ করে লিখলেন—“হ্যাঃ”

তারপরের দিকে প্রেজনেভ যখন লিখলেন—“প্রাথমিক সংস্কৃতি গড়ার সমস্যার সমাধান হতে পারে প্রাথমিকশ্রেণীর নিজের উদ্যোগে, প্রাথমিকশ্রেণীর পণ্ডিত, শিল্পী, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির দ্বারা” তখন লেনিন তার পাশে লিখলেন “ননসেন্স !” (ডি. আই. লেনিন : অন লিটারেচার অ্যান্ড আর্ট । মস্কো । ১৯৫৭, পৃঃ ৪৯৭-৫০০ ।)

এ সম্পর্কে ১৯১৯ সালের এপ্রিলে লেনিন তার প্রবন্ধ “সোভিয়েত সরকারের সাফল্য ও অসুবিধা” প্রবন্ধে লিখেছিলেন—“কনস্ট্রাক্টিভ যে সংস্কৃতি রেখে গেছে আমরা তার সমগ্রটা গ্রহণ করব এবং তাই নিয়ে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করব। আমরা এর বিজ্ঞান, কারিগরীবিদ্যা, জ্ঞান এবং শিল্পসংস্কৃতি সবটাই গ্রহণ করব। এছাড়া আমরা সাম্যবাদী সমাজ তৈরি করতে সক্ষম হব না।” (ডি. আই. লেনিন : কালেকটেড ওয়ার্কস, সংখ্যা ৩৮, পৃঃ ৪০২)

পুত্রোভনের ওপর নতুনের বিকাশ। সংস্কৃতির উত্তরণ এইভাবেই ঘটে।

সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ

সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শত্রু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে আর ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রে সম্পর্কে উদাসীন থাকবে, তাকে বিভ্রান্ত করবে না, তাকে বিপথগামী করবে না এটা যারা ভাবে তারা হয় বোকা নয় জ্ঞানপাপী।

আজ বিশ্বে সবচেয়ে প্রগতিশীল, সবচেয়ে অগ্রসরমান, সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী আদর্শ হল সাম্যবাদ। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাষ্ট্রায়ার বিপ্লবের পর সাম্যবাদী ধ্যানধারণাকে ভিত্তি করে যে নতুন নন্দনতাত্ত্বিক জগত গড়ে উঠছে তাকে বিপথগামী করার জন্য, তার অবমূল্যায়ন ঘটাবার জন্য, ও সে সম্পর্কে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একেবারে শত্রু থেকে সব রকমের ধূসোষক কাজ-কর্ম ও প্রচার আন্দোলন শুরুর করে।

অক্টোবর বিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদীদের আতঙ্ক

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের আগে পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বন্ধুবাণী নন্দনতত্ত্ব নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি বা অপপ্রচার থাকলেও এই ক্ষেত্রটি আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের পর রাশিয়া যখন ধনতান্ত্রিক জগতের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল, পুঙ্খিল শোষণকে অবলম্বন করল, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করল এবং বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল তখনই এর ডেভর দিয়ে বিশ্বের বুর্জোয়া শ্রেণী শূন্যতে পেল তার মরনের ঘণ্টাখন্ডিন, বৃকতে পারল তাদের দিন প্রুত অন্ত্যায়মী ।

ইতিহাসের এই বিবর্তন দেখে মরিয়া ও হিংস্র বুর্জোয়া শ্রেণী শিশু সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ধ্বংসের জন্য যেমন সমস্ত হস্তক্ষেপ শুরুর করল তেমনি শুরুর করল ভাবাদর্শ ক্ষেত্রে হিংস্রতম আক্রমণ ।

ভাবাদর্শ ক্ষেত্রের মধ্যে নন্দনতাত্ত্বিক ক্ষেত্রটিকে তারা বেছে নিল বিশেষভাবে এই কারণে যে পূর্ব হ রাজনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রটির কাজকর্ম মানুষকে প্রভাবিত করে অনেক বেশি ।

নন্দনতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে আক্রমণের জন্য তারা কয়েকটি মূল সূত্র নির্ধারণ করল । এগুলি হল বিপ্লবের আগে জ্ঞানশাসিত রাশিয়ার শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা যেসব কাজ করেছেন সেগুলির নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য আছে । কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের পর, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রতন্ত্রতা হাতে নেওয়ার পর রাশিয়ার শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পীদের কাজের কোন নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য নেই ।

এ সম্পর্কে অর্থাৎ বিপ্লব-পরবর্তী রাশিয়ার নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে আমেরিকার ডজন ডজন বই প্রকাশিত হতে লাগল । আর এইসব বইয়ের নামকরণও করা হল উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ।

যেমন এ ধরনের কয়েকটি বইয়ের নাম হল :

১) Artist in uniform. A study of literature and Bureaucratism.—লেখক ম্যাক্স ইন্টম্যান । নিউইয়র্ক, ১৯০৪ ।

২) Poets on the street corners.—লেখিকা ওলগা কারলিসলে ।

৩) The Icon and the Axe—James Bellington.

৪) Voices of the Red Giants.—James W. Markhan

৫) Dictionary of Russian Literature—William Harkins

এই ধরনের আরও অসংখ্য বইয়ের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে প্রচারকরা নিজের দেশের জনগণ ও বিশ্বের পাঠকদের কাছে যে বক্তব্য উপস্থাপন করতে চেষ্টা করল তার মূল বক্তব্য হল :

—রাশিয়ার বিপ্লবের পর যেসব সাম্প্রতিক কাজ হচ্ছে তার কোন নমুন্য-
ডাটিক মূল্য নেই।

—সোভিয়েত রাশিয়ায় লেখক-শিল্পীদের কোন স্বাধীনতা নেই।

—তাদের কি লিখতে হবে সেটা ফরমারেস করে কমিউনিষ্ট পার্টি।

—বিষয়বস্তুও কমিউনিষ্ট পার্টি নির্বাচন করে দেয়।

—উপন্যাস, কবিতা, গল্প, নাটক প্রভৃতির বস্তু কি হবে সেটাও ঠিক করে
দেয় কমিউনিষ্ট পার্টি।

—আর এইসব ফরমারেসই লেখার জন্য লেখকরা মজুরী হিসাবে অর্থ
পায়।

যেমন মার্ক স্ট্রোনিম নামে একজন সোভিয়েতবিরোধী মার্কিন লেখক
লিখলেন : ১৯১৭ সালে জার সাম্রাজ্যের পতন এবং বলশেভিকদের ক্ষমতা
দখল উনবিংশ শতাব্দীর রূপ সংস্কৃতিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিল।
১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর তারিখে যে মহত্ব থেকে কমিউনিষ্ট বিপ্লব
উদ্ভূত হল তখন থেকে এই সংস্কৃতির পেছনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক
সমর্থন এবং যে বিশেষ সুবিধাভোগী জীবনযাত্রা একে বিকশিত করতে জা
কর পেতে শুরু করল। বিপ্লবের ফলাফল হল বিপ্লবীকরণ। যা কিছু
তারা ভালবাসত এবং লাভন করতে অর্থাৎ মহৎ আবেগ, ভদ্র মানবতাবাদ,
অনুতাপ, সৌন্দর্য, সূক্ষ্ম রুচিশীলতা সব কিছুই অক্ষম্য মূল্যহীন হয়ে
পড়ল। গৃহযুদ্ধ এবং সামরিক সাম্যবাদের রুদ্ধ বহুরূপীতে এসব হয়ে পড়ল
অপ্রাসঙ্গিক এবং একদল বিরোটসংখ্যক লেখক ও ঔপন্যাসিক মনে করল যে তারা
যা করতে পারে তাহল যে দেশটি অধিকারে তুলিয়ে যাচ্ছে তার জন্য একটি
শোকসভা অনুষ্ঠান করা।”

মার্ক স্ট্রোনিম তাঁর বই ‘সোভিয়েত রাশিয়ান লিটারেচার : রাইটস’ এ্যান্ড
প্রবলেমস’ বইতে লিখলেন— ‘সব’হারা সংস্কৃতিবিদরা কেন্দ্র এবং স্থানীয়
সরকারি সংস্থা থেকে বিরোট টাকা খরচাতি পায়। তাদের মদত দেয় শিক্ষা-
মন্ত্রক।”

ডেয়া আলেকজান্দ্রোভা নামে আর একজন সোভিয়েতবিরোধী যার
বই ‘এ হিস্ট্রি অফ সোভিয়েত লিটারেচার’ এ লিখলেন— ‘সব’হারা সংস্কৃতির
আদর্শগত বৈশিষ্ট্য হল পুরাতন সাম্প্রতিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।’

এই ধরনের আরও বহু বস্তু বিবিধ পুস্তকে প্রকাশিত হল, শূন্য

তাই নয় এইসব সোভিয়েত-ধরোদ্গী লেখকরা এ অভিযোগও তুললেন যে বিপ্লবের পর রাশিয়ার হাজার হাজার লেখককে হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে।

পুরোপুরি মিথ্যা, জাল, বিকৃত তথ্য দিয়ে সাজান এইসব বই প্রকাশের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ধনতান্ত্রিক জগতের পাঠকদের একথা বিশ্বাস করান যে সর্বহারা বিপ্লবের পর রুশ সংস্কৃতিকে কামিউনিস্টরা ধ্বংস করে দিয়েছে।

বাস্তব ঘটনা কি ছিল ?

কিন্তু বাস্তব ঘটনা কি তাই ছিল ? বিপ্লবের পর নতুন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র জনগণের সাম্প্রতিক মান উন্নয়নের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল ?

সোভিয়েত সরকারের বক্তব্য বা তথ্য উল্লেখ না করে অন্যান্যদের মতামত দিয়ে এই প্রশ্নটির বিচার করা যাক।

বিশ্বাত লেখক এইচ. জি. ওয়েলস ১৯২০ সালে তার সোভিয়েত সফরের পর লিখেছিলেন—‘শীত, সংঘর্ষ, দুর্ভিক্ষ’ এবং বঙ্গের ডরা এই অশুভ রাশিয়ার এখন এমন এক সাহিত্যকর্ম সম্পাদিত হচ্ছে যা আজকের ধনী ইংল্যান্ড বা ধনী আমেরিকার পক্ষে অকল্পনীয়। ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার জনগণের মানসিক খোরাক হ্রাস পাচ্ছে এবং অযোগ্য হয়ে পড়ছে। কমতায় আসান ব্যক্তিরা এ নিয়ে আদৌ চিন্তিত নন। বলশেভিক সরকার অত্যন্ত এই স্তরের একধাপ ওপরে। ‘কুদাত’ রাশিয়ার শত শত মানব বিভিন্ন বইয়ের অনুবাদের কাজ করছে। আর যে বই তারা অনুবাদ করছে তার ফলে নতুন রাশিয়া বিশ্বের এমন এক জ্ঞানের আন্বাদ পাচ্ছে যা অন্যদের নেই।’ (এই. জি. ওয়েলস : রাশিয়া ইন স্যাডোজ, পৃঃ ৪৭-৪৮)

এ সম্পর্কে আর একটি চমককার উদাহরণ হল ১৯১৯ সালে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের একটি মিশনের প্রধান উইলিয়াম বুল্টিঙের রিপোর্ট। রাশিয়া সফরের পর বুল্টিঙ মিশনের পক্ষ থেকে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে এক রিপোর্ট দেন। তাতে বলা হয়েছিল—‘আইনশুং’ বলা ভালভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, থিয়েটার ও অপেরাগুলি শাস্তিতে প্রদর্শনী করছে, রাশিয়ার সর্বপ্রান্তে হাজার হাজার স্কুল খোলা হয়েছে এবং জারগ্যাসনে ৫০ বছরে যা হয়েছিল সোভিয়েত সরকার এক বছরে শিক্ষার ক্ষেত্রে তারচেয়ে বেশি কাজ করেছে। আর্ট গ্যালারীগুলিতে যে কেউ দেখতে পাবে মহিলা ও পুরুষ প্রমজীবীদের। তাদের ছবিগুলির সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করে বোঝান হচ্ছে।’

বিপ্লবের এক বছর পরে এই হল রাশিয়ার বাস্তব চিত্র।

বিদেশে যেসব বুদ্ধিজীবী প্রচারকরা চিংকার করছিলেন যে বলশেভিকরা ক্ষমতার আসনে পর রাশিয়ার শিল্প সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে তাদের উদ্দেশ্য করে পেনিন বললেন—‘আমাদের বিপ্লবের ফলে ধ্বংসের জন্য আমাদের নিন্দা করা হয়, এই অভিযোগকারীরা কারা? বুদ্ধিজীবীদের সেই সব পা চাটোরা, যে বুদ্ধিজীবীরা চার বছর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ইউরোপের প্রায় সমগ্র সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে, এবং ইউরোপকে বর্বরতার ভরে নামিয়ে এনেছে।’ (ভি. আই. লেনিন : লেটার টু আমেরিকান ওয়ারকার্স। সংখ্যা ২৮, পৃ: ৭০-৭১)

এই তো গেল বিপ্লবের অব্যবহিত পরের অবস্থা। এ সম্পর্কে বিপ্লবের আগের যুগের সম্পর্কে তুলনা করতে গিয়ে ম্যাক্সিম গোর্কি বলেছেন—‘The period between 1907 and 1917 was one of unbridled sway of irresponsible thought, a period of complete ‘creative freedom’ for Russian writers. This freedom found expression in propaganda of all the Western bourgeoisie’s conservative ideas, which were put into circulation at the close of the eighteenth century. On the whole the years between 1907 and 1917 fully deserved the appellation of the most shameful decade in the history of Russian intellegentsia (P. 23, Maxim Gorky, address delivered to the first. All-Union Congress of Soviet Writers. August 17, 1934)

কিন্তু যেমাই বলুন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে প্রচারকরা সেই একই কোরাস গেয়ে চললেন যে বিপ্লবের পর রাশিয়ার মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি এবং রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী কোন মৌলিক লেখক সৃষ্টি করতে অক্ষম।

একজন মার্কিনী প্রচারক এরমোলায়েভ তাঁর বই ‘সোভিয়েত লিটারারি ক্রিগারিজ’-এ লিখলেন—‘একটি মৌলিক এবং শক্তিশালী সাহিত্য সৃষ্টির পরিপক্বতা রুশ শ্রমিকশ্রেণীর নেই।’

তাই যদি হয় তাহলে গোর্কি, সেরাফিমোভিচ, মাসলানভস্কি, ফারমানভ, ফাদায়েভ, ফেদিন, লিওভ প্রমুখরা কে? এঁদের লেখা কি মৌলিক নয়? এঁরা কি লেখক নন?

কিন্তু যুক্তিতর্কের ধার সাম্রাজ্যবাদীরা ধারে না। তাদের একটিই লক্ষ্য : অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়াকে যেমন অবরোধ করা হয়েছে তেমন সোভিয়েতের শোষণমুক্ত নতুন মানুষ যে নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলছে তাকেও একঘরে করা ও তার অবমূল্যায়ন ঘটান, সে সম্পর্কে লোকের মনে ঘৃণা ও বিবোধ ও ভীতির সঞ্চার করা, সাম্যবাদী ভাবধারার, অনুপ্রাণিত হয়ে এবং পুঁজির শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে রাশিয়ার স্বাধীন মানুষ যে নতুন জীবন গড়ে তুলছে সে সম্পর্কে মানুষকে অজ্ঞ রাখা।

কারণ বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়ার যা ঘটছে সে সম্পর্কে মানুষ যদি সত্য কথা জানতে পারে তাহলে খোদ আমেরিকাতেই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ঘনীভূত হবে এবং শোষক শ্রেণীর অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

তাই খোদ আমেরিকাতে জন্ম নিল ম্যাকার্থিবাদ। ১৯৫০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি সেনেটর ম্যাকার্থি ছোট্ট সহর হুইলিং-এ এক বক্তৃতায় বললেন ‘আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির ২০৫ জন সভ্য পররাষ্ট্র বিভাগে কাজ করছেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেটা জানেন।’

এরপরই শুরু হল কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে নির্বাতন ও মার্কিনী জনগণের মধ্যে এ সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার করা। যুক্তোঁরা খবরের কাগজ, বেতার, টেলিভিশন প্রভৃতি প্রচারমাধ্যমগুলির সাহায্যে এমন কমিউনিস্ট বিরোধী পরিবেশ সৃষ্টি করা হল যে হিটলারের প্রচারের সময় জার্মানীর জনগণের মত মার্কিন জনগণের মধ্যেও এক তীব্র কমিউনিস্ট বিরোধিতা দানা বেঁধে উঠল। এ সম্পর্কে ১৯৬০ সালের এক সমীক্ষার দেখা গেল যে ‘শতকরা ৬৮ জন আমেরিকান কমিউনিস্টদের বক্তৃতা করতে দিতে রাজি নয়, শতকরা ৯১ জন তাদের উচ্চ শিক্ষার পদ থেকে বিতাড়িত করতে চায়, শতকরা ৬১ জন কমিউনিস্টদের জেল দিতে চায়, শতকরা ৭৭ জন তাদের নাগরিক আধিকার কেড়ে নিতে চায় এবং শতকরা ৬৮ জন তাদের দোকান কর্মচারীর পদ থেকে ছাটাই করতে চায়।’ কমিউনিস্টবিরোধী হিন্টারলার এই হল চরম পরিণতি।

বৃত্তব পরিদৃষ্টি : বৃত্তব কৌশল

প্রচারের এই ধারা অর্থাৎ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে হেয় করা, তাকে বরফট করা, বিকৃত অর্থাৎ এক কথার তার সামগ্রিক বিরোধিতা করার অপকৌশল অব্যাহত রইল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত। এই সময়ে

সোভিয়েত সাংস্কৃতিক পাঠকদের কাছে হের করার জন্য যে বইখানি প্রকাশিত হল তাদের নামকরণ করা হতে লাগল এই ধরনের— ‘Literature in the Doldrums, Literature puts in Uniform. প্রভৃতি।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুটি ঘটনা ঘটল যা অল্প সোভিয়েত বিরোধিতা ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের বিরুদ্ধে এতদিনের কৌশল প্রচারের ধারাকে একেবারে অচল করে দিল।

এই দুটি ঘটনা হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েতের জয়লাভ এবং সোভিয়েত কৃত্রিম মহাকাশ অভিযান।

এই ঘটনা দুটির মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েতের জয়লাভ বিশ্বের মানুষের সামনে সোভিয়েত রাষ্ট্রের সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের বাস্তবতা প্রমাণ করে দিল।

যে ফ্যাসিবাদী শক্তির পাতের নীচে ইউরোপের একাটির পর একটি রাষ্ট্র পদানত হল, এমনকি যে পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না তার রাজধানী লন্ডন ও হিটলারের সেই দুর্ধর্য সময়সংগতকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে রাশিয়া বার্লিন দখল করল।

মানুষের কাছে এটা একটা বিস্ময়। কারণ ১৯১৭ সালে সোভিয়েত বিপ্লব হওয়ার পর বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যমগুলি একটানা প্রচার করে আসছিল যে রাশিয়ার অর্থনীতি পঙ্গু, রাশিয়ার সামরিক শক্তি নিকৃষ্ট ধরনের, রুশ সৈন্যরা যুদ্ধ করতে জানে না, তাদের কোন আধুনিক সমরাস্ত্র নেই। জারের আমলের রুশ বাহিনীর গোঁর বীর্য ধ্বংস করে ফেলেছে কমিউনিস্টরা।

হিটলারের আক্রমণের পর তারা গণতন্ত্রের মত ঘোষণা করতে লাগল কদিনে, কখন মস্কোর পতন হবে এবং হিটলারের বাহিনী কেমনভাবে রাশিয়া থেকে কমিউনিজমকে উচ্ছেদ করবে।

কিন্তু তাদের কোন গণনাই মিলল না। বিশ্বের মানুষ অথবা বিশ্বের দেখল লেনিনগ্রাদের প্রতিরোধ, স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধ, মস্কোর দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, লালফৌজের হাতে বার্লিনের পতন।

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ শিখল রাশিয়ার সামরিক শক্তি সম্পর্কে বুর্জোয়া এতদিন যা প্রচার করে এসেছে তা মিথ্যা।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল গ্যাগারিনের মহাকাশ ভ্রম। বিজ্ঞানে, কারিগরী

জ্ঞানে, সর্বাধুনিক কৃৎকৌশলে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব চমকে দিল মানুষকে।

এতদিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী মহল ও তাদের প্রচারমাধ্যমগুলি বিদ্যের মানুষকে বোকাবার চেষ্টা করত যে বিজ্ঞান ও সর্বাধুনিক কৃৎকৌশলের ক্ষেত্রে রাশিয়া মোটেই উন্নত নয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রসর দেশ হল আমেরিকা। তারপর ব্রুটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলি। এদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা রাশিয়ার নেই।

কিন্তু গ্যাগারিনের প্রথম মহাকাশ ভ্রমণ প্রমাণ করে দিল যে সর্বাধুনিক কৃৎকৌশলের ক্ষেত্রে রাশিয়া কোন কোন বিভাগে পশ্চিমী দেশগুলির চেয়ে অগ্রসরমান। এর ফলে 'রাশিয়া পশ্চাত্তপদ দেশ' এই প্রচার চালানো সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল।

সাধারণ মানুষ এসব কথা বিশ্বাস করা নূরে থাক শুনতেও রাজী হল না।

সাম্রাজ্যবাদ এবং তার প্রচারকদের সামনে হাজির হল এক কঠিন সময়। গভীর সংকটে পড়ে গেল তারা। পুরানো প্রচারকৌশল তার বিশ্বাস-যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, রাশিয়াকে ধ্বংস করে ফেলা সম্ভব এ কথায় আর কেউই গুরুত্ব দিচ্ছে না, রাশিয়ার সঙ্গে সহ-অবস্থান করতে হবে এটাই যেন বোশ করে মানুষের মনে রেখাপাত করেছে। অর্থাৎ এক কথায় ১৯১৭ সালের পর থেকে এতদিনের কামিউনিস্টবিরাণী রণকৌশল একেবারেই অচল হয়ে গেল।

জরুরী প্রয়োজন হল এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কামিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রচারে কী নতুন কৌশল নেওয়া সম্ভব সেটা উদ্ভাবন করা।

সাম্রাজ্যবাদী প্রচারকদের ক্ষেত্রে এ বিভ্রান্তির সময়কাল হল প্রায় গোটা পশ্চাত্তপদ দশক।

যুদ্ধপরবর্তী এই দশকে সাম্যবাদের অজয় ভাবধারা ব্যাপকতম মানুষকে আকৃষ্ট করতে লাগল। এই সময়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে মূর্তি আন্দোলনের জোয়ার বয়ে গেল। সাম্রাজ্যবাদ প্রায় প্রতিটি দেশে গ্রানিকর পরাজয় বহন করতে বাধ্য হল। ১৯১৭ সালের পর থেকে সাম্যবাদী ভাবধারার বিরুদ্ধে তারা বে'ল্গা, বিয়েন ও ভীতি সৃষ্টি করেছিল তা কপু'রের মত মিলিয়ে যেতে লাগল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে

সোভিয়েতের শোখ সর্বোদয়ের মত মানুষের চেতনকে আলোকবর্ত্তা
করে তুলল।

এমনি এক পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে নতুন রণকৌশল
সম্পর্কে লাইন দিলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রুশ বিভাগের তৎকালীন
ডাইরেক্টর হেনরি রবার্টস। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারিতে তিনি লিখলেন—
ইতিহাসের এক বিশেষ সময়ে যখন সামরিক ক্ষেত্রে এক ধরনের অচলাবস্থা
আসে, কূটনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুতর আলোচনার বিষয় খুব কম থাকে, তখন কি
এই দুই প্রচণ্ড রাজনৈতিক ও আদর্শগত ব্যবস্থার সমস্ত শক্তি যে ক'টি
গতিময় ও পরিবর্তনশীল ক্ষেত্র আছে যেমন ভাবাদর্শ ক্ষেত্র ও সাম্প্রতিক
কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভবপর নয়?

সাম্রাজ্য বিরোধিতার নতুন লাইন পেল সাম্রাজ্যবাদীরা। অনেক বিচার
বিবেচনার পর মার্কিন রাষ্ট্রপতি জে. এফ. কেনেডি এই বক্তব্যকে রাষ্ট্রীয়
ক্ষেত্রে নতুন নীতি হিসাবে নির্ধারণ করলেন এই বলে যে—‘There is no
point of now consolidating red block with our talk of
massive retaliation,—now we must seek way of dividing
it.’ (John F. Kennedy, the Strategy of Peace. New York
1960, P. 44)

অর্থাৎ মোক্ষা কোথায়—‘সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার বলে ওদের সংহত হতে
দিলে হবে না। ওদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি কর—’ এটাই হয়ে উঠল সাম্রাজ্যবাদের
ভাবদ্বারা মোকাবিলায় ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের রাষ্ট্রীয় নীতি। আর এর পরেই
৬০-এর দশকে আমরা দেখলাম পৃথিবীর নানা দেশে কর্মউর্দনষ্ট আন্দোলন
অভ্যন্তরীণ স্বপ্নের ফলে ভেঙ্গে বহুবিভক্ত হয়ে যেতে লাগল। এ ছাড়া
হাঙ্গেরী চেকোস্লোভাকিয়া, পরবর্তীকালে পোলাণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রতিবন্দ্বী
অভ্যুত্থান ঘটবার চেষ্টাও হল।

‘Now we must seek ways to dividing it’ কেনেডির
এই নীতি এইভাবেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাস্তব রূপ পেল।

সাহিত্য ক্ষেত্রে এটা কি রূপ নিল। এতদিন পর্যন্ত সোভিয়েত
সাহিত্যের সামগ্রিক বিরোধিতার নীতি তারা ত্যাগ করল।

এরপর থেকে তাদের নতুন কৌশল হল সোভিয়েত সাহিত্যিকদের মধ্যে
বিভেদের রেখা টানার চেষ্টা করা। সৈন্যবাহিনীতে যেমন প্রুইন, কোম্পানী,
বিগেড, পদাতি দ্বাগ থাকে তেমনিভাবে সোভিয়েত লেখকদের তারা এইভাবে

ভাগ করল—‘গোড়া’, ‘উদারনৈতিক’, রুশ ঐতিহ্যবাহী’, ‘উদারনৈতিক রক্ষণশীল’, ‘রক্ষণশীল উদারনীতিবাদী’, ‘আধুনিক উদারনীতিবাদী’ প্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়ে।

আর এই ধ্বংসাত্মক কাজের মূখ্য দায়িত্ব দেওয়া হল আমেরিকার সরকারি সাহিত্যপট—‘প্রবলেমস অফ কন্সটিটিউশন’ পত্রিকার ওপর। এই কাগজের সম্পাদকপদে বসান হল সি. আই. এর একজন পদস্থ গোয়েন্দাকে—বার নাম আব্রাহাম ব্রুমবার্গ।

এই ভদ্রলোক যে সি. আই. এর ওপর মহলের এক্সেট সেটা ধরা পড়ল ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়া প্রতিবিল্লবী অভ্যুত্থানের সময়। প্রাগে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলেন ব্রুমবার্গ। রুদো প্রাভদার বিবরণ উদ্ধৃত করে ১৯৬৯ সালের ৬ আগস্ট প্রাভদা লিখল—‘ব্রুমবার্গকে প্রেপ্তারের পর তার কাছে পাওয়া গেল চেকোস্লোভাকিয়ার অর্থনীতি সংক্রান্ত ও সামরিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত নথিপত্র।’

সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদকের পক্ষে প্রয়োজনীয় নথিপত্রই বটে!

যাইহোক এই পত্রিকার সম্পাদকের শখ হল তিনি নিরপেক্ষ হবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সোভিয়েতের সব প্রখ্যাত লেখকদের আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর ‘প্রবলেমস অফ কন্সটিটিউশন’ পত্রিকার লেখার জন্য। আমন্ত্রণপত্রে তিনি বললেন তাঁরা যা লিখবেন তাই ছাপা হবে। কোন কাটছাঁট করা হবে না। এছাড়া লেখকরা যে দেশের মূল্য টাকা চান তাই দেওয়া হবে।

কিন্তু একজন লেখকও মিঃ ব্রুমবার্গের এই আমন্ত্রণের জবাব দিলেন না। তার বদলে কেউ কেউ লিখলেন ‘প্রবলেমস অফ কন্সটিটিউশন’ পত্রিকা ঠান্ডা-যুদ্ধের প্রচারক, ও কন্সটিটিউশনবিরোধী কাগজ। এতে তারা লিখলেন না।’

মিঃ ব্রুমবার্গ এতে ভীষণ চটে গেলেন। তাঁর নিরপেক্ষতার সন্দেহ? এর জবাবে তিনি ইস্ত্রায়েলের জনৈক ইসাক জাহাভিকে দিয়ে সোভিয়েত লেখকদের মত খণ্ডন করে একখানা চিঠি লেখালেন।

পৃথিবীর এত দেশ থাকতে ইস্ত্রায়েল! একেই বলে রক্তনে রক্ত। চেনে।

যাইহোক প্রচুর টাকা দিয়ে লেখান এই চিঠি পাঠকদের মনে কোন ছাপ ফেলল না। মিঃ ব্রুমবার্গও আর এ নিয়ে বেশী ষাটীবাটি করলেন না, কারণ প্রাভদার তাঁর গদ্যচরবৃত্তির খবরটা তখন প্রকাশ হয়ে গেছে।

কিন্তু এসব ঘটনা ছাড়া ‘প্রবলেমস অফ কন্সটিটিউশন’ পত্রিকা কিভাবে

সোভিয়েত লেখকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়? কি চান তারা সোভিয়েত লেখকদের কাছে?

It is under the slogan of socialism 'with a human face', 'human', democratic socialism.

সমাজতন্ত্রের ঘোষানের ভেতর একটু মানবতা, সমাজতন্ত্রের একটু গণতান্ত্রিকরণ।

সোভিয়েত লেখকদের তাঁরা বারংবার আমন্ত্রণ জানান এইভাবে লিখতে। এই পত্রিকা সোভিয়েত লেখকদের যোগ্যতায় চাইলেন: খনতান্ত্রিক জগত এবং সমাজতান্ত্রিক জগতের লেখকদের মধ্যে একটা সাধারণ কিছু আছে। প্রেণীর উদ্দেশ্য তারা একটি বিশেষ সামাজিক গ্রুপ। বিশ্বের শিল্পী সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক বাধা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবেন। (প্রবলেমস অফ কমিউনিজম, ১৯৬৭, সংখ্যা ২, পৃ: ৬৩)

এই প্রচারের চমৎকার জবাব দিলেন সোভিয়েত লেখক গ্রিগরি কনোভলেনভ। এই নতুন কৌশল সম্পর্কে তিনি বললেন—‘এরা চায় যে আমাদের পূর্ব-পূর্ববাদের ঈগল পাখীর বাসা থেকে ঈগল নয়, বেরিয়ে আসুক চড়ুই পাখীর ছানা।’

সোভিয়েত লেখকদের বিপক্ষে চালিত করার অপচেষ্টার এর চেয়ে ভাল জবাব আর হয় না।

তবে এরই মধ্যে তারা দু-একজন দালাল ঠিকই খুঁজে বের করল এবং তাকে নিয়ে কিছুদিন প্রচণ্ড হৈচৈ করল। যেমন পান্ডারনাক বা সোলকোনিংসিন। এদের মধ্যে পান্ডারনাকের ঘটনাটি ঘটছিল আগে। সোলকোনিংসিনের পরে।

সোলকোনিংসিনের ওপর বুল্গেরিয়া প্রচারকরা প্রচুর আশা পোষণ করেছিলেন, ভেবেছিলেন এঁরই মাধ্যমে সোভিয়েতের ভেতরে সাম্প্রদায়িক জগতে ধ্বংসাত্মক কাজ চালান সম্ভব হবে এবং সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধারাটিকে বদলে দেওয়া যাবে।

সোলকোনিংসিনের ‘ওয়ান ডে ইন দি লাইফ অফ ইভান ডেনিসোভিচ’ সম্পর্কে আমেরিকার সোভিয়েতবিরোধী প্রচারক ভেরা আলেকজান্দ্রোভা বললেন—‘A turning point in Soviet literature’ (সোভিয়েত সাহিত্যে নতুন মোড় নেওয়ার ঘটনা।) তাঁর ‘দি ফাফ্ট সার্কেল’ এবং ‘ক্যানসার ম্যুলায়ন—৭

ওয়ার্ড সম্পর্কে বলা হল—এ হল সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা এবং সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের সরাসরি বিরোধিতা। তার সর্বশেষ বই 'দি গুলাগ আর্কিপেলাগো' হল সরাসরি ঠান্ডাম্বলের প্রচার।

পশ্চিমী বিশেষ করে আমেরিকার সোভিয়েতবিরোধী প্রচারকরা সোলজেনিৎসিনকে তুলনা করলেন টলষ্টয়, গোগোল, ডব্লিউমভস্কি, ও অন্যান্য মহান লেখকদের সঙ্গে।

আর সোভিয়েতের 'লিটারেচারনাস্তা গেজেট' ১৯৬৯ সালের ২৫ নভেম্বর তার সম্পর্কে লিখল : সংশোধনের অযোগ্য দালাল, যিনি তার সোভিয়েত বিরোধিতা থেকে মুনফা করেন, নিজেকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে একটা উদ্বেজনাঙ্গণ হুলা সৃষ্টি করে তা থেকে লাভ করেন—তার প্রকৃত রূপ হল এই।'

কি করতেন তিনি? এইসব সোভিয়েতবিরোধী লেখা লিখে গোপনে পশ্চিমে চালান করে দিতেন। তারপর সেগুলো ছাপা হলে এমন ভান করতেন যেন তিনি কিছুই জানেন না। কিন্তু তার এই গোপন ব্যবসা বেশিদিন চলল না। সুইজারল্যান্ডের ব্যাংক তার টাকার অঙ্ক যতই ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল ততই সোভিয়েত সরকার সতর্ক হলেন এবং ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সোভিয়েত সরকার তার নাগরিক অধিকার বাতিল করে দিলেন।

তার গুলাগ আর্কিপেলাগো বিদেশে প্রকাশের পর ১৯৭০ সালে ৩১ আগস্ট প্রাভদার ৩০ জন সোভিয়েত লেখকের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। এতে স্বাক্ষর করেছিলেন সলোকভ, ফেদিন, কাতারেভ, সিমোনভ, টিকোনভ প্রমুখ প্রখ্যাত লেখকরা। এই চিঠিতে সোলজেনিৎসিনের গুলাগ আর্কিপেলাগো সম্পর্কে তারা বললেন—'এই মূহুর্তে এই গ্রহে যখন আমরা ভাল রাজনৈতিক পরিবেশ প্রত্যক্ষ করছি তখন শাখারভ এবং সোলজেনিৎসিনের মত ব্যক্তিত্বাধারা আমাদের রাষ্ট্রকে এবং সমাজব্যবস্থাকে নিন্দা করে তারা সোভিয়েত শান্তি নীতির প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি করতে চাইছে এবং পশ্চিমী জগতকে ঠান্ডাম্বলের নীতি চালিয়ে যেতে বলছে। এরা তাঁর ষড়্যা ছাড়া আমাদের আর কোন অনুভূতি জাগাতে পারে না।'

আর সোভিয়েত থেকে তাকে বিতাড়নের পর প্রাভদার ১৯৭৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত লেখক ভ্যালেন্টিন কাতারেভ এক চিঠিতে লিখলেন—'একজন লোকের মৃত্যু তার চারপাশে যারা থাকে তাদের পক্ষে একটা বিরাট চাপ, বিশেষ করে নাগরিক হিসাবে একজনের মৃত্যু।...কিন্তু আমার প্রজন্মের

মানুষ যারা দেশের জটিল, কঠোর, আত্মত্যাগে ভরা সময়ের মধ্য দিয়ে পথ হেঁটে অষ্টোত্তর দিগ্ভ্রম থেকে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন তাঁরা শৃঙ্খল এটাই বলতে চান যে কাউকেই সোভিয়েত রাষ্ট্রের অবমূল্যায়ন ঘটাতে দেওয়া হবে না। সেই দিক থেকে সোলকেনিৎসিনের ন্যায়িক হিসাবে মৃত্যু নামসংগত।

এইভাবেই সোলকেনিৎসিনের অধ্যায় শেষ হল। তাকে দিয়ে সোভিয়েত লেখকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হল। মার্কিনী প্রচারক কায়জার লিখলেন “আর তিনি কখনও রাজনৈতিক শক্তি হবেন না।”

সোলকেনিৎসিনকে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বহিস্কারের পর আমাদের দেশের অনেক বুদ্ধিজীবী তাঁদের যে বুদ্ধি আছে এটা প্রমাণ করার জন্য সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা সঠিক তথ্য না জেনে বিবেকের বশে এটা করে থাকলে এক ব্যাপার কিন্তু তাঁদের যদি অন্য কোন সংযোগ থাকে তবে তার মানে আলাদা।

আজকের দুনিয়ার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শৃঙ্খল বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের নেতা নয়, বিশ্বের বুর্জোয়া শ্রেণীরও নেতা। কমিউনিজমের মোকাবিলায় তারা যে রণকৌশল নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী তাকেই অনুসরণ করে। সাংস্কৃতিক ফ্রন্টও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানেও বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়া পটপটিকাগুলির সেই একই কৌশল : ভেতর থেকে ভাঙ্গ। লেখকদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ কর। কারো লেখা ছাপ, কারো ছেপো না। কাউকে প্রশংসা কর, কাউকে উপেক্ষা কর। সাম্যবাদী আদর্শের বিরুদ্ধে সংশয় সৃষ্টি কর। সাম্যবাদের আদর্শের মধ্যে মানবতার মূল উৎসর্গকে দেওয়ার মত লেখা লিখতে তাদের প্ররোচিত কর এবং সব শেষে টাকার প্রতি তাদের প্রলুব্ধ কর।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে সাম্রাজ্যবাদের এই নীতি কিভাবে কার্যকর হচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে একটু খোলা চোখে দেখলে এমন অনেক ঘটনা ও কিছু কিছু প্রগতিশীল লেখকের কিছু লেখা এমন সব কাগজে প্রকাশিত হয় বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না।

যাইহোক এই সব কিছু সত্ত্বেও পুরণাতীত কাল থেকে মানব ইতিহাসের বিকাশের ধারাটিকে কোন ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত বা সংঘাস দিয়ে রোধ করা সম্ভব হয় নি। তাই আজ বুর্জোয়া শ্রেণী যত অপকৌশলই করুক না কেন এক কথার রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এর জবাব দিয়ে বলা যায়—

‘দানবের মূর্ত্ত অপব্যয়

গ্রন্থিতে পারে না কত

ইতিহাসে লিখিত আছে—

ভূদেবের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য

অপূর্বকুমার রায়

“জাতীয় ভাব পরিগ্রহের পথ আমাদের পক্ষে একান্ত সংরুদ্ধ নহে।”
[সামাজিক প্রবন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়]

ভূদেবের পারিবারিক পরিবেশ ছিল হিন্দু ব্রাহ্মণের নিত্য রক্ষণশীল পরিবেশ; তিনি বিশ্বনাথ তর্কভূষণের পুত্র এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আপনার হিন্দু ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অতি-সচেতন। অতীন্দ্রিয় রহস্য উপলব্ধির স্বাভাবিক ক্ষমতা যে ব্রাহ্মণের আয়ত্তগত সে সম্প্রদায় তাঁর ছিল অটল প্রতীতি। পুত্রের উদ্দেশ্যে লেখা একটি পত্রে তিনি বলেছিলেন :

ব্রাহ্মণ সম্রাট তুমি—পূর্ববান্ধবের উচ্চ বিশ্বাস ব্রাহ্মণকুলে জন্ম তোমার—
তোমার পক্ষে ইহা উপলব্ধি করা কিছুই কঠিন নহে। বিষয়টি ছিল
স্বপ্নোজার সম্ভা বা অস্তিত্ব সম্পর্কিত আলোচনা।

ভূদেব গত শতকের পঁচের দশক থেকে নব্বয়ের দশকের প্রথম তিন বছর পর্যন্ত লেখনী সঞ্চালন করেছেন, যে সময়ের পরবর্তী অনেকটা অংশই হিন্দু পুনরুত্থানের সঙ্গে সংযুক্ত। ইংরেজদের আগমনে হিন্দু সমাজের প্রত্যাচার বিষয়ে উৎকীর্ণ ভূদেব বাঙালী হিন্দুর আদর্শ প্রতিষ্ঠার তাগিদে ‘পারিবারিক প্রবন্ধ’ এবং ‘আচার প্রবন্ধ’ গ্রন্থ দুটি রচনা করেছিলেন। তিনি পরিভ্রমণের মাধ্যমে লক্ষ্য করেছিলেন—

বিজ্ঞাতীয় শিক্ষার প্রভাব বৃদ্ধি হওয়াতে শাস্ত্রীয় বিধির প্রতি প্রকট অস্বীকার। এখন শৈশবাবধি যে ইংরাজি বিদ্যার শিক্ষা হয়, তাহাতে শাস্ত্রীয় বিধির কিছুমাত্র উল্লেখ থাকে না; প্রত্যুত সাক্ষাৎ বা পরোক্ষা সম্বন্ধে দেশীয় বা শাস্ত্রজ্ঞাতের প্রতি অপ্রীতি প্রকাশই থাকে; সুতরাং শিক্ষার কাল হইতেই লোকের শাস্ত্রাচারের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিয়া যায়। সুতরাং, বাঙালী হিন্দুর অবশ্যপালনীয় গৃহ্যসূত্র হিসাবে রক্ষণশীল

বিস্ময়ের বিষয়, এই একই ব্যক্তি তাঁর 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' ও 'সামাজিক প্রবন্ধ' প্রভৃতি গ্রন্থে জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কীয় আলোচনায় এবং হিন্দু-মুসলমানের সান্নিধ্য প্রদেয় যুগাভিযুক্তমণের পরিচয় রেখে গিয়েছেন। স্বধর্ম সীমাহীন আত্মা ও ধর্মনিষ্ঠ আচার-পালনের প্রয়াস তাঁকে উদার ও পরমতসাহিবু করে তুলেছিল। তাঁর জীবনীপাঠে জানা যায়, তাঁর গৃহে মুসলমান ছাত্রদের বিশেষ আদর ছিল। নিজের ধর্মের প্রতি প্রকটভাবে তাঁকে পরধর্মের প্রতি প্রকাশ্য করে দেন। তাই, তিনি 'পারিবারিক প্রবন্ধ'র অন্তর্গত 'ধর্মচর্চা' শীর্ষক রচনায় অকুণ্ঠিতচিত্তে বলতে পেরেছেন, 'পৃথিবীতে যত পোশকের বা নরদেব এ পর্বত আবির্ভূত হইয়াছেন তন্মধ্যে মহম্মদকেই সর্বপ্রধান বলিয়া বোধ হয়।'

স্বধর্মনিষ্ঠ ভূদেব স্বার্থাধর্মনিরপেক্ষতা (secularism)-এর ভিত্তিভূমিতে ঐক্যবন্ধ ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের সান্নিধ্য বিষয়ে তাঁর বক্তব্য মূলত 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' এবং 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। প্রথম গ্রন্থটিতে তিনি কল্পনার আশ্রয়ে তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠার অগ্রসর হয়েছেন, আর, দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে রাজনীতি ও সমাজনীতির আলোকে তাঁর আদর্শ রূপায়ণের প্রদেয় প্রতিফল ও অনুকূল অবস্থার আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' গ্রন্থে তিনি কল্পনা করেছেন যে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠা শক্তির পরাজয় ঘটে নি, এবং মারাঠা শক্তির সাহায্যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবন্ধ ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মারাঠা রাজ রামচন্দ্রের নেতৃত্বে, যিনি দেশের পরিচালনাভার গ্রহণ করেই, আকবর বাদশাহের আশাবাদি প্রাধিকার সেকেন্দ্রার উপাধ্বস্ত হয়েছেন :

সম্রাট রামচন্দ্র সেকেন্দ্রা দর্শনে আসিয়াছেন, এবং প্রধানমন্ত্রী পেশোয়ারকে সম্মতিবাহ্যে করিয়া যে সর্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে আকবরের সমাধিস্থান, সেই স্থানে গমন করিয়াছেন। দুই জনে তথায় উপবিষ্ট, রাজা রামচন্দ্র কহিতেছেন—'পিতৃ, আমি আপনাকে আদেশের অনুবর্তী হইয়া এই স্থানে আসিয়াছি—তাজমহল অপেক্ষাও এই স্থানটি অধিকতর রমনীয় বলিয়া আমার বোধ হয়।' রাজার কহিতেছেন, 'বৎস! তাজমহল একজন সমৃদ্ধিশালী বাদশাহের নির্মিত বটে, কিন্তু যিনি সেকেন্দ্রার নির্মাতা, তিনি কেবল ধনশালী বাদসাহ ছিলেন না, তিনি একজন সুদূরদর্শী মহাপুরুষ

বিভিন্ন মহাদেশটিকে একত্রে করিয়া রাখিতে হয়। ধর্মবিশেষ কখনই তাহার অন্তঃকরণে স্থান লাভ করে নাই। তিনি হিন্দু এবং মুসলমানকে এক ধর্মসূত্রে সম্বন্ধ করিবার জন্য কি বিচিত্র উপায়েরই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। [স্বল্পলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, চতুর্থ পরিচ্ছেদ]
এই গ্রন্থেই ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ স্থাপনের শূভদিনের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

দ্বিতীয় রাজবর্ষ সকল জনতার পরিপূর্ণ। জুমা মসজিদে মণ্ডিসভার আয়োজন হইয়াছে।...প্রজাদিগের কৌতূহলের পরিসীমা নাই। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মহারাজ, মুসলমান প্রভৃতি নানা প্রদেশবাসী জনগণ পথিপাশ্বে স্থানে স্থানে মিলিত হইয়া পরস্পর কথোপকথন করিতেছে। সকলেরই মুখ প্রফুল্ল, অন্তঃকরণ উৎসাহপূর্ণ। একজন ব্রাহ্মণ একজন মুসলমানকে বলিতেছেন, 'যে রাম সেই রহিম, ঈশ্বর এক এবং অধ্বিতীয়।' মুসলমান বলিতেছেন, 'ঠাকুর ষোড়শ' কহিয়াছেন, সমস্ত জগৎ সেই এক অধ্বিতীয় ঈশ্বরেরই বিত্ত্বিত মাঠ, মানুষ ভেদে যেমন আচারভেদ-পরিচ্ছদভেদ-ভাষাভেদ—তেমনি উপাসনার প্রণালীভেদও হইয়া থাকে। সকলেই এক পিতার পুত্র। সেই পিতা ভিন্ন ভিন্ন পুত্রে ভিন্ন ভিন্ন পোষাক পরাইয়া দিতেছে। কিন্তু সকলেরই চামড়ার নিচে লহু লাল বই কাহারও কাল কাহারও জরদ নহে। [তদেব, তৃতীয় অধ্যায়]

ঐক্যবদ্ধ নব ভারতবর্ষে আতিথ্য ও উৎসব বিষয়ক বর্ণনা প্রসঙ্গে ভূদেব লিখেছেন :

হিন্দুদিগের এবং মুসলমানদিগের যতগুলি উৎসব ছিল, সবগুলিই এখনও জাগ্রত আছে, তন্মধ্যে অপর কয়েকটি নূতন উৎসব দেশে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।...কোথাও কোথাও ঐরূপ মেলা এবং প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান পর্ব এক দিবসে পড়িয়া তিনটিতে মিলিয়া একটি অপূর্ব পদার্থ হইয়া উঠিয়াছে। গীরামনবর্মী, মহরম ও বাল্মীকি পর্ব ঐরূপ একত্রিত হইয়া গিয়াছে। অনেকের মূহুর্তি সিকাত হইয়াছে যে, যে রাক্ষস সেই এজিব, যে হোসেন সেই লক্ষণ, যে হনুমান সেই জোরিল, রামচন্দ্র এবং পাইগন্ধর অভেদ; কেমন করিয়া ঐরূপ সিকাত হইয়া দাঁড়াইল, তাহা নিরূপণ করা যায় না। [তদেব]

আর ঐক্যবদ্ধ এই ভারতবাসীই যে আন্তর্জাতিকতার মূলসূত্র প্রতিষ্ঠার পথে

করেছেন, ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী এই সম্বন্ধে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং,

এই গ্রন্থের সমুদয় অংশ সংশোধিত হইলে প্রমাণিত হইবে যে, বেদপ্রমাণক হিন্দু, আবেষ্টা-প্রমাণক পারসিক, বাইবেল-প্রমাণক যিহুদী ও খ্রীষ্টান এবং কোরাণ-প্রমাণক মুসলমান, ইহারা সকলেই মূলত একই কেতাবী জাতি। ভারতবর্ষীয় কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

ভূদেবের 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' সর্বপ্রথম ধারাবাহিকভাবে 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় ১২৮২ সালের ৬ই কার্তিক থেকে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হতে থাকে। পুস্তকাকারে এই গ্রন্থটি ১৩০২ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগেই ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত ভূদেব কম্বট্র-এর Romance of History থেকে তার ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৬) গ্রন্থের জন্য যে দৃষ্টি কাহিনী নির্বাচন করিয়াছিলেন তার একটি কাহিনীর নায়ক সর্বকথাগীন এবং অপর একটির নায়িকা রোসিনারা (নামের ক্ষেত্রে ভূদেব ব্যবহৃত বানান রক্ষিত হয়েছে)। তিনি সর্বকথাগীনকে কখনো 'ধর্মাত্মা', কখনো 'শুদ্ধাত্মা' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করেছেন এবং তার একনিষ্ঠ স্বধর্মচরণের বর্ণনা দিয়েছেন :

পরে পাথের প্রবাস্যামগ্রী সমুদায় ক্ষুদ্রে আরোপণ করিয়া ভূতলে জানু পাতনপূর্বক আত্মরিক ভক্তি সহকারে সবেতমনোবৃত্ত হইয়া স্বীয় ধর্মের শাসনানুযায়ী পুণ্যধাম মন্টার প্রভাভিমুখে ঈশ্বরারাধনা করিয়া পুনর্বীর গমনোদ্যত হইলেন। [ঐতিহাসিক উপন্যাস, সফল স্বপ্ন, প্রথম অধ্যায়]

আর 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' কাহিনীর নায়িকা রোসিনারা যে ভূদেবের লেখনীমুখে মহীঃসৌ মাহিমা লাভ করেছেন তার প্রমাণ হিসাবে এই কাহিনীর সমাপ্তিসূচক পংক্তিনিচয় লক্ষ্য করতে পারি :

রামদাস স্বামী এই পঠ পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কাহিলেন, 'মহারাজ! ভূমণ্ডলে যে এতাদৃশ উদারচরিতা কামিনী (রোসিনারা) আছে তাহা আমি জানিতাম না। ষাহারা প্রাণ বিসর্জন দ্বারা পাত্তব্রতা রক্ষা করেন তাহারাও ইহার ন্যায় পতিপরায়ণ নহেন। মহারাজ। আমি অনুমতি করিতেছি ঐ অঙ্গুরীয় গ্রহণ করুন—এবং শাস্ত্র যদি সত্য হয় তবে পরজন্মে এই বাদসাহ-কন্যাই আপনকার

সহধর্মিনী হইবেন ইহার সন্দেহ নাই। [ঐতিহাসিক উপন্যাস, অঙ্গুরীয়
বিনিময়, দ্বাদশ অধ্যায়]

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, বঙ্গকমন্ডেলের আরোহা চরিত্র ভূদেবের রোসিনারা চরিত্রের
দ্বারা অনুসরণ করেই বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গনে উপস্থিত হয়েছে। বাই হোক,
ভূদেব ইতিহাস ও কল্পনার মিলিত প্রয়াসে পরিকল্পিত উল্লিখিত দু'টি চরিত্র
ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে রূপায়িত করেছেন। আর, 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের'
ইতিহাস গ্রন্থে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ও সর্বাঙ্গীভূত যে ভারতবর্ষের চিত্র কল্পনামেয়ে
অবলোকন করেছিলেন সে চিত্র বাস্তবায়িত করে তোলায় জন্য প্রতিকূল ও
অনুকূল অবস্থার সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছিলেন
'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থে।

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ সংবর্ধন প্রসঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবিশয়ে
প্রতিকূল অবস্থার পর্য্যালোচনা করতে গিয়ে ভূদেব ব্রিটিশ বিভেদপন্থার প্রতি
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেই গত শতাব্দীতেই। এই প্রসঙ্গে তিনি
ইংরেজ ঐতিহাসিক, ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এবং ইংরেজ শিক্ষার বিভেদপন্থী
ভূমিকার সমালোচনা করেছেন। অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিক যে কখনো
প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনো অপত্যাক্রম্যভাবে এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপর
সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করার কাজে বিকৃত ও অতিশয়িত ইতিহাস পরিবেশন
করেছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ভূদেব বলেছেন :

...“হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ রক্ষা করিবার এবং তাহা বান্ধিত করিবার
অপর একটি প্রবলতর কারণ উপস্থিত হইয়া আছে। অনেক ইংরাজ
গ্রন্থকার, কখন স্পষ্টাক্ষরে কখন ইঙ্গিতক্রমে, অনুক্ষণই বলিয়া থাকেন যে,
মুসলমানেরা যখন দেশের রাজা ছিল, তখন হিন্দুদিগের প্রতি অকথা
অত্যাচার সম্ভব করিয়াছিল। ইংরাজ গ্রন্থকারেরা এইরূপে হিন্দুদিগের
মনোমধ্যে মুসলমানদিগের প্রতি একটি গঢ় বিবেচ্য বীজ বপন করিয়া
দিতেছেন। [সামাজিক প্রবন্ধ, প্রথম অধ্যায়]

ভূদেব মনে করেছেন, যে মুসলমানদের মধ্যে উৎকৃষ্ট মানুষের অভাব নেই
সেই মুসলমানদের অভ্যুদয়কালে যে 'নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারকারীদের প্রাধান্য ছিল,
একথা অবিশ্বাস্য। তাঁর বক্তব্য, কোন কোন মুসলমান নবাব সুবা এবং বাদসাহ
প্রজাপীড়ন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অনেকেই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, আর যারা
অন্যায়চারী তাঁদেরও অত্যাচার প্রায়ই দেশব্যাপী হয় নি, দু'চারজন ধনশালী
এবং পদস্থ লোকের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল।

ভূদেব আরও লক্ষ্য করেছেন, 'রোমীয় বাবুশ্বাসান্দ্র এবং রাজনীতিশাস্ত্র' সম্বন্ধে প্রত্নাবান অনেক ইংরাজ রাজপুত্ররূপে 'প্রজায় প্রজায় মনের মিল' না হতে দেওয়াই 'বিজয়লক্ষ্য রাজ্য-পালনের বিধি হিসাবে গ্রহণ করেছেন :

...উহারা সর্বদাই হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে বাহাতে সন্মিলন না হইতে পার, তাহার জন্য যত্ন করেন। কৌশল করিয়া কখন মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর একটু অধিক আদর করেন, এবং যখন হিন্দু সেই আদরে ভুলিয়া যায়, তখনই আবার মুসলমানের দিকে বিলক্ষণ কৌক দেন। [সামাজিক প্রবন্ধ, প্রথম অধ্যায়]

এই একই অধ্যায়ের শেষের দিকে তিনি মন্তব্য করেছেন :

প্রদেশীয় ভাষাগুলির অবাস্তর ভেদ রাখিবার জন্য, বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসাদিগের মধ্যে ঈর্ষা প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য, হিন্দু সমাজের অন্তর মধ্যে বিবেক প্রাবল্য করিবার জন্য, দলাদলির রাজনৈতিক সূত্রে পরিষিত-হৃদয় কোন কোন ইংরাজকে মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ যত্নশীল বলিয়াই বোধ হয়। [সামাজিক প্রবন্ধ, জাতীয়ভাব—উহা সম্বন্ধে পথ]

অন্যও তিনি লক্ষ্য করেছেন :

আর কোন কোন ইংরাজ হাবিমেরাও যেন হিন্দুর প্রতি মুসলমানের বিরোধ একটু রক্ষা করিয়া চলিতেছেন বলিয়াই কোথাও কোথাও সন্দেহ হয়। [ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়]

এ বিষয়ে বর্তমান শতকের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথও হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ সৃষ্টি বিষয়ে ইংরেজের প্রচেষ্টা ভূমিকার কথা বলেছেন :

কিন্তু যে ভেদটা আছে রাজ্য যদি চেষ্টা করিয়া সেই ভেদটাকে বড়ো করিতে চান তবে কালক্রমে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষাবিশেষের তীব্রতা বাড়িয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। [রবীন্দ্রনাথ, সমূহ, সদুপায় শীর্ষক প্রবন্ধ, ১৩১৫ সালে লিখিত]

অথবা,

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ সম্প্রতি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে ইহা গবর্মেণ্টের পলিসি-সম্মত না হইতে পারে, কিন্তু গবর্মেণ্টের অন্তর্গত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুৎকারে যে এই অগ্নিকাণ্ডের সূচনা করিয়া দিয়াছে, আমাদের দেশের লোকের এইরূপ বিশ্বাস। ভুলার বস্তার মধ্যে আগুন

ফেল্লারা যখন সমস্তটা ধরিয়া উঠিবার উপক্রম হইল তখন প্রবল পদাঘাতের দ্বারা সেটা নিবারণ করা হইতেছে ; তুলা বেচারি একে তো পুড়িল, তাহার পরে লাথিটাও অপব্যাপ্ত পরিমাণে খাইতে হইল। [রবীন্দ্রনাথের, সমুদ্র, পরিশিষ্ট, ইংরেজের আতঙ্ক, ১০০০ সালে রচিত]

লক্ষনার বিষয়, ব্রিটিশ রাজের বিভেদকামী ভূমিকা সম্পর্কে গত শতকেই ভূদেব দেশবাসীকে সতর্ক করিয়াছিলেন। ভূদেবের উজ্জ্বল উত্তরসাহক রবীন্দ্রনাথ, বর্তমান শতকে, একই ধরনের বক্তব্য দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

ভূদেব হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের পারস্পরিক ঐর্ষ্যসম্ভারের অপচেষ্টা ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে দেশবাসীকে বলেছিলেন, 'ঐর্ষ্য' করিলেই উর্হাদিগের অতীর্ষ সিন্ধু হইবে।'

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতিবন্ধক হিসাবে ভূদেব আর একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্ট আকর্ষণ করতে চেষ্টাছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, ইংরেজ শিক্ষা ভারতের প্রধান দুই ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে, বিবেক-বিশ্ব সম্ভারিত করতে সাহায্য করেছে। 'সামাজিক প্রকণ্ড' গ্রন্থটিতে তিনি লক্ষ্য করেছেন, আধুনিক ইংরেজ শিক্ষিত যুবকদের মনে মুসলমান সম্প্রদায় ও ধর্মের প্রতি বড়ো বিদ্বেষ দেখা গিয়েছে পূর্বের পারস্য ভাবার সুশিক্ষিত সদাচারসম্পন্ন সদ্-ব্রাহ্মণদিগেরও তার অর্ধাংশে দেখা যায় নি। উদাহরণ হিসাবে তিনি বলেছেন :

ছাপরা নগরবাসী কয়েকটি ব্রাহ্মণ তরুণ একটি সুপ্রসিদ্ধ মোলবীর সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন—'মহাশয় ! মোলবী সাহেব মুসলমান হইলে কি হয়, উনি এমনি পবিত্রাচার ও পবিত্রমনা ব্যক্তি, যে আমরা ব্রাহ্মণ হইয়াও যদিও উহার উচ্ছৃঙ্খল ভোজন করি, ওহাতে আমরা অপবিত্র হইলাম এমন মনে করিতে পারি না।' বাস্তবিক মুসলমানদিগের মধ্যে এমনি উদারচেতা পবিত্রকর্মা মহাশয় সকল আছেন বটে। [সামাজিক প্রকণ্ড, প্রথম অধ্যায়, জাতীয়তাবাদ—ভারতবর্ষে মুসলমান]

আর, শ্রদ্ধা মুসলমান কেন, ভারতবর্ষের সমস্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘুগণ, স্বদেশীয় ভাষাধারার ভাবিত, মানবের সঙ্গে সংখ্যালঘুগণ ইংরেজ শিক্ষাপ্রাপ্ত মানবের ক্ষতিকর দৃষ্টির ব্যবধান দৃষ্টি করেছে বলে ভূদেব মনে করেছেন। কিন্তু, ইংরেজ শিক্ষিত ভারতবাসীরা এই ক্ষতিকর দিকটি সম্বন্ধে উদাসীন, কারণ,

ইংরেজ শিক্ষার প্রভাবে দেশীয় সাধারণ লোক হইতে তাঁহাদের যে বিশিষ্টতা

[সামাজিক প্রবন্ধ, পঞ্চম অধ্যায়, ভবিষ্যবিচার—ভারতবর্ষের কথা
(ভাষা-বিষয়ক)]

অপর্যাপ্ত কোন কোন ধর্মোন্মাদ মৌলবী যে অন্তত সামাজিকভাবে হিন্দু—
মুসলমানের সম্মিলনের পৃথক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন সে বিষয়েও তিনি
লক্ষ্য করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ভূসেব বলেছেন :

সৈয়দ আহমদ নামক একজন মৌলবী আসিরা বঙ্গদেশের মুসলমান-
দিককে গোয়ামে খাইতে, বিধবার বিবাহ দিতে, দেবপুজার প্রভা গ্রহণ না
করিতে এবং হিন্দু নিমন্ত্রণে না যাইতে শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু ঐরূপ
উত্তেজনার ফল অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। [ভূসেব, প্রথম অধ্যায়,
জাতীয়তাব—ভারতবর্ষে মুসলমান]

হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলন এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ সৃষ্টির উজ্জ্বল
সম্ভাবনা বিষয়ে, 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থে, আলোকপাত করা হয়েছে।
জাতীয়তাব সম্বন্ধে ভূসেবের বক্তব্য এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে পাঁচটি বিভাগে
পরিবেশিত হয়েছে : জাতীয়তাব—উপভ্রমণিকা/জাতীয়তাব—ভারতবর্ষে
মুসলমান/জাতীয়তাব—ভারতবর্ষে খ্রীষ্টোনিয়/জাতীয়তাব—ঐতিহাসিক
প্রকৃতিভেদ/জাতীয়তাব—উহা সংবর্ধনের পথ। 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থের
আভাস' শীর্ষক অংশে তিনি জাতীয়তাব বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা
প্রসঙ্গে বলেছেন :

...সংদেশীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে জাতীয়তাব সংস্থাপিত
ও পরিবর্তিত হইতে পারে কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখানো হইয়াছে
যে জাতীয়তাব পরিগ্রহের পথ আয়াদিগের পক্ষে একান্ত সংরুদ্ধ নহে।

ভূসেবের মতে, 'জাতীয়তাব কণ্ঠস্বকতাত্ত্বই নিবন্ধ নয়'। তিনি জাতীয়তাব
সংবর্ধনের প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য এক রাজার শাসন এবং
শাসন পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ব্রহ্মদেশ পরিভ্রমণকালে,
আকস্মিক থেকে লেখা একটি পত্র, সর্বপ্রথম এই বিষয়ে তাঁর সচেতন চিন্তার
প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই পত্রটিতে ভূসেব লিখেছিলেন :

আমি প্রাক্তকালে আকস্মিক বন্দরে পৌঁছিয়া কাছারী, ধানছাটা কল,
বৌদ্ধমন্দির এবং সমগ্র সহরটা দেখিয়াছিলাম।

এই বন্দরে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মান্দ্রাজী ও মুসলমান প্রভৃতি
মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতেছে দেখিয়া মনে হইল যে, একটি প্রবল
রাজত্বের মধ্যে থাকিলেই এক জাতি, ভাষা ও ধর্ম বিভেদ সংহত ক্রমশ

জাতীয়তাবাদ গড়িয়া উঠিতে পারে। [আকিয়াব থেকে বন্দোবন বন্দুকে লেখা পত্র, কুমারদেব বন্দোপাধ্যায়ের 'ভূদেব চরিত', প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩১ প্রমুখ]

জাতীয়তাবাদ সত্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির আর্থন্যায় উপাদানের আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, একজন বহুদলী ইউরোপীয়ের নিম্নলিখিত বক্তব্য ভূদেব মেনে নিয়োজিলেন :

লোকসকলের মধ্যে সকল প্রকার বিভেদকে নষ্ট করিয়া সম্মিলন বা একতা জনমাইবার অমোঘ উপায় এক রাজার শাসন এবং শাসনপদ্ধতি—এই উপায়ের দ্বারা বিভিন্ন প্রকৃতিক, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন বর্ণসম্প্রদায় জনগণের মধ্যেও জাতীয়তাবাদ জন্মে, কারণ এক শাসনপদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী ফল জনগণের সমসুখদুঃখতা বা সহানুভূতি ; এবং তাহাই জাতীয়তাবাদ জন্মবার সর্বপ্রধান কারণ এবং ঐ ভাবের প্রধান লক্ষণ। [সামাজিক প্রবন্ধ, জাতীয়তাবাদ—উপক্ৰমণিকা]

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এই বক্তব্যের সঙ্গে গত শতকের ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ মিল-এর চিন্তার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। মিল-এর সংজ্ঞার সাথে মিলিয়ে নিলে দেখা যায়, ভূদেব যাকে 'জনগণের সমসুখদুঃখতা' বলেছেন, মিল তাকে বলেছেন Common sympathies, ভূদেব যাকে বলেছেন 'এক রাজার শাসন এবং শাসনপদ্ধতি' মিল তাকে একটু অন্যভাবে বলেছেন 'desire to be under the same government'. মিল-এর 'under the same government' বক্তব্যটির স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শোনা যায় ভূদেবের জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা সম্পর্কিত আলোচনায়। জাতীয়তাবাদ পরিবর্তনের বিষয়টি ভারতবর্ষের অতীত ও বর্তমানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে তিনি অন্ত্যর্ধক দিকটির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :

সমস্ত ভারতবর্ষের রাজ্যশাসন এক্ষণে সর্বতোভাবে এক হইয়া উঠিয়াছে। আমরা সকল ভারতবর্ষীয় এক সম্রাটের অধীনে এক মহা-সাম্রাজ্যবাসী বলিয়া আমাদেরকে সম্পষ্টরূপে জানিওঁছি। এক্ষণে আমাদের সাধারণ সুখ, দুঃখ, আশা, ভয়সা, আশঙ্কা এবং নিরাশা একসঙ্গে সম্বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে এতদূর না হউক, কখন কখন ভারতবর্ষের অতি সুবিস্তৃত ভূমিভাগ সকল একজনের অধীন হইত...আমাদের শাহ প্রভৃতি কয়েকজন মুসলমান সম্রাটও ভারতভূমির অনেকাংশকে প্রদেশ আপনাদিগের করতলস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তাহাদিগের সেই সমস্ত সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাগের পরম্পর সম্প্রদায়নোপায় অনেকদূর সুসিদ্ধ হইয়াছিল। [তদেব, জাতীয়তাব—ইহার উপাদান]

এই বিষয়েও মিল-এর সঙ্গে ভূমিগের বক্তব্যের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ভূমিগের বক্তব্যে 'সুখ, দুঃখ, আশা, ভয়সা, আকাঙ্ক্ষা এবং নিরাশা, একসঙ্গে সম্বন্ধ হইতে ওঠার কথা বলেছেন মিল সেখানে বলেছেন, 'the identity of political antecedents, the possession of a national history, and consequent community of recollections; collective pride and humiliation, pleasure and regret, connected with the incidents in the past.

জাতীয়তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে ভূমিগ এই বিশ্বাস অনিবারণ রেখেছেন— 'জাতীয়তাব বর্ণাশ্রমকতাত্তেই নিবদ্ধ নয়'। ভাষা এবং উচ্চারণসাদৃশ্য জাতীয়তাব সৃষ্টির বিশিষ্ট উপাদান হিসাবে স্বীকার করে নেবার পরও বিভিন্ন বর্ণের ও ধর্মের মানুষের মধ্যে জাতীয়তাব জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছেন। এদিক থেকে ভূমিগের সঙ্গে লোকের চিন্তাধারার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। প্রসঙ্গতঃ ধর্মগায়, লোকের Rationalism in Europe এবং Democracy and Liberty প্রভৃতি গ্রন্থের সাথে ভূমিগের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা স্বাভাবিক; হরদী থেকে পদক্ষেপ লেবা পরে লোকের প্রসঙ্গ তিনি মাঝে মাঝে উত্থাপন করেছেন (এ বিষয়ে কুমারসেব মুখোপাধ্যায় রচিত ভূমিগ চরিত্র গ্রন্থটি প্রস্তুত)। জাতীয়তাব সংবর্ধনের ক্ষেত্রে ভাষা ও বর্ণের গুরুত্ব থাকলেও এ দু'টি উপাদান অপরিহার্য নয়। ইতিহাসের উদাহরণ নিয়ে তিনি বলেছেন, বর্ণভেদ/ধর্মভেদ জাতীয়তাব সৃষ্টির ব্যাঘাতক নয়।

ইংল্যান্ডেও যেমন ধর্মভেদ জাতীয়তাবের ব্যাঘাত করিতেছে না, ভারতবর্ষেও সেইরূপ হইয়া আসিতেছে। [তদেব, জাতীয়তাব— ভারতবর্ষে মুসলমান]

বিভিন্ন ধর্মের ও বর্ণের মানুষের ঐক্যবদ্ধ অবস্থিতির জন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংহতি বিষয়ে ভূমিগ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি দেখেছেন, কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান একই ভূমিগে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংহতি স্বাভাবিকভাবেই অনেকটা সঞ্চিত হইতে উঠেছে, সুতরাং

...এখানে ভারতবাসী মুসলমানমাত্রকে আফগান, পারস্য, আরব, তুর্ক

সকল দেশের মুসলমান হইতে একটি বৈচিত্র্য প্রদান করিয়াছে—ই'হার আকারে প্রকারে ভারতবাসী হিন্দু'র যত সদৃশ হইয়াছেন বাহিন্দু কোন জাতীয় মুসলমানের আর তত সদৃশ নাই। আকার ই'কিত্তেও যেমন আচার ব্যবহারেও সেইরূপ। [অদেব, জাতীয়তাব—ভারতবর্ষে মুসলমান]

বাংলা এবং দাক্ষিণাত্যের হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংহতি ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনার যে অনেক বেশী স্পষ্ট, ভূদেব সে-বিষয় লক্ষ্য করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, অতি আধুনিক একটি গবেষণা-গ্রন্থ বাঙালী মুসলমানদের হিন্দুদের ভাষা-সংস্কৃতির নৈকট্য কিভাবে ক্রমশ এই শতাব্দীতে বৈরীমূলক দ্রষ্টে পর্ববাসিত হতে শুরূ করেছিল তার চিহ্ন উপস্থিত করেছেন :

The earlier nasihat namahs, written as late as the seventies of the nineteenth century, often, referred to the creator as 'Sri Sri Huq', 'Sri Sri Iswar' or 'Sri Sri Karim'. The increasing tendency now was to substitute such un-Islamic honorifics as 'Sri Sri' by 'pure' i.e. Arabic and Persian—Invocations such as 'Allahu Akbar' or 'Allahu Ghani'. The style of addressing a person also, showed the same trend, 'Sri', 'Srijuta' 'Sril Srijuta' of an earlier era giving way generally to such Arabicized honorifics as 'Janab', 'Munshi' and 'Maulavi'. (Rafiuddin Ahmed, The Bengal Muslims 1871-1905, O.U.P., 1981, p. 109.)

গবেষক রফিউদ্দীন আহমেদ মহাশয় আজিমুদ্দিন মুহম্মদ চৌধুরীর 'জীবনচরিত' (১৮৮৯) এবং মাজুউদ্দীন আহামদ বিরচিত 'আমার সংসার জীবন' (১৯১৪) এই দুই আশ্চর্য্য গ্রন্থের মধ্যে বাংলা শব্দ ব্যবহারের পার্থক্য প্রদর্শন করেছেন। দু'টি গ্রন্থই দু'জন নিষ্ঠাবান বাঙালী মুসলমানের রচনা। প্রথমেই গ্রন্থকার 'শ্রীশ্রী, শ্রীমান, খুড়া, পিসি, মবারক, কাকা প্রভৃতি বাংলা শব্দ ঐসলামিক নয় বলে বর্জন করেন নি, এমন কি বাঙালীর পোষাক খুঁটি ও চাদর ইসলামবিরোধী বলে বিবেচনা করেন নি। ষ্টিতশ্রী আশ্জীবনীকার ঠিক এর বিপরীত মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সচেতনভাবে দেশজ শব্দ এবং ভাবধারা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করেছেন, যদিও অচেতনভাবে তিনি সংস্কৃত রচনারীতিরই পোষকতা করেছেন। বাঙালী নাম ও পদবীর ক্ষেত্রেও পরবর্তীকালের বহু বাঙালী মুসলমানই ধর্মীয়

স্বাভাৱ্য অজ্ঞাতে আরব-পারস্যের দ্বারস্থ হয়েছেন। আর, একজন বাঙালী মৌলভী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দৃষ্টি করে বলেছিলেন :

In Calcutta the Hindus are called Bengalees by every Mahomedan who has never travelled beyond the Mahratta Ditch, as if such Mahomedans, by the fact of their professing the faith of the Great Arabian Prophet, have a right to be non-Bengalees (Ibid., p. 112)

গবেষক রফি আহমেদ মহাশয় গত শতাব্দীতে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দেশজ ভাবধারার ক্ষেত্রে যে ধর্মনিরপেক্ষ সম্মিলনপ্রয়াস লক্ষ্য করেছেন, যে প্রয়াস পরবর্তীকালে শুষ্ক হতে দেখেছেন, সে প্রয়াস যে হিন্দু ও মুসলমান সমাজকে নান্যভাবে নিকটতর করেছে, ভূদেব তা লক্ষ্য করেছেন :

এমন প্রদেশ নাই যেখানকার অধিকাংশ মুসলমান, জ্যোতির্বিদ এবং অপরাপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কিছ্রু সম্মান এবং সমাদর না করেন.. হিন্দুদিগের পর্বোৎসবে আমোদ প্রমোদ না করেন—যেখানে আপনাদিগের বিবাহাদি কার্যে প্রতিবেশী হিন্দুদিগের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ না করেন।

পরিভ্রমণের বিষয়, ভূদেব হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংহতি ও সম্মেলনের সূত্রপাত দেখে আগামী দিনের উজ্জ্বল একাবক ভারতবর্ষের রূপকল্পনার পুঙ্খানুপুঙ্খ হয়ে উঠেছিলেন, তার ঠিক বিপরীত দিকে ভারতের সাম্প্রদায়িক ভাগ্যচক্র আবর্তিত হতে শুরু করল। এর জন্য দায়ী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃগণ, এর জন্য দায়ী ভারতের পদা অর্থনীতি, নিশ্চল সমাজনীতি এবং সুবিধাবাদী রাজনীতি। একদা ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর যে বিভেদপন্থা বিষয়ে ভূদেব আমাদের সচেতন করেছিলেন সেই বিভেদপন্থার বিধি হিন্দু-মুসলমানের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে শাসকগোষ্ঠীর সযত্নসালিল অভিলাষ পূর্ণ করেছে আমাদের স্বদেশভূমি বিধ্বস্ত করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিভেদবোধ জাগ্রত করার কাজে শূদ্র ইংরেজ রাজপুত্রের কেন, স্বদেশীয় অনেক রাজনৈতিক নেতাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন। ভূদেবের জাতীয়তাব সংবর্ধনের সমন্বিত ও প্রয়োজনীয় আবেদন জনাচিত্র আকর্ষণে ব্যর্থ হয়েছে। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির সংবাদ বিরল ছিল; কিন্তু, পরবর্তী সময়ে অসম্প্রীতি অতি-দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ভূদেবের জীবনের শেষ দশ বছরের (১৮৮৩-৯৪) মধ্যে পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ,

আমানবিক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ শূন্য হয়। 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২) গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার এক বছর আগে কলিকাতার শহরভঙ্গীর শিম্পান্ডলে প্রথম সাম্প্রদায়িক অশান্তির সূত্রপাত ঘটে; আর, ভূদেবের মৃত্যুর (১৮৯৪) দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই (১৮৯৬-৯৭) টিটাগড়, গাডেনরীচ এবং টালায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। সুতরাং, ভূদেবের 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' গ্রন্থটিতে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত উৎসবের কল্পনা ও আদর্শ স্থাপিত হয়।

আর, শূন্য ভূদেব কেন এ বিষয়ে তাঁর উজ্জ্বল উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথের 'রাজা প্রজা', 'সমূহ' এবং 'কালান্তর' গ্রন্থের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণের পরও আমাদের জাতীয়চেতনা অসার হইতে রইল। রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের' সুমহান আদর্শ—'বিভিন্ন জাতির জাগারে জাতি একটি বিরাট হিয়া'—পক্ষশব্দ্যের শারিত্ব হয় নি? এক সময় আমাদের দেশ ছিল পরাধীন; তখন সাম্প্রদায়িক অশান্তি বৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে স্বার্থান্বেষী সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী ছিল সদাজাগ্রত। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক অশান্তি কবে অন্ত হয়? এখনও কেন জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিধাদান? যে 'এক রাজার শাসন' ও 'এক শাসনপদ্ধতি'র কথা ভূদেব বলেছিলেন, সেই এক রাজার শাসন তো বর্তমান; কিন্তু, দেশের সামগ্রিক কল্যাণের কথা বিস্মৃত হয়ে, নির্বাচন-বৈতরণীর অনারাস অভিক্রমণের স্বার্থে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সুযোগ ও শাসনের ভারত্ব্য সৃষ্টি করে, আমরা এক শাসনপদ্ধতির অবমাননা করে চলছি। এখনও আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন 'কোড বিল' তৈরী করে থাকি। হতাশার কথা, এখনও, প্রায় এক শতাব্দী পরেও, ভূদেবের আত্মবিক আবেদন প্রায়শ্চিক থেকে গেল।

আর আমাদের মধ্যে কি পূর্বের মত বিবাদ চলবে? আমরা কি চিরকালই জাতিবিবাদে আপনাদিগকে সর্বস্বান্ত এবং অপরের উত্তরপুরুষ করিব? (এই পর্বস্ত বলা হইলেই সভা হইতে 'না না'—'না না'—এই ধ্বনি উঠিল) কি অমৃতধারাই আমার কণে বর্ষণ হইল—। আমার কণে? আমি কে?—ভারতভূমির কণে—এ মৃতসঞ্জিবনী মন্ত প্রবেশ করিল। দেখ—ভীহার চক্ষু উন্মীলিত হইল—মুখখণ্ডে হাস্যপ্রভা দেখা দিল—তিনি মৃত্যুশয্যা হইতে উঠিলেন—এবং পূর্বের ন্যায় প্রভাস হইলেন। (স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

অমৃতবাজার পত্রিকা (১৮৬৮-৬৯)

ও শিশিরকুমার ঘোষ

অমর দত্ত

১

১৮৪০ খৃঃ যশোহর জেলার পল্লুরা-মাগুরা গ্রামে শিশিরকুমার ঘোষের জন্ম। পিতা হরিনারায়ণ ঘোষ যশোহরের লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন। শিশিরকুমার ও তাঁর ভ্রাতৃগণেরই অক্লান্ত পরিশ্রমে গ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, ডাকঘর, হাটবাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। কলুটোলা গাওঁ স্কুল (বর্তমানে হেমার স্কুল) হতে তিনি ১৮৫৭ খৃঃ কলিকাতা বিহারবিদ্যালয় বৃত্তিক গৃহীত প্রথম প্রবোধিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন এবং এক বৎসরের জন্য মাসিক ৮ হিন্দু স্কুল বৃত্তি লাভ করেন। এর পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে কিছুদিন ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা করেন। শিশিরকুমার উন্নীতশীল ব্রাহ্মদলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। অগ্রজ বসন্তকুমার ও হেমন্তকুমারের সঙ্গে তিনি ব্রাহ্মদলের উপাসনায় যোগ দিতেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের অবতারণায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি ব্রাহ্মদলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। এরপরে ১৮৭৯ খৃঃ নাগাদ তিনি মাদাম ব্রাভার্টিন্স ও কর্ণেল ওলকট প্রচারিত থিয়সফি বা ব্রহ্মবিদ্যাতে আকৃষ্ট হন এবং শেষজীবনে পরম বৈষ্ণব হন।

অগ্রজ বসন্তকুমার শিশিরকুমারকে প্রথম জনহিতকর কর্মে ব্রতী করেন। শিশিরকুমার লিখেছেন, “...যেমন কাদা দিয়া পুতুল গড়ে সেইরূপ তিনি আমাকে গড়িয়েছিলেন, ভালই গড়িয়েছিলেন।” শিশিরকুমারের সাংবাদিকতার প্রথম দীক্ষা হয় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত হিন্দু-পেট্রিট পত্রিকায়। ১৮৫৯-৬০ খৃঃ যশোহরের সংবাদদাতারূপে প্রধানতঃ M. L. L. স্বাক্ষরে নীলকরদের অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ করেন। শিশিরকুমারের জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী-সোদামিনী লিখেছেন :—“সেই সময়ে নীলকর সাহেবরা উত্তর অঞ্চলে মল্যায়ন—১

বড়ই অত্যাচার করে। সেই সময়ে সেজদাদা সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাদিগের দৃষ্ণের বিষয় বাহাতে গবর্ণমেন্টের শ্রুতিগোচর হয় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার নিজ নাম না দিয়া মনুজলাল বর্গিয়া আপন নাম দিতেন।”^২

অগ্রজ বসন্তকুমার ও শিশিরকুমার দেশবাসীকে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তুলিতে সংবাদপত্র প্রকাশের মনস্থ করেন। শিশিরকুমার কলকাতার একটি ছাপাখানার মালিকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে অমানুষিক পরিশ্রমে অল্পদিনের মধ্যেই অক্ষর সাজান ও কম্পোজ করা হতে ফর্ম ছাপানো পর্যন্ত সব কাজই একরূপ শিখে নিলেন। ১৮৬২ খৃঃ মার্চ ৩২ টাকায় সরঞ্জাম সহ একটি কাঠের পুরাতন প্রেস কিনে নৌকাযোগে যশোহরে প্রেরণ করলেন। গ্রামের ছুতারের সাহায্যে কাঠের মূদ্রাযন্ত্রটি যেরামত করে এবং গ্রামের কিছু যুবককে মুদ্রণকর্মে শিক্ষা দিয়ে ছাপার কাজ শুরুর হল। মাতা অমৃতময়ীর নামে ঘোষভাড়াগণ গ্রামে অমৃতবাজার নামে বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাতার নামকেই অনুসরণ করে মূদ্রাযন্ত্রের নাম হয় ‘অমৃত প্রবাহিনী বন্ড’ এবং পাব্লিক পত্রিকার নাম হয় ‘অমৃত প্রবাহিনী’। ১৮৬২ খৃঃ—১৮৬৩ খৃঃ পর্যন্ত যশোহর থেকে অমৃত প্রবাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল। সুপ্রাসক সোমপ্রকাশে অমৃত প্রবাহিনীর প্রশংসা করা হয়েছিল।

শিশিরকুমার কোলগুর ও সাতক্ষীরা স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ভূসেব মূখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে তিনি মধ্যবিভাগের ডেপুটি ইনস্পেক্টরের পদে নিৰ্বাচিত হন। ১৮৬৭ খৃঃ অগ্রজ বসন্তকুমারের মৃত্যুতে শিশিরকুমার অগ্রজ-গুরুকে হারিয়ে শোকে মহামান হন—সমসারেও বিপর্যয় দেখা দেয়।

যশোহরের তৎকালীন স্কুলে ম্যাজিস্ট্রেট শিশিরকুমারকে য়েহ করতেন। তিনি শিশিরকুমার ও তাঁর মধ্যম অগ্রজ হেমন্ত কুমারকে অধিকতর আয়ের ইনকাম-ট্যাক্স এসেসরের কার্বে নিযুক্ত করেন। ডেপুটি ইনস্পেক্টরের পদে ইন্তফা না দিয়ে অন্য কাজে যোগ দেওয়ার জন্য ভূদেব মূখোপাধ্যায় শিশিরকুমারের নামে অভিযোগ করেন—ফলে তাঁর দুই কাজই চলে যায়।

চাকরীর বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে শিশিরকুমার সাংবাদিকতাকেই জীবিকা, দেশসেবার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেন। মধ্যম অগ্রজ হেমন্তকুমারের সহায়তায় ‘যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী বন্ড’ হতে বাংলা সাপ্তাহিক-রূপে অমৃত বাজার প্রকাশিত হতে শুরুর করে। ১৮৬৮ খৃঃ ২০ ফেব্রুয়ারী (১২৭৪ সালের ১ ফাল্গুন, বহুস্পতিবার) পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। যশোহর হতে শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৪ অক্টোবর ১৮৭১। এর পর পত্রিকা

কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৭৮ খৃঃ ১৪ মার্চ লর্ড লিটনের 'ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' জারি হলে ২১ মার্চ থেকে পত্রিকা ইংরাজী সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়। আনুমানিক ১৮৮৬ খৃঃ পৰ্যন্ত শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ১৮৯১ খৃঃ ১৯ ফেব্রুয়ারী হতে সাপ্তাহিক অমৃতবাজার দৈনিকে রূপান্তরিত হয়।

অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশের সমসাময়িককালে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য একটি অংশের মনে ইংরেজের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মিলনের আকাংক্ষা প্রবল ছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা গেড়া থেকে এই মনোভাব পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিয়ে অন্য মশ্ত প্রচার করলঃ—“আমরা ইংরেজ হইতে স্বতন্ত্র, কাজেই আমাদের পরস্পরের আদর্শ এবং পন্থাও বিভিন্ন।”

পত্রিকাটির শিরোভূষণরূপে নিম্নলিখিত কবিতাটি শোভা পেতঃ—

অধীনতা কাল কুটে মরি হার্য।

করেছে কি আর্থ্য সূতে ঢেনা নাহি হার।

শিশিরকুমার নিজেই পত্রিকার নীতি নির্ধারণ ও সম্পাদনা করতেন। মধ্যম অগ্রজ হেমন্তকুমার, সুপ্রসিদ্ধ আনন্দমোহন বসু, যশোহর জেলা স্কুলের বাংলা শিক্ষক কল্যাণকৃষ্ণ ভট্ট ও ভদ্রাপতি কিশোরীলাল সরকার রচনা দিয়ে সাহায্য করলেও অধিকাংশ রচনাই শিশিরকুমারকেই লিখতে হত।

অভিজ্ঞাত শ্রেণী প্রভাবিত ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বিকল্প মধ্যবিন্ত প্রভাবিত ইন্ডিয়ান লীগের সঙ্গে শিশিরকুমার যুক্ত ছিলেন। জাতীয় রঙ্গালয় স্থাপনে তিনি সহযোগিতা করেছিলেন এবং কিছুদিনের জন্য উক্ত রঙ্গালয়ের একজন ডিরেক্টরও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

২

মফস্বলের প্রজাবর্গের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরা অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া এদেশীয় ও ইউরোপীয় বিবিধ সংবাদ, নূতন আইনের মর্ম, ব্রিটিশ ও এদেশস্থ অন্যান্য রাজ্যের শাসনপ্রণালী ও তাদের পরস্পরের দোষ-গুণ প্রকাশ করাও পত্রিকাটির লক্ষ্য ছিল। সংক্ষেপে বলতে হয় যে অমৃতবাজার পত্রিকা সমসাময়িক কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ফটোগ্রাফার ছিল।

বাঙালী সমাজের দোষত্রুটি প্রদর্শন করে শিশিরকুমার অনেকের অপ্রিয়

হয়েছিলেন। খেতাব সম্প্রদানের অন্যান্য ব্যবহার ও অনাচারের তীব্র সমালোচনা করায় পটিকা অনেক রাজপুরুষের চক্ষুশূল হয়ে গিয়েছিল। কিনেদহের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাইট সাহেবের নারীঘটিত দুর্বলতার কথা প্রকাশ করে অমৃতবাজার পত্রিকার ১৭শ সংখ্যায় (১২. ৬. ৬৮) 'ঘোর অত্যাচার' এবং ১৯শ সংখ্যায় (২৬. ৬. ৬৮) 'পাঠকগণের প্রতি' শীর্ষক দুইটি রচনা প্রকাশিত হয়। প্রথম রচনাটির জন্য সম্পাদক শিশিরকুমার ও মুন্যাকর চন্দ্রনাথ রায়ের বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয় রচনাটির জন্য ফৌজদারীর হেড ক্লার্ক রাজকৃষ্ণ মিশ্রের বিরুদ্ধে এক জটিল মানহানির মামলা রুজু করা হয়। সদা বিলাত প্রভাগত ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ আসামীদের ভ্রুক্ষে মামলা পরিচালনা করেন। এই মামলার রাজকৃষ্ণ মিশ্রের এক বৎসরের কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা জরিমানা হয়। চন্দ্রনাথ রায়ের ছয় মাস কারাদণ্ড হয় এবং শিশিরকুমার অব্যাহতি পান।

এই মানহানি বা লাইবেলের মামলা সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয় :^১

"আমাদের লাইবেল মকস্দমার এত গোল হইবার কারণ এই। যদি বাঙ্গালিরা একজন ইংরাজকে জখম করিতে পারে, তবে ইংরাজের 'প্রেসিডেন্স' আর থাকিবে না, অতএব সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, এরূপ কখন করিতে দেওয়া হইবে না, এক্ষণে ইংরাজ কর্মচারীদের এই রাজনীতি। এরূপ বাঙ্গালীদের প্রভর দিলে, আমরাইদের বাঙ্গলা শাসনের অনেক বাধা জন্মিবে, অতএব একটি রাজ্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই একটু কুকর্ম করার দোষ নাই—এইরূপ তর্ক করিয়া অনেক প্রকৃত সৎ ইংরাজও এইরূপ উকৃত বাঙ্গালিদগকে খবর করিবার নিমিত্ত জুটবন্ধ করেন। এরূপ রাজনীতি ভাল কি মন্দ, আমরা কিছু বলিব না, আমরা কেবল রোজ রোজ যাহা হইতেছে তাহাই লিখিতেছি।..

"রাইট সাহেবকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনেক ইংরাজ দলবদ্ধ করেন। হাইকোর্টে এক্ষণে মকস্দমার আপীল হইতেছে, সুতরাং তাহার নিশ্চয় থাকুন, মকস্দমার চড়াও নিষ্পত্তি হইয়া গেলেই, তাহাদের নাম ও ব্যবহার যে প্রকাশ করিলাম না, এ চুট সৎশোধন করা যাইবে।"

ম্যাজিস্ট্রেট মন.রা যশোহর জেলার কিনেদহ সার্ভাইসনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাইটের বিষয়ে বখাबথ অনুসন্ধানের জন্য আসামী পক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিতে অনুরোধ করেন। আসামী পক্ষ কাগজপত্র দেয়,

বিচার কার্যের সুবিধার জন্য আসামী পক্ষ রাইটকে সাময়িকভাবে বিনেদহ থেকে স্থানান্তরিত করার আবেদন জানায়, কিন্তু সেই আবেদন মঞ্জুর হয় না ; বরং গভর্ণমেন্ট রাইট সাহেবের ব্যয়ভার গ্রহণ করেন । রাইট সাহেবের সাক্ষীদিগের পাণ্ডের ব্যয় ১০০০ টাকা গভর্ণমেন্ট দিলেন, অন্যদিকে জর্জ লফোর্ড আসামী পক্ষের দাবতীর খরচ আসামী পক্ষকে বহন করার আদেশ দিলেন । রাইট সাহেব মকদ্দমা করার জন্য ছুটি পেটলেন—২০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ পেটলেন । আসামী পক্ষের দুইজনের কারাদণ্ড হল । এরপর রাইট সাহেব বিনেদহ থেকে বদলী হয়ে মেদিনীপুরে গেলেন ।

উক্ত বিষয়ে অমৃতবাজারের একটি রচনায় মন্তব্য করা হয় : “গভর্ণমেন্ট কি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন ? আসামীদিগের জন্যে, রাইট সাহেবের জন্যে, ও সমাজের জন্যে এটি করা গভর্ণমেন্টের নীতান্ত্র উচিত, কারণ আমরা দুর্ভাগ্য হইয়া ব্যস্ত করিতেছি যে এই মকদ্দমায় গভর্ণমেন্টের ও ইংরেজদিগের সাধারণ্যে একটি ভয়ংকর অখ্যাতি হইয়াছে । এই অখ্যাতি এইরূপ একটি বিশেষ অনুসন্ধান না করিলে ঘাইবে না । আর আমরা এই সময়ে সম্পাদকগণকে সান্দ্রনে নিবোধিতোছি যে, তাহার। এই বিষয় লইয়া একটু আন্দোলন করুন । আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে এই বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক ও এ বিষয়ের অনুসন্ধান হইলে এরূপ সমুদায় ঘটনা বাহির হইবে যে পৃথিবী সমেত লোক অবাক হইবেন ।”

ইংরাজেরা ভারত ত্যাগ করে গেলে ভারতবাসীদের দৃশ্যশার অস্ত থাকবে না, কেননা ভারতবাসীরা স্বাধীনতা লাভের অনুপমুত্ত—ইংরেজ রাজপুরুষদের এবং একশ্রেণীর শিক্ষিত ভারতবাসীর অনুদ্রুপ মনোভাবের প্রতিবাদ করে ‘ইন্ডিয়ান ডেলি নিউস এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা শীর্ষক’ প্রবন্ধে অমৃতবাজারে লেখা হয় : “

“ভারতবর্ষেরই প্রকৃত স্বাধীনতা পাইবার উপমুখ হইবে ।’ ইহা কি কখনও হইয়া থাকে ? স্বাধীনতা শিখিবার পুস্তক ইতিহাসও নয়, রাজনৈতিক বিজ্ঞানও নয় । স্বাধীনতা শিখিবার পুস্তক স্বাধীনতা । আমরা না শত শত ইংরাজী পুস্তকে পড়িয়াছি যে, অনেক দিবস পরাধীন থাকায় বাঙ্গালির মধ্যে দুর্বদলের যত দোষ অর্থাৎ মিথ্যা কথা, প্রকল্পনা, ভীরুতা, নীচ প্রবেশ করিয়াছে ? আমরা না পড়িয়াছি যে, রোমানেরা যখন ইংলণ্ড প্রথমে আক্রমণ করে, তখন অধিবাসীরা অত্যন্ত সাহস ও বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে, চারিশত বর্ষ পরে যখন রোমানেরা ঐ দেশ পরিত্যাগ করিয়া আইসে, তখন ব্রীটিশ জাতি

এরূপ হীনবল হইয়াছিল যে, তাহাদের চেয়ে অনেকগুণ নিকৃষ্ট পিকট্ জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই? তাহারা ত রোমানদের কঠোর সুসভ্য হইয়াছিল? মুসলমানদের কি ইংরাজদের অধিকার অগ্র আমরা কাহার দ্বারে ২ খোশামোদ করিয়া বেড়াইতাম 'ওগো তোমরা অনুগ্রহ করিয়া আইস, আমাদের দেশগুলি শাসন করও আমরা নিষ্কটকে লাঙ্গল চাষিব?' "

স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছাই সিপাহী যুদ্ধ বা মহাবিদ্রোহের কারণ হিসাবে উল্লেখ করে উক্ত প্রবন্ধে বলা হয় :

"স্বাধীন থাকিবার ইচ্ছা মনুষ্যের স্বাভাবিক। এইজন্য দাসেরা মাঝে মাঝে জুঠিয়া যুদ্ধ করিয়াছে, এই নিমিত্ত ১৮৫৭/৫৮ সালে যে ২ ল্হলে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেখানে কি কেহ আর একশত বর্ষের মধ্যে মাথা তুলিতে পারিবে ইংরাজেরা কি এই রূপে আনাদিগকে স্বাধীনতার উপযুক্ত করিতেছেন? সমস্ত দেশ নিরস্ত করিয়াছেন, এ বুদ্ধি আর একটী উপায়। এটী নিশ্চিত যে, পরাধীন অবস্থায় আমাদের যত সময় বাইতেছে, রোগ ততই অসাধ্য হইতেছে।"

মহারানী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণের সময় যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তার মধ্যে দুইটি প্রতিশ্রুতি উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হল, আইনের চোখে স্বেতাক্ষ ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয় প্রজার সমানাধিকার; দ্বিতীয়টি হল, যোগ্যতা অনুযায়ী সমস্ত ভারতীয় প্রজাই উচ্চ রাজস্বদের অধিকারী। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মহারানীর প্রতিশ্রুতি প্রায়ই লঙ্ঘিত হতে থাকে। বিশেষ করে আই সি. এস. পরীক্ষার ভারতীয়দের পক্ষে অসুবিধাজনক বিবিধ শর্তাবলী আরোপ করা হতে থাকে। এমন কি ভারতীয়দের যোগ্যতা নিয়েও পাঁচলিমেটে আলোচনা হয়। অমৃতবাজার পত্রিকার 'সিবিল সার্ভিস' শীর্ষক এক প্রবন্ধে বলা হয় :

"সিবিল সার্ভিস লইয়া সম্প্রতি পারলিমেণ্টে আবার অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। ফস্টে সাহেব একথা প্রথমে উপস্থিত করেন।.....সার জন নর্থকেটে সম্প্রদে করিয়াছেন, বাঙ্গালী সিবিলিয়ান হইলে তাহারা তাহাদের অধীনস্থ ইংরাজদিগকে শাসন করিতে পারিবেন না। এক্ষণ পারে না, সে ঠিক, কিন্তু সে কি জন্য? ইংরেজদের মানসিক ক্ষমতা আছে বলিয়া নয়, এরূপ করিতে গেলে বেচারি বাঙ্গালির চাকরিটুকু যায়।.....ভারতবর্ষেরা যদি বিবিধ বিবাহ করতে যায়, তবে বটে তাহাদের সাহেব হওয়ার আবশ্যক করে এবং বিবিধ জোচে বিলাত যাওয়ার প্রয়োজন করে, কিন্তু ভারতবর্ষেরা শাসন করিবে ভারতবর্ষ, ঈশ্বর তাহাদের সেইরূপ উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেখানে

তাহাদের ইংলণ্ডে যাওয়ার দরকার? ভারতবর্ষেরা যদি কোর্ট গুণ নিকৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও তাহারা ভারতবর্ষকে শাসন করিবার উপযুক্ত থাকিবে।
 আমাদের নীতিজ্ঞান নাই? দয়াবান, প্রজা বৎসল, স্বাধীনতা, নিরপেক্ষ, সরল, ইংরাজেরা কি সং? তাহাদের রাজশাসন প্রণালী কি ক্রমবিকাশিত পরিপূর্ণ? এদেশের নিম্নশ্রেণীস্থ কর্মচারীগণ বটে উৎকোচ গ্রহণ করে কিন্তু তাহাদের যে দৃষ্টান্ত করিয়া রাখিতেছেন, তাহাতে তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে রাজপুরুষগণের লজ্জা বোধ হয় না? লজ্জা আছে কোথা, যে লজ্জা বোধ হবে, থাকিলে আমাদের আর এরূপ দৃষ্টান্ত হইত না।
 ইংরাজেরা এদেশটিকে তাহাদের উপনিবেশ মাত্র ভাবেন, আমরা হইয়াছি তাহাদের কণ্টকস্বরূপ। আমরা আবার ভাবি যে, এদেশটী আমাদের; ইংরাজেরা বিদেশী, তাহারা এক্ষণে রাজত্ব করিতেছেন, আজ হউক কাল হউক, একদিন অবশ্যই উহা পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। ইংরাজেরা ভাবেন যে সিডিল সারবিশে ভারতবর্ষের প্রবেশ করিবে, তবে আমাদের সমুদ্র পার হইয়া আসার ফল কি? ভারতবর্ষের গণ! নিজের অবস্থার প্রতি একটু দৃষ্টিপাত কর, এক্ষণ সমস্তটা কণ্ড মন্দ বোধ হইতেছে।"

সামন্তজ্ঞের চূড়ান্ত অবস্থার যুগে, অরাজকতার পটভূমিকায় ইংরেজের ভারতবর্ষের সম্ভব হয়েছিল। ইংরেজ শাসনে ল অ্যান্ড অর্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ রাজপুরুষেরা সচেতনভাবে ভারতবাসীদের মধ্যে, বিশেষ করে ইংরেজ শাসনে স্বেচ্ছা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে ইংরেজ শাসনের সম্পর্কে একটা মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। সেই মানসিকতা হল, 'ইংরেজ শাসনে এদেশের শৃঙ্খলা আইন-শৃঙ্খলারই উন্নতি হরনি, অর্থনৈতিক উন্নতিও হয়েছে।' অমৃতবাজার পত্রিকায় উক্ত মানসিকতার নিন্দা করে সম্পাদকীতে বলা হয় : "

"ইংরাজেরা সাধারণত বলিয়া থাকেন যে, তাহারা ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের নিমিত্ত শাসন করিতেছেন। ভারতের যে আর তাহা ভারতের কার্যে ব্যয় হইতেছে; অতএব তাহারা ভারতের নিমিত্ত যে পরিশ্রম করেন, তাহা তাহাদের স্বার্থে ধরিতে গেলে পণ্ডিত্রম মাত্র।

"সাধারণ লোকে ইহা কিছু বিশ্বাস করে না, যেহেতু ইহা তাহাদের সহজ জ্ঞানের বিপরীত; বরং একথা বলিলে তাহারা হাস্য করিবে যে, ইংরাজেরা আমাদের দেশ শাসন করিতেছেন অথচ ইহাতে তাহাদের কিছু লাভ হইতেছে না।"

"প্রকাশের ও পরোক্ষে কার্য করা এখনকার কালের লক্ষণ।" পূর্ববর্

ক'বিরাজেরা পরিগ্রহের মূল্য ছাড়া ঔষধ জন্য যে মূল্য লইতেন, তাহা সাক্ষাৎভাবে লইতেন। এখন স্বহস্তে ঔষধ বিক্রয় না করিয়া একথান ব্যবস্থাপক লিখিয়া দেন এবং সেই ব্যবস্থা পত্রের যোগে ঔষধালয় হইতে ঔষধ ক্রীত হইয়া থাকে। পূর্বে আদালতের বিচারকের বেতন হাত হাতে লইয়া বিচার কার্য করা হইত, এখন সে বেতন দেওয়া হয় স্ট্যাম্পের দোকানে। পূর্বে নজর সেলামি ইত্যাদি নানা রূপ স্পষ্ট নামে কর প্রেরণ করা হইত, এখন আবকারী শুল্ক ইত্যাদি নানা উদ্ভট উপায়ে কর আদায় হইয়া থাকে। ইংরাজেরা যে বলেন তাহারা আমাদের দেশ শাসন নিবন্ধন কোন রূপ অর্থ লাভ করেন না, যদি অর্থ লাভের অর্থ টাকা নেওয়া দেওয়া বৃকায়, তবে তাহারা এক রকম কোন অর্থ লাভ করেন না বটে। কিন্তু উপরে আমরা বলিয়াছি যে, কোন দেশের আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশী হইলে সেখানে ধনবৃদ্ধি হয় ও সেই সঙ্গে ২ প্রবাদি মহার্ঘ হয়, ও যে পর্যন্ত রপ্তানী কমাইয়া দেশে প্রবাদি সুলভ না করা যায়, সে পর্যন্ত দেশের ক্ষতি হইতে থাকে, বাহ্যতে উত্তরূপ টাকা আগমের প্রতিবন্ধক ঘটায় তাহা উক্ত ক্ষতির কারণ বলিতে হইবে।

“গবর্নর জেনারেল অবধি আরম্ভ করিয়া সমুদয় সিবিলাইজেশন, সৈনিক কর্মচারীগণ, ইংরেজ ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, লালবাজারের সামান্য খালাসী পর্যন্ত প্রতি বৎসর যত টাকা ইংলণ্ডে পাঠান, তাহাতে ভারতের ধনের বিস্তার অংশ লোপিত হয়, এরূপ লোপণে যতদূর হউক না কেন ভারতবর্ষের তত ক্ষতি নাই। কিন্তু ইহাতে ভারতবর্ষের অর্থ কমিয়া প্রবাদি সুলভ হইয়া পড়ে ও কাজেই ভারতবর্ষীদের বহু ক্রেশ ও আশ্রাস জাত গানা প্রব্য ও সামগ্রী উল্লিখিত টাকার প্রায় সম পরিমাণে বাহির হইয়া যায়। এই ইংলণ্ডের প্রকৃত লাভ ও আমাদের ক্ষতি। এদেশ হইতে ইংলণ্ডে যত রপ্তানি হয়, ইংলণ্ড হইতে এখানে রপ্তানি তাহা অপেক্ষা অনেক কম। স্বাভাবিক স্বাধীনভাবে যদি বাণিজ্য চলিত, তাহা হইলে রপ্তানির আধিক্য ভাগের মূল্যের টাকা এদেশে আসিয়া সমুদয় প্রব্যের এরূপ মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিত যে যে সকল প্রব্য স্বদেশোপেক্ষা সুলভতর বলিয়া ইংরাজগণ এদেশ হইতে লইজেছেন, তাহা অনেক প্রকার প্রব্য লইতে তাহাদের ক্ষান্ত পড়ে হইত। কিন্তু এখন এরূপ টাকা আনা দূরে থাকুক, ভারতবর্ষকে আরও সুন্দর পরিমাণে ফাঙ্কিল দিতে হইজেছে।

“আবার অধিকন্তু ভারতবর্ষীদের না আছে কল, না আছে বল। এমত অবস্থায় তাহাদের উপর কি সামান্য অত্যাচার হইজেছে? ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড উভয়ের বাণিজ্য দ্বারা এখন অপেক্ষা অধিক লাভ হইত।”

অমৃতবাজার পত্রিকায় গ্রাম বাড়লার মানুষের দুঃখ দুর্দশার নিখুঁত চিত্রায়ণ আছে। ‘এদেশীয় দরিদ্র লোকের অস্থা’ শীর্ষক এক প্রবন্ধে বলা হয় :—

“চৈত্র হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত পল্লিগ্রামে লোকের অবস্থা প্রকৃত শোচনীয়। এমন একটী গ্রাম নাই যেখানে শতকে ২৫টি পরিবারের সচ্ছল পুৰুষক আহার চলে, ৫০ ঘরের প্রায়ই দুঃস্থ আহার চলে না। এবং ২৫ ঘর লোক বোধ করি একরকম মাস প্রকৃত কোন দিন উদর পূর্তি করিয়া চারিটী অন্ন পায় না। পল্লিগ্রামে যাহার কিছু সত্তি আছে, তাহার বাড়ী একরকম মাস মধ্যাহ্নে প্রভাহ কানালী বিদায় উপস্থিত হয়। লোকে ক্ষুধায় এমন কাতর হইয়া আইসে যে, অনেক সময় মূখের ভাত কেড়ে খেতে উদ্যত হয়। প্রকৃত তাহাদের অবস্থা দৃষ্টি করিলে বুক ফেটে যায়। অস্বাভাবে শরীর ক্রীড়, পরিধান মলিন, শত গ্রন্থীযুক্ত বস্ত্র, তৈল অভাবে বিশেষ বিছানা না থাকায় মৃত্তিকায় শয়ন দ্বারা শরীর দিয়া ভস্ম উঠিতেছে ও মাথার চুল সমুদয় জট হইয়াছে। দুঃখ মগ্ন, বিমর্ষ এবং এইরূপ প্রত্যেক গ্রামে ২০/৩০ মনুষ্য পাওয়া যায়।……ইহাদের দুঃবস্থা বরাবর দেখা অভ্যাস আছে বলিয়া চক্ষু দেখা যায়। কিন্তু ভদ্রলোকের কণ্ঠের কথা মনে করিলে চক্ষুর জল আইসে।”

“ভদ্রলোকের বৎসরে বাহা কিছু আয় হয়, এই সময় নিঃশেষ হইয়া যায়, শূন্য সত্তিও ধন নিঃশেষ হয় না, পেটের দ্বারে দুখানি একখানি করিয়া পরিবারস্থ স্ত্রীগণের অলংকার বাসন দোকানদারের ঘরে নীত হয়। যে পর্য্যন্ত জল পানীয় ঘটীটী থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের আশা থাকে, মুখে একটু হাসি থাকে, শরীরে জীবনের চিহ্ন থাকে, কিন্তু ক্ষুধা মানে না, কিছুই বুঝে না, শেষে সম্প্রাপ্ত অর্বাশিষ্ট পানীয় পাটটী, এমন কি নব প্রসূত বাচ্চকের হাতের রূপার বালা দুগাছা পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়া যাবৎ শ্বাস তাবৎ চিকিৎসা করে শেষে আর কিছুই নাই।……আমরা বাহা লিখিতেছি তাহা যে অনেক ভদ্র গ্রামের অবস্থা সে বিষয় আমরা নিশ্চয় জানি। আমাদের দেশে যে দারিদ্র্য রাক্ষস প্রবেশ করিয়াছে এবং শত শত ভদ্র অভদ্র পরিবারের সুখ শান্তি বিসর্জন দিতেছে, সে বিষয় যিনি যে কোন দলখানি পল্লিগ্রাম ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহারই মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে।

“……গবর্ণমেন্ট দরিদ্র লোকদিগের জীবন উপায় না করিলে এরা কাহার কাছে যায়। কিন্তু আমাদের রাজপুত্রবংশের সকল বিষয়ে মনোযোগ আছে, মূল্যায়ন—১০

কেবল প্রজার দ্রবস্থা দ্রুত করা বাতীত, কোন গৃহে সিঁদ চুরি হইয়াছে শুনিলে তখনই রাজপুত্র-বংশের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া যায় তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কিংবদন্তি পরিমাণে অর্থব্যয় ও মনোযোগ দেওয়া হইত।... কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, লোক যেখানে ২ অন্ন ২ করিয়া বেড়াইতেন সে বিষয় কেহ ভ্রমসংগত নয়। দুর্ভিক্ষে উড়িষ্যার সহস্র ২ লোকের মৃত্যু হওয়ার ইংলিস গবর্ণমেন্ট ভারি লক্ষিত হন, তাহাদের এ বিষয়ে দেশে ঘড়ি কলঙ্ক হয় সেই অবধি আমরা শুনিয়াছিলাম যে লোকে অস্বাভাব্য আর কষ্ট না পার তখনই রাজপুত্রেরা মনোযোগী হইয়াছেন। কিন্তু তবে লোকের এ দ্রবস্থা কেন? যখন উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে মনুষ্য সমুদয় হা অন্ন নাই, অন্ন করিয়া অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিতেছিল, ওদিকে সেই সময় আগরার দরবারের মহা ধর্ম।.....”

অম্ভবাজার পট্টকার গ্রাম বাঙালার মহাজন শ্রেণীর অর্থনৈতিক শোষণের উল্লেখ আছে। ‘মহাজনের অত্যাচার’ শীর্ষক এক প্রবন্ধে বলা হয় :—

“.....আমাদের দেশে শূদ্র অভিশ্রম বেশী। ইউরোপে, এমিরিকায় উচ্চতম শূদ্র শতকরা ১০ আনা (আট আনা) করিয়া, ১০ আনা (চার আনা) করিয়া পাওয়া যায়। এখানে সচরাচর টাকা লইতে গেলে ৩৯ আনা শূদ্র দিতে হয়। পল্লিগ্রাম মাঠেই প্রায় এই নিয়ম। নগরে আবার এরূপ নয়, সেখানে লোকের প্রয়োজন বুঝিয়া শূদ্রের তারতম্য হয়। শতকরা ১ টাকা শূদ্রের টাকা পাওয়া যায়, আবার কখন শতকরা ৫০০ টাকাও শূদ্র দিতে হয়।.....কিন্তু সহরের ব্যবসায়ের বিষয় লইয়া অদ্য আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। দরিদ্র প্রজাদিগের শূদ্রের সংগতি হওয়ার একটী প্রধান কটক মহাজনেরা। অল্প, অধিক, অপব্যয়ী ও দরিদ্র প্রজারা ধার পাইলে আর শূদ্রের দিকে তাকায় না। মহাজনেরা তাহাই বুঝিয়া ইচ্ছামত শূদ্র নিরুপল করে। এ বৎসরের টাকা আগত বৎসরে যদি না দিতে পারে, তবে মহাজনেরা শূদ্রের টাকার আর একখানা খত লয়। এক্ষণে শূদ্রের শূদ্র চলিল। এইরূপে পিতার ধার পূরণে পরিশোধ ও পিতার টাকা পূরণে আদায় করে। প্রজার ধনের সঙ্গে ২ দেশের শস্যের বৃদ্ধি হয়, ও প্রজার দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে শস্যের হ্রাস হয়। এরূপ অবস্থায় মহাজনাদিগের হস্ত হইতে প্রজাদিগের অব্যাহতি দেওয়ার কোন উপায় করা নিতান্ত কষ্টব্য।.....”

মহাজনদের হাত থেকে প্রজাদিগের নিষ্কৃতির জন্য গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে উক্ত প্রবন্ধে বলা হয়েছে :—

“যখন দেশে টাকা সস্তা হয়, তখন দেশে শূদ্রও সস্তা হয়।...অতএব কোন

আইন কাননের দ্বারা এ সুদ কমাইবার বো নাই, তবে যদি জেলায় জেলায় এক একটী ব্যাংক করা হয়, তবে প্রজাদিগের মহোপকার হয়, অথচ টাকাও রাল্লাদিগেরও লাভ হয়, কিন্তু এ ব্যাংক করে কে? অবশ্য গবর্ণমেন্ট নয়, গবর্ণমেন্টে নিজে টাকা পাইলে কলঙ্ক করেন। আর সকল বিষয়ের নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত নয়। আমাদের দেশের মধ্যে অনেক সুশিক্ষিত লোকের মনে এক্ষণে ব্যাবসায় করিবার ইচ্ছা হইতেছে, তবে ইহারা অনেক চাকুরে ও ইহাদের মূলধন কম বলিয়া টাকা ফেলিয়া রাখিতে বাধ্য হন। ইহারা জুঠিয়া যদি পল্লিগ্রামে একটী ব্যাংক করেন, এবং সম্ভা সুদে টাকা দেন, তবে দেশের বিস্তর উপকার করিতে পারেন, তাহারাও বিস্তর লাভ করিতে পারেন।

অভিজ্ঞাত শ্রেণী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভোগবিলাসে ব্যরিত হয়ে আত্মোৎকর্ষের অন্তরায় হয়ে ওঠে, দরিদ্র শ্রেণীর জীবনব্যাপী অগ্রচিন্তা আত্মোৎকর্ষের অনুকূল নয়। অনুরূপ অবস্থায় মধ্যবিস্ত শ্রেণী আত্মোৎকর্ষের সাহায্য সুযোগ আছে, কেননা এই শ্রেণীর ভোগ-বিলাস জনিত চ্যুতি অথবা অগ্রচিন্তার ঘণ্টনা থাকে না। মধ্যবিস্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করে অমৃতবাজার পত্রিকায় ‘মধ্যবিস্ত সম্প্রদায়ের অপলোপ’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছে :^{১১}

“জন সমাজের এ সম্প্রদায়ী লোকগল্লী দেশের প্রজার স্বরূপ। যত দেশের যতরূপ উন্নতি ও যতরূপ শৃঙ্খলার পরিবর্তন হইরাছে, মধ্যবিস্তগণ প্রায়ই তাহার সারাংশ বহন করিয়াছেন।

“এদেশের সৌভাগ্য অনেক অংশে এই দলস্থ লোকের উপর নির্ভর করে। যদি কোন কালে এদেশে কোন রূপ সামাজিক কি অন্য কোন বিপ্লব হয়, ইহাদের দ্বারাই তাহা সম্পাদিত হইবে। এখন দেশেতে যত রূপ শৃঙ্খল কাৰ্য্যের উদ্যোগ হইতেছে, তাহা ইহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এই মধ্যবিস্ত সম্প্রদায়কে রক্ষা ও পোষণ করা দেশহিতৈষী রাজার অতি কর্তব্য। কিন্তু এ দেশে ক্রমে এই শ্রেণীস্থ লোক অপলোপ প্রাপ্ত হইতেছেন।

“মধ্যবিস্ত লোকের দুইটী জীবনোপায়, ভূমি সম্পত্তি এবং চাকুরী এবং ইল্লাজ শাসন প্রভাবে দুইটীই ক্রমশঃ অক্ষয়ন করিতেছে।”

“.....মধ্যবিস্ত লোকগণ প্রায়ই গাতিদার। পুৰুষ জমিদার প্রজার আত্মীয়তা ও সম্প্রীতি ছিল, সুতরাং উভয় উভয়ের দুঃখদرد বৃদ্ধিভেদ।

গোত্রকুল দেখা হইয়া থাকে সেইরূপ হউক, কেবল পাঠ্যটি বিধবা হইবে। ব্রাহ্মণ কন্যার হাতে ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ কন্যার হাতে কায়স্থ অন্ন খাইবে ইহাতে কেন জ্ঞাতি যাইবে? বেশ্যা গমনে, উপপত্নী রাখিলে, বাড়িচারে আমাদের দেশে জ্ঞাতি যায় না, ইহাতে জ্ঞাতি গেলে কয়টি লোকের জ্ঞাতি আছে?.....এই সহস্র সহস্র বিধবা নারীর দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া এদেশীয়গণের বুক পাষাণ হইয়া গিয়াছে। আর তাহাদের এক্ষণে তত দৃশ্য বোধ হয় না। কিন্তু তাহাদের বুক পাষাণ হইয়াছে বলিয়া, বিধবাগণের দৃশ্য কমে নাই। তাহাদের সেই আশ্রয়াদ বরাবর সমান রহিয়াছে। লোকে টের পায় না, কিন্তু দৃশ্যমানলে দৃশ্য হইয়া তাহাদের হৃদয় অসার হইয়া যাইতেছে। তাহাদের চোখের জল তাহারা চোখে নিবারণ করে বলিয়া রক্তা, নতুবা তাহারা যদি মনের দৃশ্য বলিতে জানিত, তবে কত কঠিন পাষাণ গলিয়া যাইত।"

৩

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ শাসনের আধীনে আসে। ভারতবর্ষের রাজ্যকে ব্রিটিশ পুঞ্জির শোষণের উপবৃত্ত করে তোলায় জন্য নানাবিধ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বহুল পরিমানে উন্নত করা হয়। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কল্যাণে ব্রিটিশ পুঞ্জির শোষণের জাল সুদূরতম গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় অন্যদিকে পেশাগত আয়ের উপর নির্ভরশীল ইংরাজীতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যা ও প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই মধ্যবিত্তদের অনেকেই গ্রামাঞ্চলের গাঁতিদার অর্থাৎ ছোট ছোট জমিদার মালিক। বিদেশী শাসনে এই মধ্যবিত্ত বা পেটি-বুর্জোয়াদের আর্থবিকাশ ও জীবিকার সুযোগ ক্রমশই সীমিত হতে থাকায় এই শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। প্রতীকার বুর্জোয়া জীবনাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী দরিদ্র মানুষ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও শ্রেণীগত অবস্থানের জন্য জমিদারী প্রথা অবসানের দাবীতে মোড়ার না হলেও জমিতে প্রজাম্বব প্রতীক্ষার স্বপ্নেট পরিমাণে সরব হয়ে ওঠে। বিদেশী শাসনাবধানে এই শ্রেণীর শ্রেণীগত অবস্থান বৈত-চারিত্রের উদ্দীপক হয়ে ওঠে। এই বৈতত্যজনিত কারণে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিরোধ আন্দোলনের সক্রিয় নেতৃত্বদানের ঐতিহাসিক ভূমিকা এই শ্রেণী পালন করতে পারে নি, কিন্তু নৈতিক সমর্থনদানে কিংবা নিয়মতান্ত্রিক পথে দেশের দুঃখদর্শনা মোচনে এদের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। শাসক সম্প্রদায় সম্পর্কে এই শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ এতটাই ঠিকসেই বর্ণনামূলক ছিল।

দক্ষিণাফ্রিকা মোচনের প্রথম শর্ত জেনেও শাসকের সহযোগিতার প্রতি এই শ্রেণীর কিঞ্চিৎ দুর্বলতা সুস্পষ্ট ছিল।

উপনিবেশে বৃজেরিয়া জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশে ঐতত্ত্ব একটি অনিবার্ণ বৈশেষিক লক্ষণ। বাল্লার নবজাগরণ এই ঐতত্ত্বার্জনিত কারণে সীমায়িত—রুরোপীয় নবজাগরণের মত পূর্ণ অবয়ববস্ত্র নয়। উনিশ শতকের প্রথমে এই সীমায়িত নবজাগরণ কলকাতা-কেন্দ্রিক ছিল—উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই নবজাগরণের প্রভাব মফস্বল সহরে ত বটেই, এমন কি অনেক গ্রামাঞ্চলেও অনুভূত হতে থাকে।

অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রেণীচরিত নির্ণয় করতে গেলে বলতে হয় যে উক্ত পত্রিকা বৃজেরিয়া জাতীয়তাবাদী চিন্তাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত মফস্বলের পেটি-বৃজেরিয়াদের মতপত্র। উল্লিখিত ঐতত্ত্বার লক্ষণ উক্ত পত্রিকায় বর্তমান। তবুও পত্রিকাটির কতকগুলি ইতিবাচক দিক আছে।

এই পত্রিকার ইংরাজ শাসন সম্পর্কে মোহন্তস্ময় সুস্পষ্ট প্রকাশ আছে। একাধিক প্রবন্ধে একই সঙ্গে ইংরাজ শাসনের প্রশংসা ও সমালোচনা আছে—তবে সমালোচনার দিকটি প্রবলতর হওয়ার পত্রিকাটির ইতিবাচক দিকটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পত্রিকার শিরোনামে এবং একাধিক প্রবন্ধে এদেশের পটভূমিকা স্বাধীনতার ইতিবাচক দিকগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বৃজেরিয়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত স্বাধীনতা অথবা প্রশাসনের দেশজকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণের স্বচ্ছতা-জনিত কারণে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগণ চিহ্নিত সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) অমৃতবাজার পত্রিকার কাছে নিছক পুরাতন ক্ষয়প্রাপ্ত সামগ্র্য প্রচুরের নেতৃত্বাধীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিদ্রোহ নয়, উক্ত বিদ্রোহের মধ্যে অন্তর্মলিলা নদীর মত প্রবহমান ছিল সিপাহীদের স্বাধীনতা অর্জনের স্পৃহা—উনিশ শতকের ছয়ের দশকে সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গী পত্রিকাটির প্রগতিশীলতার দ্যোতক। মহাবিদ্রোহ দমনে বিদেশী রাজধানীর অব্যবহৃত নিপীড়নের ব্যাস্তক সমালোচনার এবং পরাধীন অবস্থার বিলম্বিত কারণে রোগ অসুখ হওয়ার উল্লেখ পত্রিকাটির ইতিবাচক দিকটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যশোহর থেকে প্রকাশিত অমৃতবাজার পত্রিকাটি সম্ভবতঃ প্রথম স্বাধীনতার প্রগতি সরাসরিভাবে উত্থাপন করেছে।

অমৃতবাজার পত্রিকার ইংরেজ শাসন ও ভারতবাসীর মধ্যকার মূল বিরোধটি সঠিকভাবেই তুলে ধরে চলেছে। 'সিডল সার্বভূম' লিখিত

আলোচনায় ভারতবর্ষকে সরাসরিভাবে উপনিবেশ বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং উচ্চ চাকুরীর ভারতীয়করণে ইংরাজদের অর্থনৈতিক স্বার্থ বার্তা হতে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইংরাজ শাসকবর্গ নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে ভারতবাসীকে কণ্টকস্বরূপ মনে করে—এই কথা উল্লেখ করার মধ্যে শাসকের সঙ্গে বিরোধের সূত্রটাই প্রবল হয়ে উঠেছে।

ভারতবাসীর অর্থেই ব্রিটিশ শাসকেরা যে ব্রিটিশ পুঁজি গড়ে তুলেছিল অমৃতবাজার পত্রিকায় তার উল্লেখ প্রশংসনীয়। পরোক্ষ করের মাধ্যমে, ভারতবাসীদের শ্রমজাত অর্থ যেভাবে কর্মচারীদের জন্য বিলেতে হোম-চার্জ হিসাবে প্রেরণের মাধ্যমে, পরাধীনতাজনিত কারণে ভারতবাসীর পক্ষে অসুবিধাজনক বাণিজ্যিক লেনদেনে ব্রিটিশ পুঁজির কলবর বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়া প্রভৃতি অমৃতবাজার পত্রিকায় সমালোচিত হয়েছে। উনিশ শতকের ছয়ের দশকে এই অর্থনৈতিক ইতিহাস সচেতনতা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

ইংরাজ শাসনে Law and order এর অনুরালে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক জীবন যে সম্পূর্ণ বিধবস্ত হয়েছিল অমৃতবাজার পত্রিকায় দৃষ্টিতে তা খুব স্বচ্ছভাবে ধরা পড়েছিল। দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে সুসংগঠিত করে দরিদ্র মানুষের দুর্দশা লাঘবে সরকারের যে কোন সদিচ্ছা নেই পত্রিকার একাধিক প্রবন্ধে তার প্রমাণ। 'বাঙালার নবজাগরণ যুগের মধ্যবিস্ত শিক্ত বুদ্ধিজীবীরা শূদ্ধ নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থের জন্য সচেতন হয়েছিল এবং দরিদ্র গ্রামবাসীর জন্য তাদের কোন আন্তরিক সদিচ্ছা ছিল না'—অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'এদেশীয় দরিদ্র লোকের অবস্থা', 'মহাজনের অত্যাচার' জাতীয় একাধিক প্রবন্ধ অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গীকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। স্বল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যৌথ উদ্যোগে গ্রামে ব্যাংক স্থাপনের পরামর্শ দিয়ে পত্রিকা প্রকারান্তরে জাতীয় মূলধন সংগঠনের কথাই বলেছেন—সমসাময়িক যুগে অনুরূপ প্রচেষ্টা ব্রিটিশ পুঁজির স্বার্থের সহযোগী প্রচেষ্টা হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে না।

ইংরাজ শাসনে বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে মধ্যবিস্ত শ্রেণীর সৃষ্টির অনিবার্যতা ছিল। কিন্তু শাসকের ঈর্ষিত পথে পদচারণা না করে এই শ্রেণী জাতীয় জাগরণের বার্তাকে বহন করেছে। উপনিবেশের বুদ্ধিজীবীরা সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ধ্যান-ধারণার পথিকৃৎ হয়েছে। এদেশেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তাই ইংরাজ শাসকগণ প্রথম থেকেই এই শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অমৃতবাজার পত্রিকা সেই মধ্যবিস্ত শ্রেণীর

ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করে মন্তব্য করেছে যে ইংরাজ শাসক ইচ্ছাকৃতভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি ঐদাসীনা প্রদর্শন করতেন। প্রমাণ হিসাবে পঠিকা ১০ আইন বিধিবদ্ধ করার সময় গাতিদারগঞ্জের স্বয়ং আইনে গণ্য না করার কথা উল্লেখ করেছে। অতীত শতকরা ৭৫ জন ভূস্বামীজাত বা মধ্যবিত্ত এই গাতিদার শ্রেণীর অন্তর্গত। ১০ আইনে জমিদারের সঙ্গে গাতিদারের বিরোধ সৃষ্টি করে একদিকে গাতিদারদের দুর্বল করা হয়েছে, অন্যদিকে জমিদার শ্রেণীকে সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদের তৎপরিবাহক করার চেষ্টা হয়েছে। ১৮৭৫-৮৫ প্রজাম্বর আইন নিয়ে অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে রায়তী কৃষক ও মধ্যবিত্তের যে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ হয়েছিল তার পদধ্বনি ‘মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অপসারণ’ জাতীয় প্রবন্ধে অনুভূত হয়েছে। শব্দ তাই নয় উপনিবেশে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষণ-বাণিজ্য-ব্যবসায়ের সুযোগ ইংলন্ড প্রভৃতি দেশের মত হতে পারে না—এই জাতীয় মন্তব্য করে, কিংবা ইংলন্ড ও ভারতবর্ষের আদর্শ ও পন্থার বিভিন্নতা উল্লেখ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ব্রিটিশ শাসনবিরোধী করার প্রচেষ্টার জন্য পঠিকা প্রশংসার দাবী রাখে।

প্রগতিশীল সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলন সামাজিক মানব্বের মনের মূর্তি ঘটায়—এই মন্ত্রমন স্বত্ববাদী রাস্ট্রীয় চিন্তা ও সাধনার আলম্বন বা আধার। সেইজন্য অমৃতবাজার পঠিকার বিধবা বিবাহের সম্পর্কে রচিত রচনাটি মন্ত্রমতির পরিচায়ক।

অমৃতবাজার পঠিকায় নিভীক সাংবাদিকতার আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে। কিনেসহের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের দুরাচারের কথা প্রকাশ করে পঠিকা লাইব্রেরির মামলার জড়িয়ে পড়েছিল। প্রবল অসম প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিরোধে শিশিরকুমারকে সর্বস্বপল করে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এক শ্রেণীর দেশী বিদেশী গবেষক ইংরাজ শাসনের আওতায় গড়ে ওঠা শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে ইংরেজের সহযোগী সুবিধাবাদী গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। শিশিরকুমার প্রথম বুদ্ধিজীবী জাতীয়তাবাদী চিন্তাদর্শ প্রভাবিত ব্যক্তিত্ব কি ইংরাজ শাসকের সহযোগী শক্তি হিসাবে লাইব্রেরির মামলার অভিযুক্ত হয়েছিলেন? অথবা জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত অমৃতবাজারের রচনাগুলি কি পড়তুল খেলার মত?

গত শতকে জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণার প্রচার ও প্রসারে পত্র-পঠিকা-গুলির ভূমিকার ম্যায়ন প্রয়োজন। কেননা বাঙালার নবজাগরণের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি, শাসকের সঙ্গে আপোষ ও বিরোধের দিকগুলি উক্ত পত্র-পঠিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। স্বৈরাঙ্গ শাসকের অভ্যুত্থানের প্রতিবাদে,

দরিদ্র প্রজাবর্গের দারিদ্র্যের গভীরতা প্রকাশে, মহাজনের প্রবণতার স্বরূপ উদ্ঘাটনে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকার উল্লেখ, উচ্চতম চাকুরীর ভারতীয় করণের দাবীতে, শাসক ও শাসিতের বিরোধমূলক অবস্থান প্রতিষ্ঠার বাঙলা নবজাগরণের ফসল অমৃতবাজার পত্রিকার একটি সদর্পক ভূমিকা রয়েছে। সমসাময়িক যুগের সমাজ বিকাশের ভূমিতে সীমায়িত বাঙলা নবজাগরণের মাধ্যম হিসাবে অমৃতবাজার পত্রিকা দেশবাসীকে কার্ণাৎ পরিমাণেও জাগরণের পথ-নির্দেশ করতে পেরেছিল, যুগধর্ম ও আধুনিকতার সঙ্গমে দেশবাসীকে সামান্য পরিমাণেও অবগাহন করতে সক্ষম হয়েছিল—এটাই যশোহর জেলা থেকে প্রকাশিত অমৃতবাজার পত্রিকার ঐতিহাসিক মূল্য।

Ref :—(১)–(২)—বৃত্তান্তমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়—শিশিরকুমার ঘোষ
 (৩) অমৃতবাজার পত্রিকা—২০ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৮, (৪) অমৃতবাজার
 পত্রিকা—৩১ ডিসেম্বর, ১৮৬৮, (৫) অমৃতবাজার পত্রিকা—২৯ জুলাই,
 ১৮৬৯, (৬)–(৭) অমৃতবাজার পত্রিকা—২৮ মে, ১৮৬৮, (৮) অমৃত-
 বাজার পত্রিকা—১৯ জুন, ১৮৬৮, (৯) অমৃতবাজার পত্রিকা—১৩ আগস্ট,
 ১৮৬৮, (১০) অমৃতবাজার পত্রিকা—২৯ জুলাই, ১৮৬৯, (১১)–(১২)
 অমৃতবাজার পত্রিকা—১১ নভেম্বর, ১৮৬৯, (১৩) অমৃতবাজার পত্রিকা—
 ৯ ডিসেম্বর, ১৮৬৯, (১৪) অমৃতবাজার পত্রিকা—১১ মার্চ, ১৮৬৯

এ যেন এক রূপান্তরিত নিরুতি—যে ইতিহাসে বিলম্বমান শক্তির মতো—

অতিপ্রাকৃত শক্তি নয়, ইতিহাসের কার্যকারণ পরস্পর। গ্রীক ট্রাজেডির নির্বিড় পাঠক মার্কসের কাছে 'ফেট' বা নির্যাতনের ধারণা অজ্ঞাত ছিল না। তাঁর মনে হয়েছিল নির্যাত অজ্ঞতারই ভিন্ন রূপ। তিনি লিখেছেন অজ্ঞতার জন্যে মানবসমাজকে কী নিদারুণ মূল্য দিতে হয়েছে! যে ট্রাজেডি 'ঐতিহাসিক ভাষা'র ফল, তার মধ্যে অজ্ঞতার জীবনধারা যে একেবারে নেই তাও বলা যায় না। তবে এই অজ্ঞতার জনক কোথাও শ্রেণীগত অস্বাভাবিকতা, কোথাও ইতিহাসের অনিবার্যতা।

মার্কস ও সেই সঙ্গে এঙ্গেলস, ট্রাজেডি সংক্রান্ত মতামতের ক্ষেত্রে ইতিহাস ও শ্রেণী, আর এই দু'টির বিজড়িত সম্পর্ক স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছেন। এইখানেই ট্রাজেডি সম্বন্ধে তাঁদের বিশ্লেষণ প্রচলিত নন্দনতাত্ত্বিক ধারা অতিক্রম করে গিয়েছে।

ফার্ডিনান্ড লাসালের নাটক নিয়ে নিজের মতামত দিতে গিয়ে মার্কস বলেছিলেন বিপ্লবকালীন সংঘাত বিপ্লবীদের জীবনে যে বিরোধাত্মক পরিণাম ঘটায়, সেটাই ট্রাজেডির শ্রেষ্ঠ রূপ। গোটা পুঞ্জিবাদী সমাজের বিরোধাত্মক পরিণতির ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কস এইভাবে: 'ইউরোপের সমস্ত বাড়ির গায়েই এখন একটা রহস্যময় ভ্রূশ চিহ্ন। ইতিহাস আজ বিচারক—এর রায় কার্যকর করবে প্রলোভনরয়েত।' বলা বাহুল্য, মার্কস এইভাবেই শ্রমিকদের সামনে তাঁর বক্তৃতায়, ভবিষ্যতের প্রলোভনরয় বিপ্লবের সংকেত দিয়েছিলেন।

এখানেও, মার্কসের এই ভবিষ্যদ্বাণী মধ্যযুগ, ট্রাজেডির ডায়ালেকটিক ছন্দটি বরা পড়েছে। ইতিহাসের ডাঙাগড়ার রসমত্তে এখানেও কালের মন্দীরা বেজে চলেছে—যার একদিকে (ক্ষয়িষ্ণু শক্তি) মৃত্যু, অন্যদিকে (নতুন শক্তি) জন্ম।

এখানে ট্রাজেডির আর একটি কোণের আমরা সম্মান পাচ্ছি। ট্রাজেডি কি শুধুই দুর্ভাগ্য, হাহাকার আর মৃত্যু? তাহলে সেটা হবে বাস্তবতার একটা খণ্ড চিত্র, জীবনের একপাশে ছবি। মার্কস গ্রীক নাট্যকার ইস্কাইলাস-এর স্মৃতি চরিত্র বন্দী প্রমিথিউসকে শহীদ, সম্মান আখ্যা দিয়েছিলেন। দেবতা

জিউসের আদেশে পাহাড়ে শৃংখলাবদ্ধ প্রমিথিউস শৃংখলার ছটফট করেন। তবু জিউসের কাছে ত্যাগসমর্পণ করেন না, অটল থাকেন আত্মমর্যাদায়, নিজের আদেশে। ইস্কাইলাসের এই বিরোধাত্মক চরিত্রটিকে মার্কস এত মর্যাদার সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন কেন ছাত্র অবস্থায় লেখা তাঁর ডক্টরেট পাণ্ডুরার গবেষণা-পত্রে? বস্তুত্বাত্মক প্রমিথিউসের একমাত্র সদৃশ্য ঘোষণাই কি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল?

প্রমিথিউসের সৃষ্টির বন্দীদশা, দেবতা জিউসের কাছে তাঁর পরাজয়—এর থেকেও তাঁর কাছে অনেক বড় মনে হয়েছিল প্রমিথিউসের মানব-কল্যাণের আদর্শকে, নির্যাত কিংবা দৈবী বিধানের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহকে। মার্কসের কাছে ইম্ফাইলাসের এই চরিত্রটি আত্মার ঐশ্বর্যে ‘অলিম্পিয়ান’ উচ্চতর পৌঁছেছে : এই ট্রাজিক নায়ক পরাজিত হলেও নিজেকে মৃত্যুঞ্জয় রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে গ্যোয়েটের অনুরাগী মার্কস ফাউন্টের এই মহান প্রজ্ঞার বিশ্বাসী ছিলেন : ‘একমাত্র সেই-ই জীবন ও স্বাধীনতার যোগা, যে এর জন্যে প্রতিদিনই অস্বপ্নধারণে রাজি।’

যে সময় ‘জীবন ও স্বাধীনতা’র জন্যে অস্বপ্নধারণে মানুষকে উত্তেজিত করে, আর যে নায়ক-নায়িকা এর জন্যে জীবন বিসর্জন দেয়—মার্কস সেই সময় ও নায়ক-নায়িকাদের বিপ্লবী ট্রাজেডির শ্রেষ্ঠ উপকরণ বলে মনে করেছেন। লাসোলের কাছে তার এমন এক বিরোগাত্মক নাটকের প্রত্যক্ষা ছিল, যা সংকালীন ইউরোপের বার্ষিক্যময় বিপ্লবীদের ‘ক্যাথারিসিস’ ঘটিয়ে নতুন আশায় উদ্দীপিত করতে পারে। ট্রাজেডির কাহ্না, অশ্রুপাত যদি নতুন চিন্তায় চঞ্চল না করে তোলে, আশ্বলিদানের রক্তপাত থেকে যদি নতুন জীবনের অঙ্কুর না জন্মায়—তাহলে সে ট্রাজেডি বার্থ, ব্যক্তি-জীবনের অর্থহীন বিনাশ।

ট্রাজেডির প্রসঙ্গে এখানে অ্যারিস্টটল কথিত ‘ক্যাথারিসিস’-এর কথা আসে। শব্দটির অর্থ চিন্তাশুদ্ধি। ট্রাজেডি তার নাটকীয় সংঘাতের মধ্যে দিয়ে, ধ্বংস, মৃত্যু ও বিচ্ছেদের পটভূমিকায়, দর্শককে এমন প্রবলতম আবেগে মাতিত করে, যেখানে তার অন্তর্জগৎ থেকে ঘুড়ে যায় যা কিছু তুচ্ছ, যা কিছু হীন, যা কিছু আত্মকের; একটা পরিশুদ্ধ আবেগ তার নৈতিক সাহসের উৎস হয়ে ওঠে। বিরোগাত্মক নায়কের অভিজ্ঞতার অংশভাগ হয়ে ওঠে দর্শক, শরিক হয় নায়কের যন্ত্রণার। দর্শক তার নিজের দুঃখভোগের আগুনে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে তোলে, নিজেকে উন্নীত করে উচ্চতর আদর্শের জগতে। ট্রাজেডির আনন্দ-স্রীমাসো দর্শককে নিয়ে যায় দুঃখভোগ থেকে নতুন জাগরণে, মৃত্যু থেকে জীবনের সংকল্পে, বিপর্যয়কে উত্তীর্ণ করার অনমনীয় সত্ত্বায়ে। শেল্লপীয়ার থেকে শালোকন্ড—সমস্ত মহৎ ট্রাজেডির মধ্যেই ‘ক্যাথারিসিস’-এই ভূমিকা পাল্লা ধাবে।

এবার নির্দিষ্ট করে বিপ্লবী ট্রাজেডির প্রসঙ্গে আসা থাক, যে বিষয়ে মার্কসের স্পষ্ট মতামত রয়েছে।

‘বিপ্লব ট্রাজেডির স্বার্থ’ বিষয়বস্তু।’ মার্কসের এই তাঁতর তাৎপর্য

আমরা কিভাবে গ্রহণ করব? ১৮৪৮ সালে কংট্রেনোটাল ইউরোপের, বিশেষ করে জার্মানি বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের, ট্রাজিক অভিজ্ঞতা মার্কস ও তাঁর বন্ধু এঙ্গেলসের যথেষ্ট ছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই কি তাঁদের মনে হয়েছিল বিপ্লব ট্রাজেডির একটা উর্বর উপাদান? সেটা একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে। এই প্রশ্নে তাঁদের যুগ্ম জীবনের একটা তথ্য উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ষোড়শ শতকে, ১৫২২-২৩ সালে, রাইন অঞ্চলের নাইটরা ফ্রান্সিস ফন সিক্সেন-এর নেতৃত্বে যে অভ্যুত্থান করেছিলেন, তাকে বিখ্যরবশত করে ফার্ডিনান্ড লাসালে তাঁর বিদ্যোগাত্ত নাটকটি রচনা করেন। এই নাটকের দু'টি কপি তিনি মার্কস ও এঙ্গেলসের কাছে পাঠান তাঁদের মতামতের জন্যে। এই সঙ্গে লাসালে দু'জনের কাছে লেখা দু'টি চিঠিতে বিপ্লবে ট্রাজেডির উপাদান কিভাবে নিহিত থাকে—সেই সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করেন।

অন্যদিকে, মার্কস ও এঙ্গেলস পৃথক পৃথক চিঠিতে লাসালেকে তাঁদের মতামত জানান। মার্কসীয় নন্দনভঙ্গিতে বিপ্লবী ট্রাজেডি সংক্রান্ত ধারণার উৎস মূলত এই দু'খানি পত্র।

এবার গোড়ার প্রশ্নটিতে ফিরে আসা যাক। মার্কস বিপ্লবকে কি অর্থে ট্রাজেডির যথার্থ বিষয়বস্তু বলে মনে করেছিলেন? বিপ্লবের সঙ্গে মার্কস সাম্রাজ্য ঘটিয়েছিলেন সামাজিক সংকটের। এই সংকট অবশ্যই ডায়ালেকটিক চরিত্রের। এই সংকটই হচ্ছে ট্রাজেডির সূতিকাগার—যেখানকার জাতক জীবন ও মৃত্যু অর্থাৎ বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যে দোদুল্যমান। ১৮৫৬ সালের এপ্রিলে তাঁর একটি ভাষণে মার্কস ইতিহাসের একটি পর্যায়ে সামাজিক সংকটের রূপ ব্যাখ্যা করেন। ১৮৪৮-এর বার্ষিক ইউরোপীয় বিপ্লবগুলির সঙ্গে আগামী দিনের বিপ্লব-বীর্ষ বিপ্লবের বৈপরীত্য চুটিয়ে তুলে তিনি বলেন : '১৮৪৮-এর তথাকথিত বিপ্লবগুলি নেহাৎ অকিঞ্চির ঘটনা—ইউরোপীয় সমাজের শৃঙ্খল ভূত্বকের উপর ছোট ছোট ফাটল ও আঁচড়ের দাগ। কিন্তু তার মধ্যে দিয়েই অন্তঃস্পর্শ গহ্বর প্রকট হয়ে পড়েছে। আপাত কঠিন ভূত্বকের তলার জীবন্ত পদ্ধতির মহাসমুদ্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, এখন একমাত্র প্রয়োজন হলো কঠিন পদ্ধতির অংশগুলিকে সবলে বিচ্ছিন্ন করে প্রসারিত করা।'

১৮৪৮ সালের সংকট সমাজের অন্তঃস্পর্শ গহ্বরটাকে প্রকট করে দিয়েছে কিন্তু আগামী দিনের মহাসংকট ইউরোপীয় সমাজে এক বিশাল ভূমিকম্প ঘটিয়ে সব ওলটপালট করে দেবে। বিশ শতকের বিশ্বযুদ্ধ, বিপ্লব, সাম্রাজ্যবাদী

শ্রীবর্গের হানাহানি—সবই এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যেন স্টেনোগ্রাফার ভাষায়। সামাজিক সংকটের ধারণাটা এখানে মোটেই একেপেশে নয়, অর্থাৎ শব্দ বিপর্যয়ের কথাই এখানে বলছেন না মার্কস। এই বক্তৃতার অল্পদিন পরেই তিনি এটাকে আরও বিশদ করে বলবেন : ‘আমাদের যুগে সব কিছুই যেন পরস্পর-বিরোধী সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।’ বিপদ ও বিপদ-মুক্তির সম্ভাবনা দুটোই চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীর্ণ।

এই রকম দেশ-কালের অবিচ্ছিন্নতার মধ্যেই কি সামাজিক সংকট ও সামাজিক বিপ্লব পরস্পরের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে নেই? সুতরাং ট্রাজেডির অর্ধেকই উন্মোচিত করতে হলে সংকট ও বিপ্লবের আলোড়িত বাস্তবতাকে ধরতেই হবে। লাসালে তাঁর নাটকে কি সেটা ধরতে পেরেছিলেন? মার্কস লাসালের নাটকটিকে বিপ্লবী ট্রাজেডির পথরূপে করেন নি। এর নায়ক সিক্সেন একটা ক্যান্ডিড শ্রেণীর, ইতিহাসে বিলীণমান গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। কোনো বিলীণমান শ্রেণীর নায়ক, যত দুঃসাহসী ও দুর্ভাগ্যের শিকারই হোন না কেন, বিপ্লবী ট্রাজেডির মর্মকেন্দ্র হতে পারেন না। কেননা ভাবী সমাজের কোনো কল্যাণকর স্বপ্ন, প্রগতির কোনো মহৎ আদর্শ তাকে উদ্বোধিত করে না। আর সেই কারণেই তাঁর পতন-অভ্যুদয়, তাঁর ব্যর্থতা-সামফলা ইতিহাসের অগ্রগতির নিরিখে তাৎপর্যহীন।

মার্কস ও এঙ্গেলস দু’জনেই দেখিয়েছেন নিম্নবর্গের নাইটদের প্রতিনিধি সিক্সেন কোনো ভবিষ্যৎমুখী বিপ্লবী আদর্শের উদ্ভাষাতা নন, তাঁর বিকল দৃষ্টি অতীতের দিকে। এঙ্গেলস তাঁর চিঠিতে লাসালেকে লিখছেন যে-সংগ্রাম থেকে বিপ্লবী ট্রাজেডির অর্ধেকই নির্মিত হয়, লাসালে সেটাকে উপেক্ষা করেছেন। যে খোড়শ শতক এই নাটকের কালগত পটভূমি, সেখানে ইতিহাসের রক্তমাংস কৃষক সংগ্রামের কলরোল, সেখানে টমাস মুনজের গণ-আকাংক্ষার বিদ্রোহী নায়ক। লাসালে শ্রেণীসংগ্রামের এই উত্তাল রণক্ষেত্রটিকে বর্জন করে সুবিধাবঞ্চিত নাইটদের যে সংকীর্ণ, নিম্নরঙ্গ জীবন-পর্বকে নাটকের উপজীব্য করেছেন, তার ফলে বাস্তব কালের তাৎপর্য এর কুশীলবদের চরিত্রে প্রতিফলিত হয়নি। এখানে সবাই নাট্যকারের নিজস্ব কল্পনার মানস-মূর্তি।

মার্কস তাঁর চিঠির এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন সিক্সেনের বিদ্রোহ একাধি নাইট-দলভ। যদি তিনি এটা ভিন্নভাবে করতে চাইতেন, তাহলে তিনি মর্যাদার আহ্বান জানাতেন শহরের লোক ও কৃষক সম্প্রদায়ের কাছে, কিন্তু সেটা হতে পারে না। কারণ এ সব শ্রেণীর অভ্যুদয়ের অর্থই হচ্ছে

নাইটেশ্বরের বিলুপ্ত। কোনো বিপ্লবী শ্রেণী নেই, নাট্য-সংঘাতের মধ্যে নেই

কোনো প্রগতি ও প্রতিজ্ঞার মরণপল লড়াই—সেই রকম নাটক বিপ্লবের বিরোগাত্ত উপাদানকে ফুটিয়ে তুলবে কিভাবে? এঙ্গেলস তাঁর চিঠিতে স্পষ্ট করেই বলেছেন : ‘আমার কাছে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ট্রাজিক পরিস্থিতি : সামলোর বা মূল ভিত্তি সেই কৃষকদের সঙ্গে মোর্চা গঠন ছিল অসম্ভব।’

যদিও একটা বিশেষ নাটকে কেন্দ্র করে মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছিলেন, তবুও ট্রাজেডি সম্বন্ধে, নির্দিষ্টভাবে বিপ্লবী ট্রাজেডি সম্বন্ধে, কিছু ধ্রুব মূল্যায়ন এর মধ্যে রয়েছে। ঐতিহাসিক কাল ও বিশেষ সামাজিক অবস্থায় বিপ্লবী ট্রাজেডির নায়ক-নায়িকাকে কিভাবে সীমায়িত করে দেয়, তাদের সামলোর অসম্ভাব্যতা কিভাবে ঘনায়মান করে তোলে একটা গভীর ও বিরোগাত্ত সামাজিক বিশৃঙ্খলার চাপে—এটাই তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন।

যে কোনো বিরোগাত্ত নাটকের সামান্য-খর্ম হচ্ছে নায়কের মানবিক ব্যর্থতা, তাঁর পুরুষাকারের পরাজয়। কিন্তু বিপ্লবী ট্রাজেডিতে এই ব্যর্থতা, এই পরাজয় ইতিহাসের খণ্ডকালে আবদ্ধ, যে খণ্ডকালের চাপকে নায়ক কাটিয়ে উঠতে পারেন না। নায়ক এখানে নৈর্ব্যক্তিক শক্তির শিকার। ঘোড়শ শতকের জার্মানিতে নিম্নবর্গের নাইটদের সঙ্গে সামন্ত রাজাদের সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছিল ইতিহাসের নিয়মে; কিন্তু এই সংগ্রামে নাইটদের জয়ের সম্ভাবনা ছিল না। কেন না এই জয়ের জন্যে যা প্রয়োজন—শহরের সুবিধা-বঞ্চিত শ্রাব্য ও কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী—সেটা বাস্তবায়িত হওয়া তখন ছিল অসম্ভব। এই সামাজিক বাস্তবতা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কোনো পথ নেই, আর এই কারণেই নায়কের জীবনে বিরোগাত্ত মূহূর্ত নেমে আসে গ্রীক নাটকের নিয়তির মতো, পরাজয়ের বধ্যভূমিতে নায়কের হাহাকার ধ্বনিত হয়। মহাকালই এখানে একমাত্র নায়ক—এই মহাকালের চাপেই অজ্ঞানের গ্যাণ্ডিভ হারায় তার শক্তি, কণের রথচক্র ভূমিতে প্রোথিত হয়।

কিন্তু ঠিক কোনটাতে আমরা বিরোগাত্ত সংঘাত বলে চিহ্নিত করতে চাইছি? যেকোনো ব্যর্থতার, কিংবা কোনো বিশেষ মৃত্যুর মধ্যেই তো রয়েছে ট্রাজেডির ছন্দ। নায়কের আত্মবিসর্জন কখনও দুঃসহ বিরোগাত্ত সংঘাত ঘনিষ্ঠে তোলে। নিজের ইচ্ছাপূরণ অসম্ভব জেনে নায়ক মৃত্যুর শীতল বিশেষ নিজেকে সমর্পণ করেন, হয়ত কোনো জিম্মতর লোকে মৃত্তির স্বপ্নও দেখেন।

ক্ষেত্র ততটো নারকের ব্যক্তি-জীবন নয়, যতটা ইতিহাস ও সমাজ। ব্যক্তি-জীবনে এই সংঘাত বিস্ফোরণশীল হয়ে ওঠে, তার কোষগত অভিব্যক্তি ছিন্নভিন্ন করতে চায়।

এঙ্গেলসই বিয়োগান্ত সংঘাতকে চিনিয়ে দিয়েছেন। ইতিহাসের ধারায়, সমাজের গর্ভে মানবিক বিকাশের চাহিদা পূরণের জন্যে এমন কিছু আদর্শ ও লক্ষ্যের উদ্ভব ঘটে, যার বাস্তবায়নের সংগ্রাম পরিত্যাগ করা অসম্ভব, কারণ সামাজিক-ঐতিহাসিক অনিবারণ্যতা থেকেই তার জন্ম ও পরিপূর্ণতা; অথচ সেই মুহূর্তে সেগুলির বাস্তবায়নও অসম্ভব। হয়তো সেগুলিকে বাস্তবায়িত করার মতো শক্তি তখনও জারমান, হয়তো-বা সেগুলির বাস্তব রূপ দেওয়ার মতো শক্তি-বিন্যাস তখনও গড়ে ওঠে নি। ইতিহাস কখনওতো ইহিত্যে, প্রতীকে কথা বলে। তাই এঙ্গেলস বলছেন, ইতিহাসে উদ্ভূত আদর্শ, চাহিদা (যার পেছনে রয়েছে সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদ) এবং সেগুলি বাস্তবায়িত হওয়ার মতো শক্তি-বিন্যাসের অনাভিধা—এই দুইয়ের সংঘাতই বিপ্লবী ট্রাজেডির সংঘাত। এটা ধরে নেওয়া যায় নি বলেই লাসালে সিক্সেন-এর ভাগ্য-বিপর্যয়ের আসল ট্রাজেডি ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। একটা বিপ্লব তখনই বিয়োগান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়, যখন সে এমন লক্ষ্য অর্জন করতে চায় যা সমকালীন শ্রেণী সংগ্রামের নিরিখে অর্জিত হতে পারে না।

প্রসঙ্গটির আলোচনা, যেন আমাদের অগোচরেই, একটু ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে। বিপ্লবী ট্রাজেডির কথা বলতে বলতে আমরা চলে এসেছি বিপ্লবের ট্রাজেডি বা বিপ্লবের বিয়োগান্ত পরিণতির প্রশ্নে। বিপ্লবী ট্রাজেডি তো আসলে বিপ্লবের ট্রাজেডিরই শিচিপিত অভিজ্ঞতা। মার্কস ও এঙ্গেলস, এমন-কি লাসালেও, তাদের সমকালীন বিপ্লবের ব্যর্থতার মূকুরে ষোড়শ শতকের এই বিয়োগান্ত ঘটনাটিকে দেখেছিলেন।

লাসালে তাঁর নাটকটির মধ্যেই এটা উল্লেখ করেছিলেন যে ১৮৪৮-এর বিপ্লবে অংশ নিতে গিয়ে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়, সেই নিরিখেই তিনি এই ট্রাজেডি রচনা করেন, দুই যুগের বিপ্লবের বিয়োগান্ত পরিণতির মধ্যে তিনি সাদৃশ্য খুঁজে পান। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি মার্কস ও এঙ্গেলস এই সাদৃশ্যকে ঐতিহাসিক মনে করেছেন। কেন না ১৮২২ ও ১৮৪৮-এর মধ্যে যে মৌলিক পালাবদল ঘটে গিয়েছে তাতে এইরকম সাদৃশ্য টানা অবাস্তব। তাছাড়া সিক্সেন-এর মতো নাইটরা তখন ইতিহাসের বিলীয়মান শ্রেণী, বিপ্লবী

১৮৪৮-৪৯-এর জার্মান বিপ্লবে যেসব বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন তৎকালীন বিকাশমান শ্রেণীর মূখপাত্র; তবে তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণ বিপ্লবী সক্রিয়তা দেখাতে পারেন নি বলেই প্রতি বিপ্লব জরলাভ করে। এই বিপ্লবের ট্রাজেডি বিপ্লবী ট্রাজেডির যথার্থ উপাদান হতে পারত। সাদৃশ্য প্রসঙ্গে মার্ক'স আরও বলেছেন আধুনিক জার্মান নাট্যকাররা বিপ্লবী ট্রাজেডির জন্যে বেছে নিতে পারেন কৃষক বৃক্ষের নেতা টমাস মুনজেরকে, যিনি ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এসেছিলেন 'অনেক আগেই'—যখনও সংগ্রাম সফল হওয়ার মতো ঐতিহাসিক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়নি।

মার্ক'সীয় নন্দনতত্ত্ব ট্রাজেডিকে নিছক অশুদ্ধ মনুষ্য-শক্তি কিংবা অশু নির্যাত অথবা শোপেনহাওয়ার কথিত 'আদিম পাপ, অর্থাৎ পাপিষ্ঠ মানবদেহের' ধারণা থেকে মূক্ত করেছে। আর সেই অর্থে মার্ক'স ও এঙ্গেলস উভয়েই বিপ্লবী ট্রাজেডির উৎস সম্প্রদান করেছেন বস্তুমূখর সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে। সামাজিক সংকট, বিপ্লবী সংগ্রাম বর্জনে নায়কের অনমনীয় অনিচ্ছা আবার আদর্শ রূপায়ণের অসম্ভাব্যতা এবং পরিণতিতে নায়কের আত্মবিসর্জন—এইভাবেই মার্ক'সীয় ট্রাজেডির ধারণার বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

বিপ্লবের বিরোগাত্য পরিণতি কিভাবে শিল্প-সার্থকতা পায়, আবার সেই শিল্প-রূপে তাবে নতুন বিপ্লবী সংগ্রামে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে—জাঙ্গলর নাটকটিকে কেন্দ্র করে মার্ক'স এঙ্গেলস সেটাই দেখাতে চেয়েছিলেন। সামাজিক সংকট, সামাজিক নৈরাজ্য এবং তার নিরাকরণের জন্যে 'বিপ্লব—ইতিহাসের এই 'চেন রিঅ্যাকশন'-এর অন্তিম পরিণতি যাই ঘটুক না কেন, ট্রাজিক সংঘাত তার অন্তর্নিহিত উপাদান।

মার্ক'স তাঁর সময়েই ইউরোপীয় সমাজের যে 'অতলস্পর্শী গহবর'টিকে দেখতে পেরেছিলেন, সেটা এখন গোটা পৃথিবীতেই প্রকট। গোটা পৃথিবীতেই এখন ডায়ালেক্টিক ট্রাজেডির ধারা আক্রান্ত। বিপ্লবের ভূমিষ্ঠত মৃত্যু, প্রতিবিপ্লবের ছিন্নমস্তা রূপ আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের সময়েই, লক্ষ্য করছি চীল ও দক্ষিণ আফ্রিকা, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বৈরতন্ত্র আর ফ্যাসিবাদ-শাসিত দেশগুলিতে। পারমাণবিক বিস্ফোরণ-ভয়ের ছত্রছায়ার উদ্বিগ্ন পৃথিবীর চোখে-মুখে কি মহাট্রাজেডির সংকেত আমরা লক্ষ্য করছি না?

এঙ্গেলস তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে ইউরোপীয় বুর্জোয়া সমাজে

মহাবুদ্ধ ও মহাবিপ্লবের ভাবব্যাপ্তি করে বলেছিলেন : অসংখ্য রাজমুকুট পথে গড়াগড়ি খাবে, কুড়োবার লোকও পাওয়া যাবে না। আর সেই রক্তমোক্ষণ থেকে জন্ম নেবে 'হিউম্যান কর্মোড'। বিশ শতকের প্রথম দিকে বিশ্বযুদ্ধের ও নিপীড়িত মানুষের সফল বিপ্লবের মধ্যে আমরা ট্রাজেডি ও 'হিউম্যান কর্মোড' দেখেছি।

এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার শিল্পরূপ পাওয়া গিয়েছে 'গোর্কি', রমা রোলী ও শলোকভের সাহিত্যে। এ'রা কেউই বুর্জোয়া সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের (শলোকভের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) ধর্ম, রক্তপাত ও মৃত্যুকে এড়িয়ে যান নি, তাঁদের নজর এড়িয়ে যায় নি ব্যক্তি-মানুষের নীচতা, দুর্ব্বলতা, অধ্যপতন। কিন্তু তারা মানুষের নিছক অতর্লোকে মগ্নে এত কারণ অনুসন্ধান করেন নি। 'গোর্কি' তো নানা প্রসঙ্গে সরাসরি অভিযুক্ত করেছেন পুঞ্জিবাদকে, বিশেষ করে রুশ পুঞ্জিবাদকে, কেননা আসলে সেটাই হচ্ছে নিহত মানবতার গলকবর। 'গোর্কি'র সাহিত্যই মার্কসবাদী ট্রাজেডির ধারণার সার্থক রূপায়ণ, কেননা সেখানে পুরানো সমাজের 'ট্রাজি-কমিক' মৃত্যুর নিপুণ শিল্প রূপটি আঁকা রয়েছে।

আমাদের যুগে পুরানো সমাজ ব্যবস্থার মৃত্যু-শব্দগার মধ্যে শোনা যাচ্ছে ট্রাজেডির কাতর আত্ননাদ ; আবার সেখান থেকেই আসছে মৃত্তিকাময় মানুষের সংগ্রামের ডাক। তাই বিপ্লবী ট্রাজেডির বাতাবরণ এখনো ঘনীভূত হয়েই রয়েছে, রয়েছে বিপ্লবের ট্রাজেডির সম্ভাবনাও। কিন্তু 'হিউম্যান কর্মোড'র দ্বারা বর্চায়তা—সেই সচেতন, বিপ্লবী জনগণ তো সংগ্রামে অগ্রজিত্ব রয়েছে। এই পরিবেশে আমরা কি এমন মহৎ ট্রাজেডি সাহিত্যের আশা করতে পারি না যা বিপ্লবীদেরও চিত্তশুদ্ধির জন্যে প্রয়োজন ?

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন স্রোতধারা*

জগন্নাথ সরকার

যে সংগঠন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তার শতবর্ষ উদ্‌যাপনে স্বাভাবিকভাবেই সমগ্র দেশ উৎসাহিত ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যখন ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে বাধ্য হয় তখন থেকেই প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে এই প্রতিষ্ঠান আমাদের শাসন পরিচালনা করে আসছে।

নেতৃত্বের দুর্বলতা, বিধা কখনও কখনও হিমালয়সদৃশ প্রমত্ত ও শেষ অবধি যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরিচালনার ভারত স্বাধীন হয়েছে তা আমাদের দেশের জনগণ ভুলতে পারে না। অবশ্য একথাও ঠিক যে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে দেশ বিভাগ এবং স্বাধীনতা জনগণমানসে যে আশা জাগিয়ে তুলেছিল তাও অঙ্গুণ্ণই থেকে গেছে। তবে একথাও অবিসংবাদী সত্য যে ঔপনিবেশিক শাসনের অভিযোগ দেশের জনগণকে অপমানের যে নিম্নতম স্তরে নির্মাণ করিয়েছিল এবং আমাদের অগ্রগতির পথে বা প্রধান বাধাস্বরূপ হয়েছিল তা চিরদিনের মত দূর হয়ে গিয়েছিল। সেইজন্য আমাদের জনগণ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি ন্যায়সংগত আশা পোষণ করে। কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে কয়েকটি উৎসাহজনক চিন্তার প্রচার করা হয়েছে। সেই চিন্তাধারা কেবল যে জাতীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রমাণিক মূল্যায়ন করেছে তাই নয় জনগণের চিন্তার স্বচ্ছতাকে আবিষ্কার করে তুলে প্রতিস্থাপিত কাজের সম্মুখীন হবার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে।

১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে কলকাতা এ. আই. সি. সি.-র আধিবেশনে শতবর্ষ উৎসবের প্রস্তুতিপর্ব* একথা ঘোষণা করা হয়েছিল যে কেবলমাত্র কংগ্রেসই দেশের স্বাধীনতা এনেছিল। এ ছাড়া, একথাও ঘোষণা করা হয়েছিল যে কেবলমাত্র কংগ্রেসই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে। সেই থেকে

* "India's freedom struggle—Several Streams" —P. P. H.
প্রকাশিত পুস্তকের ভূমিকা।

বর্তমান শাসকদের অন্যান্য প্রক্কারাও এই বক্তব্যই প্রচার করে চলেছে এবং আজ আরও বেশি করেই এই বক্তব্যের প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। এই অত্যাধিক শাসক দলের সগৰ্ব্ব উক্তি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার জন্যই জাতীয় মূল্য আন্দোলনের এই বিকৃত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা চলেছে।

ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই আরম্ভ হয় নি। এই সংগ্রামের ইতিহাস সুদীর্ঘতর। এ কথা কখনও বলা চলে না যে পূর্ববর্তী ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী সংগ্রামের সম্বন্ধ ঐতিহ্য একমাত্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করেছে। বস্তুতঃ তারা এই প্রাণবন্ত ঐতিহ্যের একটা বড় অংশকেই অস্বীকার করেছে।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পরও এ কথা কখনই বলা চলে না যে এককভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। আরও অনেকেই এই সংগ্রামের শরিক ছিল। বরং প্রায়শই দেখা গেছে যে নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে অন্যান্যরাও ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে কাজ করে গেছে। এই সব শক্তি নিপীড়িত জনগণকে জাগিয়ে তুলে ও সচেতন করে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরও বিস্তার ও গভীরতা দিয়েছে। এবং প্রায়ই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের অনমনীয় বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েও তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর তাঁদের সুগভীর ছাপ রেখে গেছেন। এই সব সত্যকে অস্বীকার করে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া হয়েছে যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একাই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠারও প্রায় তিন দশক পূর্বে ভারতে প্রথম জাতীয় বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহকে মিথ্যা করে ইংরাজরা ১৮৫৭-১৮৫৯ এর সিপাহী বিদ্রোহ বলে চিহ্নিত করেছে। মার্কস এই বিদ্রোহকে চিহ্নিত করে গেছেন ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে,—জাতীয় বিদ্রোহ বলে,—সর্বব্যাপী বিদ্রোহ বলে। তিনি দেখিয়েছেন যে সিপাহীরা হাতিয়ার ধারী ছিল। এই বিদ্রোহের পিছনে মূল সত্ত্বালক শক্তি ছিল ভারতের জনগণ। মার্কস নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে জনগণের সকল ধারা বিশেষ করে কৃষকরা এই বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ করছিলেন। তিনি তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করেছেন যে ব্রিটিশরা যখন ভারত জয় করে “ভাগ করে শাসন কর” নীতির

ও মুসলমান) ও বিভিন্ন বর্ণ (যেমন ব্রাহ্মণ, রাজপুত, কোন কোন ক্ষেত্রে শিখ) একত্র করেছিল তাই নয় বিভিন্ন সামাজিক স্তরকে একত্র করেছিল। সিপাহী ফৌজ যে তাদের ইউরোপীয় প্রভুদের হত্যা করেছিল তাই নয় হিন্দু ও মুসলমান তাদের স্বাভাবিক ঘৃণা ভুলে তাদের উভয়ের প্রভুর বিরুদ্ধে একত্র হয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন যে, “হিন্দুরা যে অভ্যুত্থান আরম্ভ করেছিল তার পরিণতি হয়েছে দিল্লীর মসনদে মুসলমান সম্রাটের প্রতিষ্ঠাতে।”

মার্কস এই জাতীয় বিদ্রোহকে দেখেছেন ১৮৫০ সালে প্রায় সারা এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জাতিদের মুক্তি যুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে। তিনি কিছু ঐতিহাসিক কারণে এই বিদ্রোহের ব্যর্থতার দিকটিও দেখিয়েছেন। যে কারণগুলি হল—জারগীর প্রথার ভারতের বিভাজন, ভারতে বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের বৈষম্য, এবং সর্বশেষ যদিও সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিরোঁছিল যেসব স্থানীয় সামন্তরাজা তাদের বিশ্বাসঘাতকতা।

১৮৫৭ সালের জাতীয় মহাবিদ্রোহ নাটকীয়ভাবে বিস্তারিত হলেও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক বিদ্রোহ দেশে অনেক আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। নিষ্ঠুর উৎপীড়ন, শঠতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা ভারতের ওপর যখন থেকে ব্রিটিশ শাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন থেকেই প্রায় দেশের কোন না কোন অঞ্চলে বিশেষ করে কৃষক সম্প্রদায়, কারিগরের দল ও উপজাতি সম্প্রদায় অবিরাম বিদ্রোহ চালায়ে গেছে। একথা প্রাণধানযোগ্য যে পলাশীর যুদ্ধের শতবর্ষ পূর্তিতেই অসম্ভাব্যে বম্বে সিপাহীরা ব্রিটিশদের উপর আঘাত হানবার পরিকল্পনা করেছিল একশ বছর আগের জাতীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ-কল্পে। বিগত দশ বছর ধরে পশ্চিম-ভারতীয় গবেষণা ১৮৫৭-র বিদ্রোহ সম্পর্কে মার্কসের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন জানায়।

উনিবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রায়ই সামন্তরাজাদের নেতৃত্বে কৃষক, শ্রমজীবী ও উপজাতিগণ উপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

১৮০১-১৮০৫ দক্ষিণ সরকারে জনগণের বিদ্রোহ দমন করবার জন্য ব্রিটিশদের শাস্তিমূলক অভিযান পাঠাতে হয়। ১৮০৭ সালে সমগ্র দিল্লী অঞ্চল অস্ত্রধারণ করে। ১৮২৪ সালে বারাণসীর নিবট বহিরাগত এক ব্যক্তির কাছে সাধারণের ভোগ্য বৃহৎ গ্রাম প্রকাশ্য নীলাম্রে বিক্রয় করা বন্ধ করে সম্পদ রাজপুত কৃষককুল। ১৮১৭-১৮ সালে উড়িষ্যার কৃষকরা স্থানীয় সামন্ত রাজার নেতৃত্বে খাজনাহীন সাধারণের ভোগ্য জমির উপর চাপানো করেণ বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ জানার। ১৮২৬ থেকে ১৮২৯ সালের মধ্যে পূণা জেলার রুম্পার বিদ্রোহী হয়ে উঠে ব্রিটিশরাজকে বাধ্য করে নামমাত্র খাজনার বিনিময়ে তাদের জমি হস্তান্তরিত করতে। মহীশূরের বেদনোর, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গুমসোর নাগপুর, কোলাপুর, সানতাওই এবং মহারাষ্ট্রের খাণ্ডেশে কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

কৃষক বিদ্রোহ ছাড়া, উপজাতিদের বিদ্রোহও ঔপনিবেশিকদের বিভিন্ন স্থানে ছোটখাটো যুদ্ধে নামতে বাধ্য করে। ছোটনাগপুরের হোরা বিদ্রোহ করে ১৮৩১-৩২ সালে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ভীল ও কলিরা বিদ্রোহ করে ১৮২১ থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে। ১৮৪৫ সালে উড়িষ্যার কন্দরা বিদ্রোহ করে। ঔনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের গুরুত্বপূর্ণ বিদ্রোহগুলির অন্যতম হল ১৮৫৫ সালে সাত্তাল পরগণার সাত্তালদের বিদ্রোহ। বিহার ও বাংলার ওয়াহাবীরা আর বাংলার ফরাজীরা আরও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।

প্রথম পর্বের এই বিদ্রোহগুলিতে কৃষক উপজাতি এবং কোথাও কোথাও কারিগররা ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের পরিচয় দেন। কিন্তু এদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বোধ ছিল না। এরা বুঝেছিল যে বাঁচতে হলে বিদেশী শক্তিকে তাড়াতে হবে। কিন্তু বিদেশী শক্তির বিকল্প কি হবে তা নিয়ে এদের কোন পরিস্কার ধারণা ছিল না। এদের প্রয়াস ছিল প্রধানত প্রাক-ব্রিটিশ যুগের সামুদ্রিক ফিরিয়ে আনার। কখনও কখনও ধর্মীয় মতবাদ তাদের মন এমন আচ্ছন্ন করে তুলতো যে অনাহুত বিদেশীর বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করতে চাইতো। কেউ কেউ যেমন বিধর্মী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের আহ্বান দিয়েছিল। একজন নিজেকে মাহমুদী বা ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ বলে ঘোষণা করেছে। আবার কেউ সত্যধর্মের বাহক বলে এগিয়ে এসেছিল।

কোন কোন বিদ্রোহ বিস্তৃত এলাকা জুড়ে হয়েছিল বটে তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছোট ছোট এলাকা জুড়ে আঞ্চলিকতার মধ্যেই, বিশেষ সম্প্রদায় বা আঞ্চলিক ভাষাভাষীদের মধ্যেই অথবা একই স্থানীয় সামন্তরাজ্যের অধীনে প্রজাদের মধ্যে এই বিদ্রোহ আঁক ছিল। একটি সংগঠিত বিদ্রোহের পরিবর্তে স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। সত্ত্ব বিদ্রোহ ঘটেছিল পরে ১৮৫৭-৫৯ সালের জাতীয় জাগরণের সময়।

এই জাগরণের প্রধান শক্তি যে নিপীড়িত জনগণ, কৃষক এবং উপজাতি তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নেতৃবৃন্দের জন্য এরা সামন্তরাজ্যদের উপর নির্ভর-

শীল ছিল। বিশেষ অধিকার হারিয়ে ব্রিটিশের অবমাননা ও লাঞ্ছনা পেয়ে শেখোক্তরা বিদেশী শাসনের প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করতো। এরাই নেতৃত্ব দিয়েছিল। কৃষক বা উপজাতিগুলির নিজস্ব নেতৃত্ব গড়ে তোলার শক্তি ছিল না। যখন তারা সে চেষ্টা করতছিল তখনও তাদের স্বপ্ন সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার দ্বারা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল।

ব্রিটিশ শাসনে দেশে যে ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল তাতে উপনিবেশ বিরোধিতার প্রথম যুগে উপরিউক্ত দুর্বলতা থাকবেই। বিদেশী শাসনের হাত থেকে মুক্তির জন্য ভারতের নিপীড়িত জনগণ তখন তাদের লক্ষ্য মতাদর্শ, সংগ্রামের রূপ, সংগঠনের ধারা ও নেতৃত্বের স্বরূপ কি হবে তা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তারা বীরের মত সংগ্রাম করেছে, কিন্তু যে লক্ষ্য তারা স্থির করেছে, যে সংগঠন তারা গড়ে তুলেছে এবং যে নেতৃত্ব তারা গ্রহণ করেছে তা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সাফল্য এনে দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

কিন্তু এই উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন যে অমূল্য অভিজ্ঞতা দিয়েছিল জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পরবর্তী অধ্যায়ে তার মূল্য অপরিসীম। আমাদের নিপীড়িত জনগণ আজও যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়, তার কিছু কিছু সমাধানের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক ও বহুমূল্য এই অভিজ্ঞতা।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর ব্রিটিশদের সঙ্গে রাজন্যবর্গের ও সামন্ত-তান্ত্রিক জমিদারদের মৈত্রীর ফলে জমিদারদের ভূমিকা আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল। উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বদানের পরিবর্তে তারাই এখন বিদ্রোহের বাধা হয়ে দাঁড়াল। নতুন শ্রেণী বুর্জোয়া শ্রেণী ও গ্রামিক শ্রেণীর বিকাশের এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের বিরোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন ধারার উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন প্রবর্তিত হল। অবশ্য কৃষক এবং উপজাতিদের উপনিবেশবিরোধী সংগ্রাম চলতেই থাকলো।

উনিবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠীদশাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের পূর্বে কৃষকদের উপনিবেশবিরোধী সংগ্রাম ও জনজাগরণ সম্বন্ধিত হয় তাদের কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৬০ থেকে ১৮৮০ সালে নামদারী সম্প্রদায় ঘোষণা করে যে তাদের মতাবলম্বীরা ব্রিটিশের তৈরী জিনিষ ব্যবহার করবে না (স্বদেশীদের পূর্বসূরী) বা উপনিবেশিক শাসিত কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করবে না (বর্জন ও অসহযোগের পূর্বসূরী)। এদের নেতা প্রান্তন সৈন্য। তাই তিনি জেলায় জেলায়

তহশিলে তহশিলে, গ্রামে গ্রামে সাময়িক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেন। নামধারীদের লক্ষ্য ছিল সেই সব শিখ সামন্তরাজ্য যারা সমগ্র শিখ সম্প্রদায়ের স্বাধীনতার জমি নিজেরা দখল করে নিয়েছিল। শিখ সামন্তরাজ্যদের সহায়তায় ব্রিটিশরা নামধারীদের আন্দোলন দমন করে। কখনো নামধারীদের কামানের গোলায় মেরে ফেলা হয়।

বাসুদেব বলবন্ত ফাদকের নেতৃত্বে ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ সালে পূর্ণা অঞ্চলের কৃষক শ্রমজীবী ও ব্যবসায়ীরা সশস্ত্র আন্দোলন চালায়। ফাদকের পরিচালিত এই গণআন্দোলন জাতীয় মূর্ত্তি সংগ্রাম ও স্থানীয় মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে একত্রিত করেছিল বলে এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও এই আন্দোলনেই প্রথম জনগণ ও পেটিবুর্জোয়া গণতান্ত্রীদের চরমপন্থী অংশ কাঁধে কাঁধে মেলায়।

ষাটের দশকের প্রথম দিকে জোর করে কৃষকদের নীলচাষে বাধ্য করার ইংরেজ নীলকরদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ নীল বিদ্রোহে আন্দোলিত হয়। এই আন্দোলন বাংলার পাঁচটি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। বোদহর অশ্রু হিসাবে প্রথম ধর্মঘট ব্যবহৃত হয় এবং কৃষকরা নীলচাষ করতে অস্বীকার করে। কৃষকরা ব্রিটিশ নীলকরদের ভূসম্পত্তি আক্রমণ করে সাফল্য লাভ করে। নীলচাষ করার জন্য জুলুম অনেকাংশেই সংশোধিত হয়। এই আন্দোলন চলাকালেই প্রথম কৃষক সভা বা কৃষকদের ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। নীল আন্দোলনের অল্পকাল পরেই পাবনা ও বগুড়ায় কৃষক অভ্যুত্থান হয়। কৃষকরা জমিদারদের বাড়ি লুণ্ঠ করে খাজনার দলিল ও রসিদ ছিঁড়ে ফেলে। উপনিবেশিকরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে এই আন্দোলন দমন করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনেরই মতো নানা চ্যুতিপূর্ণ। সেই সব আন্দোলনে না ছিল লক্ষ্যের ঠিক, না মতাদর্শের, না সংগঠন বা নেতৃত্বের। সর্বোপরি জাতীয় ভিত্তিতে জাতীয় মূর্ত্তি আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠতে পারে নি। পরবর্তীকালে শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণী সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করার পরই তা সম্ভব হয়।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয় সংগ্রামে সকল শ্রেণীকে একত্র করা সম্ভব হয়। পূর্ববর্তী উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামের প্রধান দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এক ঐতিহাসিক কতর্ব

একথা সত্য যে পূর্ববর্তী উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের দুর্বলতা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব কাটিয়ে উঠেছিল, কিন্তু এসব আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বজঁন করে। এবং সেই কারণেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নতুনতর দুর্বলতার শিকার হয়ে পড়ে। কৃষক ও উপজাতিদের সামন্তবাদবিরোধী যে দাবী ছিল তার প্রতি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল নেতিবাচক। জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে কৃষক বিদ্রোহের ভূমিকা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অস্বীকার করে। বরং এরা এই মত প্রচার করে যে সামন্তবিরোধী আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের পরিপন্থী। দ্বিতীয়তঃ সর্বক্ষেত্রে আন্দোলন ও বিদ্রোহের পন্থা থেকে এরা নিজেদের সরিয়ে রাখে, কার্যতঃ সামন্তপ্রথার শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত শান্তিপূর্ণ আন্দোলনেরও এরা বিরুদ্ধাচরণ করে। উপনিবেশিক শাসনে শ্রমিকদের দুঃসহ অবস্থার বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন সম্পর্কেও একই মনোভাবের পরিচয় দেয়। কৃষক ও শ্রমিকদের স্বাধীন শ্রেণী সংগঠনেরও এরা তীব্র বিরোধিতা করে। ফলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব পূর্বকার উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের চূড়ি থেকে মুক্ত হলেও এসব আন্দোলনের মূল্যবান বিশিষ্ট দিকগুলিকে বজঁন করে। কার্যতঃ রানের জলের সঙ্গে শিশুকে বিসর্জন দেওয়াই এদের নীতি।

কংগ্রেসের নেতৃত্ব জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করলেও কৃষক বিদ্রোহের বিরোধিতা করে এবং এমন কি অত্যন্ত ক্ষুরী হলেও অভ্যুত্থান ও বিপ্লবের বিরুদ্ধাচরণ করে বিপ্লবের শক্তিকে হ্রাস করে আনিছিল। যখন কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে কোন আন্দোলন অহিংস সত্যগ্রহের পথ থেকে বিস্ফুরিত বিচ্যুত হয়ে বিদ্রোহের দিকে এগোতে গেছে যেমন চৌরীচোরা, শোলপুর বা পেনগুয়ার, আর. আই. এন. বিদ্রোহ—তখনই কংগ্রেসের নেতৃত্ব সেই আন্দোলনের গতি স্তম্ভ করে দিয়েছে।

জাতীয় মুক্তির লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কংগ্রেস আরম্ভ করেছে নিছক তাহিসররের পরিষদে আরও বেশী প্রতিনিধি পাঠানো দিয়ে এবং ক্রমে সাবধানে ধাপে ধাপে এগিয়ে হোমরুল থেকে ডোমিসিনিয়ান স্টাটাসে এবং তার থেকে স্বরাজে পৌঁছেছে। তারও পর ১৯২৯ সালে লক্ষ্য করে তুলেছে পূর্ণ স্বরাজ। সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী ও অন্যান্য বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির পুনঃ

পূনঃ দাবীতেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা লক্ষ্য বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

একইভাবে সংগ্রামের পন্থা নির্বাচন করতে গিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব আবেদন দিয়ে সূচনা করে শেষ অবধি অসহযোগ বা আইন অমান্য আন্দোলনের রূপে সত্যগ্রহ অবধি পৌঁছেছে। এদের ভাবনা ছিল পাছে স্বাধীনতা আন্দোলন নেতৃত্বের হাতের মৃত্তো ছাড়িয়ে যায়। প্রমিক ও কৃষকদের নিজস্ব ছাপ পড়লে এই আন্দোলন এমন দিকে চালিত হবে যা বৃজেরিাদের মেনে নেওয়া কঠিন হবে। নেতৃত্ব চেয়েছিল নির্মান্ত গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারে উপর এমন চাপ সৃষ্টি করতে যাতে সরকার বৃজেরিা সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটা বোকাপড়ার আসতে বাধ্য হয়। এরা চেয়েছিল যে জাতীয় আন্দোলনের ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যেখানে ক্ষমতা জনগণের হাতে, বিশেষ করে কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের হাতে না পড়ে বৃজেরিাদের হাতে চলে আসবে এবং বৃজেরিারা দেশ শাসন করবে জনগণের অছি হিসাবে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও তার নেতৃত্বের এই ভূমিকার জন্যই সংগঠিত কৃষক শ্রমিক ও বিপ্লবী পার্টি বৃজেরিা এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির কংগ্রেসের বাইরে স্বাধীন বিকাশ অর্নিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই সব শক্তিগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গদর পার্টি, জাতীয় বিপ্লবী দলগুলি যাদের চমাত্তকভাবে সম্মাসবাদী দল বলে আখ্যা দেওয়া হয়, ইন্ডিপেনডেন্স লীগ, স্বদেশী আন্দোলন, সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, সারা ভারত কিশান সভা, সারা ভারত স্টেট পিপলস কনফারেন্স, কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনভাবে, কংগ্রেসের বিনা সমর্থনে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখে গেছে।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই সব সংগঠন, যারা কংগ্রেসের নেতৃত্ব ছাড়াই স্বাধীনভাবে কাজ করেছে তারা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণী কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় আন্দোলনে গভীর ছাপ রেখে গেছে এবং আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর, যখন ব্রিটিশ যুবরাজ ভারত পরিদর্শন করতে আসেন তখন বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণী কর্মসূচি পালন করে ও বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করে তাকে “স্বাগত” জানায়।

গান্ধীজি এই পন্থাকে গৃহভাষী বলে অভিহিত করেন ও বলেন যে স্বরাষ্ট্রের পচা গন্ধ তাঁর নিশ্বাসে লেগেছে।

এটি বিশেষ প্রাণধানযোগ্য যে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব চিত্তা করছিলেন যে হোমরুল থেকে লক্ষ্য ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস-এ উন্নীত করা হবে এবং যখন ভারতীয়রা যে স্বরাষ্ট্রের বদলে পূর্ণ স্বরাষ্ট্রকে দলের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করার প্রয়োজন আছে কিনা অথবা লক্ষ্যের দিকটাই অনিশ্চিত করে রাখাটাই ভালো, তখন সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী এবং বিশেষ করে কমিউনিস্টরা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তুলেছিলেন এবং ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে এদের সুদৃঢ় কর্মপন্থা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিধাগ্রস্ত নেতৃত্বকে বশত্ব পক্ষে এই দাবী তুলতে বাধ্য করেছিল।

১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী বোম্বাই-এর পথে সাইমন কমিশন পৌঁছালে ৩০,০০০ হাজারের বেশি শ্রমিক ব্রিটিশ সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রতিবাদ জানিয়েছিল এবং এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য কংগ্রেস নেতৃত্ব শ্রমিকদের ডুকুটি করেছিল।

কমিউনিস্ট, সোসালিস্ট এবং অন্যান্য বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলি সুস্পষ্ট দাবী জানিয়েছিল যে জাতীয় মুক্তির কর্মসূচীতে আমূল ভূমি সংস্কার, বিদেশী মূলধন এবং মৌল শিল্প সংস্থাগুলির জাতীকরণ এবং রাজনৈতিক সংস্থাগুলির পূর্ণ গণতান্ত্রিকরণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কেবলমাত্র এই পথেই আমাদের জাতীয় সংগ্রাম জাতীয় পুনর্জাগরণ ও পুনর্জন্মের দিকে অগ্রসর হতে পারবে। তারা ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সভাগুলির যৌথ অন্তর্ভুক্তিকরণও দাবী করেছিল যাতে জাতীয় সংগ্রামে অন্যান্য সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক শ্রেণীও অংশ নিতে পারে। কংগ্রেস নেতৃত্বের অবস্থা এতে কোন মোহ ছিল না। কেবলমাত্র প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টির দ্বারা অবশেষে কয়েকটি প্রাথমিক দাবী ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কয়েকটি প্রস্তাব করাচীতে গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সভাকে সম্মিষ্টগত স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করা হয়।

১৯৩৭ সালে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হলে করাচীতে গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার দাবীতে সারা দেশ জুড়ে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। কংগ্রেস পার্লামেন্ট প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলি কেবল যে এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে দমন করে তাই নয় কংগ্রেসের সদস্যদের কিংবা সভার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারী করে। এই প্রসঙ্গে এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে কৃষি বিপ্লবের প্রধান দফাগুলি আজ পর্যন্ত

স্থাপিত করা হয় নি। যেসব সমস্যা থেকে আজও দেশ মুক্ত হয় নি তার অনেকগুলিরই কারণ এই প্রভাবাদূলি বাস্তবে স্থাপিত না করার জন্য।

ষষ্ঠীর বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার ঠিক পরেই বোম্বাইতে শ্রমিকশ্রেণী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দেশের অন্যান্য অনেক অঞ্চলেও ধর্মঘট আরম্ভ হয়ে যায়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব অবশ্য কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সভাপ্রহ পালন করে প্রতীকি প্রতিবাদ পালন করে। জনসাধারণকে নিয়ে আন্দোলন করতে গেলে সমস্ত ব্যাপারটা বুজোঁরা নেতাদের আরস্তের বাইরে চলে যেতে পারে সে ভয় ছিল। যুদ্ধ-পরবর্তীকালের অভ্যুত্থানে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের আওতা থেকে মুক্ত কোন কোন শক্তি বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণী, নাটকীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সোভিয়েত রাশিয়ার লাল ফৌজের হাতে হিটলারের পরাজয় কেবলমাত্র ফ্যাসিবাদের উচ্ছেদ ঘটায় তা নয় সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদী নীতিকেও দূর্বল করে তোলে। এই ঘটনার সারা পৃথিবীব্যাপী অভাবনীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সূচনা হয়। দেওয়ালের লিখন পড়তে পেরে ব্রিটিশ সরকার ভারতে উপনিবেশবিরোধী উত্থান রুদ্ধ হতে সচেষ্ট হয়। বুজোঁরা নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু হয়ে যায় যাতে হতটা সম্ভব অস্ত্রসামর্য্য স্বাধীনতা ভারতের হাতে তুলে দেওয়া যায়। কিন্তু এই সময়ে ভারতে বিপ্লবী অভ্যুত্থান এক অভাবনীয় পর্যায়ে পৌঁছায়। সারা ভারত জুড়ে আরম্ভ হয় যে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ অবশেষে তার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৪৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী নৌবিদ্রোহ ঘোষণায়। নৌসেনারা তাদের জাহাজগুলিতে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও সি.পি.আই-এর পতাকা উত্তোলন করে। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বোম্বাই-এর শ্রমিকরা ধর্মঘট করে এবং কলভভাই প্যাটেলের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বোম্বাইবাসীরা ধর্মঘট করে। মনে হুঁরছিল সারা দেশ জুড়ে জাতীয় অভ্যুত্থান শুরু হতে চলেছে। ১৯৪৬ সালের ২রা মার্চ অবশ্য কংগ্রেস সভাপতি এই মর্মে এক বিবৃতি দেন যে “হরতাল ধর্মঘট বা সামরিক কতৃপক্ষকে অগ্রাহ্য করা আজকের দিনে অনাবশ্যক। আজ এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যে, যৌবদেশী শাসকরা তত্ত্বাবধায়কত্ব গ্রহণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে চরম করতে হবে।” মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তা চাপে পড়ে নৌবিদ্রোহের ধর্মঘটী কর্মিটি নিভৃশ্বীকার করতে বাধ্য হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিদৃষ্টিভর কি রকম মুন্সায়ন করেছে তা পার্লামেন্টে ব্রিটিশ সরকারী প্রতিনিধির বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়। ব্রিটিশরা দুটি বিকল্প—
 ১ম—১ম জাতক বৌলসংখ্যক সৈন্য এনে ক্ষমতা বজায় রাখা না হলে

আলোচনা ও বোকাপড়ার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা। ভারতে প্রেরিত ক্যাবিনেট মিশনের এক সদস্য এ. ডি. আলেকজান্ডার ১৯৪৬ সালের ১৮ই জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বলেন “আমাদের এমন এক অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হচ্ছে যখন সারা পৃথিবী বিশেষ করে প্রাচ্য জুড়ে রাজনৈতিক আগরণ চলেছে। এখন যে সমঝোতা আমরা এতদিন ভারতের সঙ্গে করে এসেছি তার কোন চেষ্টা যদি না করা হয়, আমি নিশ্চিত, আমাদের বিদ্রোহ, রক্তপাত ও বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হবে। ভারতে ইতিমধ্যেই হয়েছে এবং ভবিষ্যতে একে আরুণতে কতটা সামরিক শক্তি নিয়োগ করতে হবে তা এই মুহূর্তে কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারে না।” সমঝোতার মাধ্যমে নিম্নসঙ্গেই একটি জাতীয় অভ্যুত্থান এড়ানো গেছে। এই সমঝোতা, যার ফলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে, সম্ভব হয়েছে কারণ সারা দেশে যে জাতীয় অভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছে বহু চেষ্টা করেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তা রোধ করতে পারে নি। যারা মনে করেন যে একক প্রচেষ্টায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতা এনেছে তাঁদের এই সব তথ্য প্রাণধান করা উচিত।

আমাদের দেশের মূল্যবোধ আন্দোলনকে দ্বারা বিকৃত করতে উদ্যত হয়েছে তাদের আরও একটি ভাবপন্থা—তথ্য জ্ঞানিয়ে রাখা ভালো। সেটি হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর নতুন শক্তি সাম্য। ফার্সিবাণী হিটলারের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐতিহাসিক জয়ের ফলেই সাম্রাজ্যবাদ একেবারে ধুসে পড়েছিল। আর সেইজন্যই কংগ্রেসের নেতারা একটি সাধারণ জাতীয় অভ্যুত্থান ছাড়াই একটা বোকাপড়ার আসতে পেরেছিল।

আমাদের জাতীয় আন্দোলনের মূল্যায়ন করলে সহজেই বোকা যায় যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের দুটি দাবীই অসত্য—কংগ্রেস এককভাবে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল এবং কংগ্রেস একাই দেশের স্বাধীনতা এনেছিল। সত্য হল এই যে অনেক শক্তি, অনেক শ্রেণী, দল, সংগঠন দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল। শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক বিপ্লবী শক্তিগণ দ্বারা আমূল বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে ছিল, তারা নেতৃত্ব দখল করতে সমর্থ হয় নি। বুজোঁরাদের প্রতিনিধি কংগ্রেসই নেতৃত্ব অধিকার করতে ও রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল! যদিও সংগ্রাম ও বিপ্লবের পথ পরিণত হইয়াছিল—এক কৃষক বিদ্রোহ ও অন্যান্য বিপ্লবী গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও কল্পা হয়েছিল।

ফলে যদিও আমরা স্বাধীনতা পেরোছি তবুও ঔপনিবেশিক শাসনের যে ময়লা ও আধর্জনা জমিষ্টিল তা ধুয়ে ফেলা যায় নি। এমনকি স্বাধীনতার পরও বৃজোরাদের ক্ষুদ্র স্বার্থে কংগ্রেস নেতৃত্ব পচনশীল অনেক কিছুকে নতুন ঘাড়ে, সুন্দর প্রসাধনে সাজাত করে রক্ষা করেছিল। আজও আমাদের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বহু অভাবশ্যক কাজ অসমাপ্ত থেকে গেছে। যতদিন না সেই অসম্পূর্ণতা কাটিয়ে ওঠা যায় ততদিন দুঃখ, দারিদ্র এবং অপমান থেকে আমাদের মুক্তি নেই। যে আমল পরিবর্তনে বৃজোরী নেতারা বাধা দিচ্ছেন তা বাতীত দেশের সত্যিকারের পুনর্স্থাপন সম্ভব নয়; উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়ের দিকে বিরাট পদক্ষেপ সম্পর্কে কংগ্রেস নেতারা যত বড় বড় কথা বলুক না কেন।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বৃজোরী নেতৃত্ব দেশে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহের প্রাধান্য লাভের বিরোধিতা করেছিল। আজকে তারাই নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এদের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। সেইজন্যই এদের উচ্চকণ্ঠ মিথ্যা ঘোষণা করতে হচ্ছে যে কংগ্রেস একা স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল। ইতিহাসের এই বিকৃতি ছিঁড়ে ফেলার সময় এসেছে। বর্তমান পুস্তকখানি সেই কাজের সামান্য প্রচেষ্টা মাত্র।

—অনুবাদ : চিরলেখা ভট্টাচার্য

বহু কেন্দ্রবাদ ও বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন

সত্যেন্দ্র দত্ত

বর্তমান বিশ্বে যেমন সাম্যবাদী আন্দোলনের দ্রুত প্রসার ঘটছে, মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের তত্ত্বগত ও যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত আরো বেশী লোককে আকর্ষণ করেছে এবং মানব সভ্যতার নবরূপায়নের পথ অবশ্যই সমাজতন্ত্র প্রধান ও শক্তিশালী সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে দেখা দিচ্ছে অন্যদিকে আবার মার্কসবাদ বিরোধী পশ্চিমী তাত্ত্বিক ও পশ্চিমী ব্যক্তিরা নানা ধরনের নতুন নতুন তত্ত্ব “আকিস্কার” করে মার্কসবাদকে নস্যাৎ করার জন্য সাধা মত প্রয়াস চালাচ্ছেন। বহু কেন্দ্রবাদ সম্প্রতিকালে প্রচারিত এদের এমন একটি তত্ত্ব। শৃঙ্খলাপূর্ণ পশ্চিমী তাত্ত্বিকরা নন, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান প্রভৃতি দেশের বেশ কিছু বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিও এই তত্ত্বদ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন সম্বন্ধে ইতালী দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী অনেকাংশে বহুকেন্দ্রবাদ তত্ত্বের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। সেজন্যই আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বহুকেন্দ্রবাদ তত্ত্বের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে দেখা দিচ্ছে।

(১)

এই তত্ত্বের প্রবক্তাদের মূল বক্তব্য হলো : আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন আজ বহুধা বিভক্ত। কমিউনিস্টদের মধ্যে আদর্শগত একা বিশুদ্ধ প্রায়, বহু কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন মডেল অনুকরণ করে সাম্যবাদী আন্দোলন আঙ্গ পরিচালিত হচ্ছে। এদের মধ্যে ১৯১৭ সালের পর থেকেই স্বীয় প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বিস্তারের স্বার্থে সোভিয়েত রাশিয়া বিশ্বের সাম্যবাদী আন্দোলন নিরাস্তিত করছিল। সোভিয়েতের নেতৃত্ব ও নির্দেশে একটি মাত্র কেন্দ্র (মস্কো) থেকে বিভিন্ন দেশের সাম্যবাদী আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল। কমিউনিস্ট পার্টিগুলি দীর্ঘদিন শৃঙ্খলা সোভিয়েতের প্রাধান্য নয়, প্রভুত্ব ও স্বীকার করেছে। তত্কার আন্তর্জাতিকের (১৯১৯-১৯৪০) বিভিন্ন দলিল ও প্রমাণ করতে চান যে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার নাম

করে সোভিয়েত আধিপত্য বিস্তারই ছিল তৃতীয় আন্তর্জাতিকের লক্ষ্য, সোভিয়েত স্বার্থেই শেষ পর্যন্ত তৃতীয় আন্তর্জাতিক বিলুপ্ত হয় বলে এরা দাবী করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এক কেন্দ্রমুখিতা ছিল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান প্রবণতা। কিন্তু ১৯৪৮ সালে বিশ্ব সাম্যবাদী শিবির থেকে যুগোস্লাভিয়ার বহিস্কার ও কমিউনিস্ট চীনের অভ্যুদয়ের পর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভেদ শূন্য হয়, মতাদর্শ ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভিন্ন মত ও পথ অনুসরণ করার প্রবণতা পরিণামিত হয়। বিগত তিন দশকের বিশ্ব রাষ্ট্রনীতির ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে বহুকেন্দ্রবাদীরা বলেন যে মতাদর্শগত অভিন্নতা, মার্কসবাদ ও লেনিনবাদী চিন্তাধারার বিশ্বজনীন প্রাসঙ্গিকতা এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার প্রতি বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টদের আজ আর আনুগত্য নেই। জাতীয় ঐতিহ্য ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার দিকেই তাদের বৌদ্ধিক এখন বেশী। এদের মতে পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশ যে নীতি অনুসরণ করেছে তা স্বীকৃত মার্কসবাদী মডেলের বিরোধী। যুগোস্লাভিয়া পশ্চিমী ধাঁচের গণতন্ত্র অনুসরণ করেছে, অস্ট্রেলিয়া ওয়ারশো চুক্তি ও সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলছে, পোলাণ্ডে 'সলিডারিটি' মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেছে, রুম্যানিয়া চীন ও সোভিয়েতের মধ্যবর্তী পন্থা গ্রহণ করেছে। চীন সোভিয়েত বিরোধ, চীন-ভিয়েতনাম সংঘর্ষ, চীন কর্তৃক সোভিয়েতকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে আখ্যাদান, চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইত্যাদির উল্লেখ করে বহু কেন্দ্রবাদের প্রবক্তারা বলেন বিশ্ব কমিউনিস্ট ঐক্য আজ অতীত দিনের ঘটনার পর্যায়সিত হয়েছে।

'ইওরো-কমিউনিজম' তত্ত্বের মধ্যেও বহুকেন্দ্রবাদীরা দেখতে পান এক বিশেষ ধরনের সাম্যবাদী তত্ত্ব যা প্রচলিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মডেলের বিরোধী। স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্যামিউয়েলো ক্যারিয়োসের 'ইওরো-কমিউনিজম অ্যান্ড দি স্টেট' (১৯৭৭) গ্রন্থে বহুকেন্দ্রবাদ তত্ত্বের অনেক উপাদান পাওয়া যায় বলে এরা দাবী করেন। ইওরো-কমিউনিস্টদের বক্তব্যে প্রধান্য পায় 'স্ব-শাসিত, স্বাধীন ইউরোপ, 'ঐতিহাসিক সমঝোতা' ইত্যাদির কথা। সর্বস্বত্বের আন্তর্জাতিকতাবাদের এরা বিরোধী, সর্বস্বত্বের এক নামকরণের পরিবর্তে এরা 'ঐতিহাসিক ব্লক' (ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির নীতি) অর্থাৎ সর্বস্বত্বের নেতৃত্ব ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর মোচার মাধ্যমে সামাজিক রূপান্তর, ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দেন। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন

পথ ত্যাগ করার এরা পক্ষপাতী নন, বরঞ্চ গণতন্ত্রকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এরা বাস্তব। 'সমাজতন্ত্রের জন্য গণতন্ত্র' এই হলো এদের মূল্য ধোয়ান। এই নীতির বাস্তব রূপায়নের মাধ্যমে এরা শুধু এক ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনই নয়, এক নতুন ধরনের সমাজ বিন্যাসের সূচনা করতে চান। কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ ভূমিকার কথা ব্যারিলো প্রমুখের বক্তব্যে প্রাধান্য পায় না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইউরো-কমিউনিজম সামারিক সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রের পক্ষপাতী অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের চেয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব এদের অভিপ্রেত নয়। এরা ন্যাটো প্রভৃতি সামরিক জোটের প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করেন না বরঞ্চ আনবিক যুগে সামরিক জোটের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন। আর্থিক সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের কোন কর্মসূচী এদের নেই। ইউরো কমিউনিস্টদের এই ধরনের বক্তব্যের সঙ্গে বহুকেন্দ্রবাদীরা একমত। সর্বোপরি এই সব তাত্ত্বিকরা ইতালীর শ্রমজ কমিউনিস্ট নেতা তোগলিয়াস্তির ইয়ালটা দলিলের (১৯৬৪) অপব্যাখ্যা করে প্রমাণ করতে চান যে তোগলিয়াস্তি প্রমুখ নেতারাও ছিলেন বহুকেন্দ্রবাদের সমর্থক। তোগলিয়াস্তি তাঁর বক্তব্যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে স্বাভাবিকবাদের বিরুদ্ধে সচেতন থাকার প্রয়োজন সম্পর্কে যে সাবধান বানী উচ্চারণ করেন এরা অবশ্য তা এড়িয়ে যান। কমিনটোর্গ ও কমিনফর্ম প্রভৃতি সংস্থাগুলির বিলুপ্তি বহুকেন্দ্রবাদের বক্তব্যই সমর্থন করে বলে এরা দাবী করেন।

বহুকেন্দ্রবাদ তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করলে এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে এই তত্ত্ব একপেশে ও প্রচারণমূলী। বহুতর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন কোন যান্ত্রিক সূত্রায়নের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠে নি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীই বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টদের মধ্যে আদর্শ ও কর্মসূচীর অভিন্নতা এনে দিয়েছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার মূল্যায়নে কমিউনিস্টদের মধ্যে সম-দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিচর মেলে তা মূলতঃ আদর্শগত ঐক্য ও তত্ত্বকে নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাও আকস্মিক ও বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠে নি। শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আন্তর্জাতিকতার মনোভাব প্রসারিত হয় এবং "সর্বদেশের শ্রমজীবী মানুষ ঐক্যবদ্ধ হও" এই বিশেষ আহ্বান এক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতেই সাধকতা লাভ করে। শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে বিভিন্ন

মুহুরে ঘটে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসি-

বাল্য পরামর্শ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবাত্মক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আন্তর্জাতিক
 ত্রাণিক ঐক্য আরো শক্তিশালী হয়ে দেখা দেয়। সর্বদেশের প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ
 যেখানে এক ও অভিন্ন, সকলের যেখানে এক সাধারণ শত্রু, দৃষ্টিভঙ্গী ও সংগ্রাম
 পদ্ধতি সেখানে অভিন্ন হবে, এটাই স্বাভাবিক। এই বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তি সত্ত্বেও
 বৃজেরা তাত্ত্বিকরা শ্রমিকশ্রমিকের আন্তর্জাতিকতা আজ বিলুপ্তপ্রায় বলে তাদের
 প্রচার অব্যাহত রাখেন।

(২)

বহুকেদ্রবাদের তাত্ত্বিক অপারতা সত্ত্বেও এরা যে সমস্ত যুক্তি দেন তার
 আলোচনা প্রয়োজন কারণ “মার্কসবাদী” মহলেও এদের নিয়ে যথেষ্ট ট্রি-ট্রি
 করা হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কোন স্বাধীনতা নেই, এক
 কেন্দ্র বা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে মস্কোর আধিপত্য
 বহুকেদ্রবাদীদের প্রধান আলোচনার বিষয়। সাম্যবাদী তত্ত্বের সঙ্গে যাদের
 প্রাথমিক পরিচয় আছে তারাও জানেন মার্কসবাদ লেনিনবাদের মৌল নীতির
 প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বাস্তব পরিস্থিতি ও
 দেশের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ দেশের সমাজ রূপান্তরের
 নীতি ও পদ্ধতি স্থির করে। লেনিন স্পষ্ট ভাষায় একাধিকবার ঘোষণা করেছেন
 যে ধরমাসেন মার্কস বা চুক্তি করে বিপ্লব হয় না। তথাকথিত বিপ্লব রপ্তানীর
 করারও তিনি বিরোধী ছিলেন। সোভিয়েতের অভিজ্ঞতাকে অন্ধভাবে অনু-
 করণ করার বিরুদ্ধে বারবার তিনি সাবধান করে দিয়েছেন। ঐতিহাসিক
 বস্তুবাদের নামে বিভিন্ন দেশের সমাজ বিপ্লবের বাস্তব পরিস্থিতিতে একই ভাবে
 চর্চিত করা ও একই ধাত অনুসরণ করার মনোভাবকেও তিনি সমালোচনা
 করেছেন। তত্ত্বের দিক থেকে এই ধরনের মনোভাবকে আদিম” এবং বাস্তবের
 দিক থেকে হাস্যকর বলে অভিহিত করেছেন। ‘সাম্যবাদী কমিউনিস্ট শিশু-
 সুলভ বিশৃঙ্খলা’ গ্রন্থে লেনিন জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে
 স্বাধাধভাবে সাম্যবাদের মূলমন্ত্র প্রয়োগের ক্ষণেই মার্কসবাদের সার্বিকতা নিহিত
 বলে উল্লেখ করেছেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন দলিলেও
 এই কথা বারবার কলা হয়েছে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দ্বারা চালিত কমিউনিস্ট
 নীতিগতভাবে বিপ্লব রপ্তানী ও প্রতি বিপ্লব রপ্তানী—এই উভয়েরই বিরোধী।
 সমাজতন্ত্রের সাফল্য সম্বন্ধে আস্থামান হলেও বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট নেতারা
 একই ভাবে এবং একই পথ অনুসরণ করে বিপ্লব সাধনের কথা কোনদিনই চিন্তা
 করেন নি। বরঞ্চ নানা বৈচিত্র্য ও স্বকীয়তা সমাজ গঠন

তান্ত্রিক সমাজ গঠনে অগ্রসর হবে, এ কথাই তাঁরা জোর দিয়ে বলেছেন। এতদ সত্ত্বেও বহু কেন্দ্রবাদীরা যখন এক-কেন্দ্রমুখীনতার কথা বলেন তখন তাদের উদ্দেশ্য সন্দেহে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ জাগে।

ভূতীয় আন্তর্জাতিকের বিভিন্ন কংগ্রেস ও সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সিদ্ধান্ত সমূহ পর্যালোচনা করলে বহু কেন্দ্রবাদীদের বক্তব্যের নম্বরূপ ধরা পড়ে। আন্তর্জাতিক কংগ্রেস ও সম্মেলনগুলিতে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি'গুলি অবাধ আলাপ-আলোচনা ও স্বাধীন মত প্রকাশের মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯২০) ঔপনিবেশিক প্রশ্ন-সংক্রান্ত সমস্যা, ১৯২২ এর কংগ্রেসে শ্রমিকদের যুক্ত মোর্চা ও সপ্তম কংগ্রেসে (১৯৫৫) যুক্তফ্রন্ট ইত্যাদির সিদ্ধান্ত বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের পরই গৃহীত হয়। প্রথম থেকেই ঘোষণা করা হয় আন্তর্জাতিক হলো স্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি'গুলির স্বেচ্ছাচালীন সংস্থা। সপ্তম কংগ্রেসে প্রকাশো বলা হয় সাংগঠনিক ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টি'গুলির নিজস্ব আত্মসম্মত ব্যাপার; রাজনৈতিক বিষয়ে বিদেশের কমিউনিস্ট পার্টি' উপদেশ বা মতামত প্রকাশ করতে পারে কিন্তু সাংগঠনিক ব্যাপারে কোন মত বা নির্দেশ দেওয়ার অধিকার অন্য কমিউনিস্ট পার্টি'র নেই। ১৯৫৭ সালে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনে যে দলিল গৃহীত হয় তাতে পুনরায় ঘোষণা করা হয় যে বিভিন্ন দেশ ভিন্ন পল এবং বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থা অনুযায়ী সমাজতন্ত্রের দিকে পৌঁছানোর লক্ষ্য সচেতন হবে। একাধিক পার্টি'র দলিলেও (১৯৬০) বলা হয় সব মার্ক'সবাদী-লেনিনবাদী দলই স্বাধীন ও সমান; নিজ নিজ দেশের বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী মার্ক'সবাদ-লেনিনবাদের মূলসূত্র যথাযথভাবে অনুধাবন করে তারা তাদের নীতি নির্ধারণ করবে এবং পরস্পরকে সাহায্য করার ব্যাপারে দায়িত্ববদ্ধ থাকবে। ১৯৬৯ সালে ৭৫টি কমিউনিস্ট পার্টি'র সম্মেলনে কমিউনিস্ট আন্দোলনে মত পার্থক্য স্বীকার করেও প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতাবাদের তত্ত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করা হয়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, শান্তির স্বপক্ষে ও জাতীয় মুক্তির জন্য শোষণ ও অত্যাচার বিরোধী বিভিন্ন সামাজিক শক্তিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব পালনে শ্রেণী সচেতন শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। পরিবর্তিত সামাজিক ও বিশ্ব পরিস্থিতিতে মার্ক'সবাদের তত্ত্বগত ভিত্তিকে সঠিকভাবে সম্প্রসারণের উপর মনোনিবেশ করা হয়। যেহেতু ভিন্ন পরিবেশে

থাকা স্বাভাবিক—১৯৬৯ এর সম্মেলনে তা স্বীকার করা হয়। তৎকালীন দিক থেকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন যেমন কখনও কোন বিশেষ দেশের বিশেষ আধিপত্য স্বীকার করে নি, বাস্তবেও তার কোন নজির পাওয়া যায় না। ক্যারিলোর মত সোভিয়েত সমালোচকও তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনও স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেনি বা নির্দেশ দেয় নি। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি নিয়েছে তার জন্য পূর্বাঙ্কে সোভিয়েত পার্টির সম্মতি প্রয়োজন হয় নি। তবে সোভিয়েত পার্টির সঙ্গে অনেক সময়েই তারা অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছেন ও পরামর্শ নিয়েছে বলে ক্যারিলো জানিয়েছেন। এরপরও যারা সোভিয়েত প্রাধান্য বা আধিপত্যের কথা বলেন, তাদের আসল উদ্দেশ্য যে মার্কসবাদকে হয়ে প্রতিপন্ন করা তা বৃকতে সম্মত লাগে না।

জাতীয় অর্থনৈতিক ও জাতীয় সংকীর্ণতাবাদ কমিউনিস্টদের আত্মসম্মতি করে রেখেছে, আন্তর্জাতিকতার পথ তারা পারহার করেছেন, এই ধরনের অভিযোগও বহুক্ষেত্রবাদের বক্তব্যে প্রকাশ পায়। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলির সক্রিয় সাহায্য, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সোভিয়েত ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা, পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদ (সি-এম-ই-এ) ও গুয়ারাণো চুক্তির কার্যাবলী কোন বিশেষ দেশ বা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে না, বরং বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্পর্ক নিশ্চয় এক নতুন ও প্রসারিত ধর্মভ্রাতার সূচনা নির্দেশ করে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের ভূমিকা, ডিয়েত্তনাম, অ্যাঙ্গোলা ও সাম্প্রতিককালে নিকারাগুয়ার প্রতি সংঘটিত স্থাপনে কমিউনিস্টদের সহযোগিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কমিনটার্ণ ও কমিনফর্ম বিলুপ্তির পিছনে বহুক্ষেত্রবাদীরা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতার অবসান দেখতে পান কিন্তু বুদ্ধকালীন ও বুদ্ধপরবর্তী ভিন্ন পরিমিতার জন্যই এই সংস্থাগুলি বিলুপ্ত হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য নতুন কাঠামো তৈরি হয়। বি-পাক্ষিক ও রূপ-পাক্ষিক সম্মেলন, সমাবেশ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে কমিউনিস্ট প্রান্তিক আর দৃঢ় হয়। যে ইউরো-কমিউনিজমের উৎসে উপর বহুক্ষেত্রবাদীরা নির্ভর করেছিলেন তার প্রভাব আজ বিলুপ্তপ্রায়।

সমাজতন্ত্র বিরোধীরা এবং সংস্কারবাদীরা নতুন নতুন প্রচারণা চালিয়ে বিকৃত তথ্য পরিবেশন করছেন। স্বাক্ষরিত সত্যের বিরুদ্ধে প্রচার করছেন।

পন্থায় পৌঁছেছে এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন দেশে সামাজিক রূপান্তর ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজ ত্বরান্বিত হচ্ছে।

(৩)

সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথ কণ্টকবিশীন নয়। নানা বাধা-বিপত্তি ও সমস্যার মধ্য দিয়ে অগ্রণী শ্রেণীর নেতৃত্বে সামাজিক বিপ্লব সংগঠিত হয় এবং অবস্থার উন্নতির কিছু কিছু ব্যতিক্রমও স্বাভাবিক। কিন্তু বহু-কেন্দ্রবাদীরা কোথাও কোন ব্যতিক্রম দেখলে সংশয় প্রকাশ করেন। সমাজতন্ত্রের বিপদ আসন্ন বলে প্রচার শুরু করেন। কমিউনিষ্ট শিবিরের অনেকেই তাদের প্রধান আলোচনার বিষয় অথচ বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সাম্প্রতিক গতিধারা বিশ্লেষণ করলে এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা আরো ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে, বিভিন্ন কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক ও সহজ হয়ে উঠছে। সম্প্রতিকালে অনুষ্ঠিত সি. পি. এস. ইউ. ও অন্যান্য কয়েকটি পার্টির কংগ্রেসের গৃহীত সিদ্ধান্ত পর্য্যালোচনা করলে এই বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

সোভিয়েত পার্টির সপ্তবিংশ কংগ্রেস : কংগ্রেসে গৃহীত পার্টির কর্মসূচীতে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে সোভিয়েত পার্টি সমাজতান্ত্রিক সমাজকে উন্নত করে তোলার ও কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজকর্মে এক প্রধান আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্য-কর্ম বলে মনে করে। এই কর্তব্যকর্মের ফলে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুরক্ষিত হবে, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর ও সমগ্র মানব জাতির স্বার্থ বৃদ্ধি পাবে বলে সোভিয়েত পার্টি মনে করে। “সি. পি. এস. ইউ. বিদেশের কমিউনিষ্ট পার্টিসমূহের সমস্যা ও অভিজ্ঞতা গভীরতার সঙ্গে বিচার বিশ্লেষণ করে। বিদেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির রননীতি রনকোশল উন্নত করার প্রচেষ্টা, একচেটিয়া সংস্থা বিরোধী, বৃহৎ বিরোধী ক্ষেত্র ব্যাপকতর শ্রেণীজোট গঠনের প্রয়াস ও শ্রমজীবী জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সংগ্রামকে উপলব্ধির মনোভাব নিয়ে বিচার করে বলে কর্মসূচীতে ঘোষণা করা হয়। কর্মসূচীতে আরো বলা হয় যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মত পার্থক্যের দরুন কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম যাতে বাহত না হয় সে দিকে নজর দেওয়া উচিত। সোভিয়েত পার্টি অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্কের আরো বিকাশ ও শক্তিশালী করার

দেশগুলির মধ্যে সংহতি

শাস্তি ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বিজয় ঘোষণা করে। দ্বি-পক্ষীয় ও বহু-পক্ষীয় মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শোষণশ্রেণীর পরিোধ সম্প্রসারণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট দেশগুলির মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধির জন্য সোভিয়েত পার্টি প্রয়াস চালাবে বলে কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা ও সামাজিক উৎপাদনের অগ্রগতি সুনিশ্চিত করার জন্য ও অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে অসামান্য দূর করার জন্য সুনির্দিষ্ট ভূমিকার উপর কংগ্রেস গুরুত্ব দেয়। এক কথায় প্রগতিশীল আন্তর্জাতিকতার বিভিন্ন নীতির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে একাবক কর্মসূচী অনুসরণের প্রতিশ্রুতি সপ্তবিংশ কংগ্রেস থেকে পাওয়া যায়।

কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস : ফিদেল কাস্তো তার প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংহতি আরো শক্তিশালী হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও প্রগতিশীল আন্তর্জাতিকতার প্রতি সোভিয়েত পার্টির দায়িত্ব ও ভূমিকার জুসসী প্রশংসা করা হয় কংগ্রেসে। কাস্তো কিউবার জনসাধারণ ও কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে গ্রানাতা, এল সালাভদোর ও বিশেষ করে নিকারাগুয়াকে সক্রিয় সাহায্য দানের কথা ঘোষণা করেন।

ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেস : ১৯৮৬ এর কংগ্রেস উপলক্ষে প্রবর্তিত প্রতিবেদনে পার্টির সাধারণ সম্পাদক আলোসান্সো নাভো ইতালি পার্টির নিজস্ব মত ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মত পার্থক্যের কথা জানিয়ে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দেয় এবং বলেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ভিন্ন ও বিকল্প পন্থার অভ্যুদয় অনেকটা অবশ্যস্বাভাবী। আদর্শগত ভিন্নমত এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে মত পার্থক্য সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংহতির প্রতি কংগ্রেসে সমর্থন জানান হয় এবং সোভিয়েত নেতৃত্বে গঠনমূলক ভূমিকার প্রশংসা করা হয়।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষাটশ কংগ্রেস ও তার পরবর্তী ব্যাখ্যা : ষাটশ পার্টি কংগ্রেসে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা সাম্যবাদী আদর্শের মূলধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হলেও স্বাধিকার আন্তর্জাতিকতার প্রতি চীনের আস্থা প্রকাশ করা হয়। মাও আমলের অবশ্যস্বাভাবী বিহ্বলতার তত্ত্বও চীনা নেতারা অস্বীকার করেন। সোভিয়েতের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের আশা প্রকাশ করা হয় কংগ্রেসের

ভঙ্গীর পরিবর্তনের অনেক আভাস পাওয়া যায়। চীন সম্বন্ধীয় পার্শ্বচী বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, ইদানীং চীনের পর-পরিচায় সোভিয়েত ও সমাজবাদী দ্বন্দ্বিতা সম্বন্ধে অনেক ইতিবাচক মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে। বস্তুতঃ দ্বাদশ কংগ্রেসের পর থেকেই এই নতুন চিন্তা শুরু হয়। চীনের সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, (১) সোভিয়েত মূলতঃ একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, (২) সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের দিকে সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে, (৩) চীন বিষয়ে সোভিয়েতের অবদান ও পড়াশোনা দশকে সোভিয়েত সাহায্যের ভূমিকা স্বীকার করা হয়, (৪) সোভিয়েতকে “সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী” হিসেবে আর উল্লেখ করা হয় না এবং (৫) যুদ্ধের বিধাত আবহাওয়া থেকে দুনিয়াকে মুক্ত করার দায়িত্ব সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলিকেই নিতে হবে, এ কথা স্বীকার করা হয়।

পোলাণ্ডের ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির দশম কংগ্রেস : কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক প্রতিবেদন উপস্থাপিত করে জার্মানিস্থ পোলিশ সংকটের কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং কার্যক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের বিকৃতির উৎস নির্দেশ করে বলেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিন্তাধারা পোলাণ্ডের জাতীয় স্বতন্ত্রতাবোধের গভীরে প্রবেশ করেছে। সাময়িক বিচ্ছিন্ন সত্ত্বা ও সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধ, শ্রমিকশ্রমের আন্তর্জাতিকতার প্রতি অবিচল নিষ্ঠার কথা কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয়।

জার্মানির সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির একাদশতম কংগ্রেসেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও প্রলোভনীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ করা হয়।

তাহাড়া বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান ও পার্টি দলিলে সমাজ-তান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বের শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থরক্ষার দায়বদ্ধতার স্বীকৃতিও উল্লেখ করা হয়েছে (সোভিয়েত সংবিধানের ৩০ নং ধারা, রুম্যানিয়ার শাসনতন্ত্রের ১৪ নং ধারা ইত্যাদি)। আন্তর্জাতিকতার প্রতি কমিউনিস্টদের আর আনুগত্য নেই বহু-কেন্দ্রবাদীদের এই অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই।

(৪)

বর্তমান বিশ্বে সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তির তর্কাতীত সাফল্য বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের পরিধিকে আরো প্রসারিত করেছে। পৃথিবীর ১০০টি দেশে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা এখন ৮ কোটির উপর (আনুমানিক ৮ কোটি, ইতালি ১৭ লক্ষ

ইত্যাদি)। সামান্যদের প্রভাব বৃদ্ধি সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মতানৈক্য ও মতপার্থক্য অনেককে উদ্ভিন্ন করে তুলেছে। বর্তমান সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে পুরোপুরি মতৈক্য বিদ্যমান থাকবে এটা আশা করা যায় না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কাঠামোর মধ্যেই বিভিন্ন কারণে কিছু কিছু নেতিবাচক প্রকণতা দেখা দিতে পারে কিন্তু তা মার্কসবাদের বিপ্লবী চরিত্র ও আদর্শগত ভিত্তিকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। মতপার্থক্যের বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি প্রকণতার আলোচনা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ সমাজতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ (চীন-সোভিয়েত, চীন-ভিয়েতনাম) অনেককে শঙ্কিত করে তুলেছে। এক সময় ভাবা হত সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিকাশ ঘটবে একইভাবে কিন্তু বিগত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতার দেখা গিয়েছে সমাজতন্ত্র কত বিভিন্নমুখী ও জটিল হতে পারে। একই ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া হয় সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটবে এক এবং অভিন্ন পদ্ধতিতে। যদিও বিকল্পগতভাবে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের মৌলিক স্বার্থ এক ভাব-ও নির্দিষ্ট জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক পটভূমি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিকাশে ভিন্নতা নিয়ে আসতে পারে। বিভিন্ন দেশে শ্রমিকশ্রেণীও ক্ষমতায় এসেছে ভিন্ন পদ্ধতিতে। অক্টোবর বিপ্লব সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বহারার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে কিন্তু বুলগেরিয়ায় বহন শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় আসে তখন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পতনই পূর্ব ইউরোপের অধিকাংশ দেশে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র স্থাপন সম্ভব করে তুলেছিল। সুতরাং এক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ন করতে হয়েছিল। চূড়ি ও বিচ্যুতি এই পরিস্রোক্ষিতে দেখা দেওয়া স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ অনেকেই ধারণা করেন যে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা লাভের পর নিরুপদ্রবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পর্ব সমাধা হবে। সমাজব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্র অসুবিধামুক্ত, চূড়ি ও বন্ধনহীন এ প্রকার বুদ্ধিরাসদের। সমাজতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বিকাশের ভিন্ন পার্থক্য, ভিন্ন ঐতিহাসিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা ইত্যাদি কারণেও বিরোধ দেখা দিতে পারে।

দেখা দিতে পারে। কমিউনিস্ট পার্টি'গুলাি এই ধরনের সীমাবদ্ধতার কারণ খুঁজে বের করে এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও দেশজ অবস্থার কথা বিবেচনা করে স্বাধীনভাবে নীতি নির্ধারণ করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংহত করার চেষ্টা করে।

তৃতীয়তঃ জাতীয় মূল্য আন্দোলনের বিভিন্নতা, কৌশলগত প্রথের নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছে, চিরাচরিত চিন্তা ও পদ্ধতি অনুসরণ করে বাস্তব অবস্থার মোকাবিলা করা যাচ্ছে না। সংগ্রাম পদ্ধতির মধ্যেও নানা অভিনবত্ব আসছে এবং এতে মতবৈধতা দেখা দিচ্ছে।

চতুর্থতঃ, সংগ্রামের পরিধি বিস্তৃত হওয়ার প্রলেভারিয়ন মানসিকতার প্রতি আনুগত্য নেই এমন সব মানুষ সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে কমিউনিস্ট রাজনীতির আওতে আসছেন। পুরোনো ও সম্প্রসারিত মানসিকতা দ্বারা আবদ্ধ এই বিরাট জনসমষ্টি সাম্যবাদী আন্দোলনে নানা জটিলতা সৃষ্টি করছেন।

পঞ্চমতঃ, অনেক সময় জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় ঐতিহ্য ও গর্ববোধ প্রণী সচেতনতাকে যথার্থোপায়ে মূল্য দিতে অক্ষম হয় এবং সেজন্য নানা ধরনের ডান কিংবা বাম বিচ্যুতি দেখা যায়।

ষষ্ঠ, বিশ্ব সাম্যবাদ পুরোনো পদ্ধতি পাণ্টে নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। সাময়িক হস্তক্ষেপ, অভ্যুত্থান ইত্যাদি মারফৎ মূল্য আন্দোলন ধমন করার কর্মসূচী নিচ্ছে এবং এর ফলে সাময়িকভাবে কোথাও কোথাও মূল্য আন্দোলনের অগ্রগতি বাহত হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরেও এ নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিচ্ছে।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুটি ও বিচ্যুতির মধ্যে পরিবর্তনশীল পৃথিবীর পরস্পর বিরোধী জটিল প্রকণতাই প্রতিফলিত হচ্ছে বলে মার্কসবাদীরা মনে করেন। বহুকেন্দ্রবাদীরা যতই সংশয় প্রকাশ করুন না কেন মার্কসবাদের মতোমতো মধ্যেই আধুনিক যুগ প্রবণতার দ্ব্যম্বিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণ মারফৎ কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি ত্বরান্বিত ও সংহত করা সম্ভব। বিশ্ব সমাজ এক উন্নত অর্থ ব্যবস্থা, এক সমৃদ্ধ বৌদ্ধিক পরিবেশ এবং রাজনৈতিক

● সাময়িক সামর্থ্য বিশিষ্ট শক্তিশালী সমাজ গঠনের দিকে এগিয়ে চলেছে—

জাতির মুক্তির কমিউনিস্ট আন্দোলন দেশেই বিস্তারিত হয়েছে।

পুস্তক ও দলিল :

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও পুস্তকে বহুকেস্‌বাদের আলোচনা পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ : Peter Hardy : Why do Communist Parties advocate Pluralism, WORLD POLITICS (vol XXXII No. 4), পুস্তক : Charles Elliot and Carl Linton : Marxism in contemporary West, George Robert urban : Euro-communism, its roots and Future in Italy and elsewhere.

২। কমিউনিস্ট আন্দোলন :

Zagladin : The role and prospect of the Communist movement.

Socialism : Theory and practice.

Information Bulletin : Documents of the communist and workers parties (New Delhi) সি সি এস
ইউর সপ্তাবিংশ কংগ্রেসে গোরবাকভের প্রতিবেদন
এবং ঐ কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচী।

চীন :

The Twelfth National Congress of the CPC. (Beijing)
WORLD POLITICS (Vol XXXVII No. 4)

ইতালী :

The Italian Communists সি সি আই কতৃক প্রকাশিত।

পাঞ্জাব সমস্যা

সত্য পাল ডাঙ

১। পাঞ্জাবের বাইরে অনেকেই পাঞ্জাব সমস্যাটিকে যত সরল মনে করেন, সমস্যাটি তত সরল নয়। সমস্যাটি বেশ জটিল এবং বহু-মুখী।

২। স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারত যে একটি স্বাধীন বিকাশের পথ (যদিও পুঞ্জিবাদী) গ্রহণ করেছে এবং একটি নয়া ঔপনিবেশিক দেশে পরিণত হতে অস্বীকার করেছে এতে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ খুবই রুষ্ট। ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, উপনিবেশবাদ বিরোধী এবং বিশ্বশান্তির সপক্ষে গৃহীত নীতি, এই নীতি ত্যাগ করতে ভারতের অস্বীকৃতি আর সেই সংগে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে বন্ধুত্ব মার্কিন শাসক গোষ্ঠীকে ভারতের বোরতর শত্রুতে পরিণত করেছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে যে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে তাতে তারা সন্তুষ্ট নয়। ভারতকে একটি ক্রীড়নক রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রচেষ্টাতেই তারা একে অস্থিতিশীল, এমন কি বিচ্ছিন্ন করে দিতে উদ্যোগ নিয়েছে। আর একাজে তাদের একটি কৌশল আছে। এই কৌশলেরই অংশ হিসেবে তারা ঔর্ধ্বাভিত্তিক জাতির তত্ত্বকে খুব বড় করে জাগিয়ে তুলেছে। মূলতঃ এই তত্ত্বটিকে ১৯৪৭ সালের আগে ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও তাদের ভাবোদাররা শৃঙ্খলিত মুসলমানদের সম্পর্কে নয়, শিখদের সম্পর্কেও উৎসাহ দিয়েছিল। কয়েক বছর আগে চণ্ডীগড়ে শিখ এডুকেশনাল কনফারেন্সে এই পুরোন তত্ত্বকেই এক মার্কিন নাগরিক গঙ্গা সিং খীলন মাটির তলা থেকে বার করে আবার দিনের আলোর প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি সরবে ঘোষণা করলেন যে 'শিখেরা হ'ল একটি স্বতন্ত্র জাতি।' জাতিতত্ত্ব, বিচ্ছিন্নতাবাদী 'খালিস্তান' দাবীর তত্ত্বগত ভিত্তি হিসেবে একে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সকলেই এখন স্বীকার করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতে পাকিস্তানী শাসকরা খালিস্তানী সংঘাসবাদীদের এমন এক পরিদৃষ্ট সৃষ্টি করতে (নিরীহ মানুষদের হত্যা প্রভৃতির দ্বারা) প্রলিঞ্চন দিচ্ছে যার ফলে হিন্দুরা পাঞ্জাব থেকে স্থানান্তরে আর শিখেরা

এই কারণে

তারা পাজাবে আর পাজাবের বাইরে হিন্দু শিখ দাস্তা বাধাতে তৎপর হয়ে উঠেছে।

অবশ্য একথা ঠিক যে পাজাব সমস্যা আজকের মত এত তীব্র হয়ে উঠত না যদি না খালিস্তানী চরমপন্থীরা আভ্যন্তরীণ কিছুর ঘটনাকে তাদের নিজস্বের স্বার্থে ব্যাখ্যার করতে সমর্থ হ'ত।

০। ঐতিহাসিক কারণেই, সবুজ বিপ্লব পাজাবেই সবচেয়ে সাক্ষাৎভাবে ফলিত হয়েছে। এই বিপ্লবের ফলে পাজাবে একটি শক্তিশালী পুঞ্জিবাদী ভূস্বামী ও ধনী কৃষক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। এর ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উচ্চাকাংক্ষারও সৃষ্টি হয়েছে। এখানে কেবল দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি। যখন দরিদ্র ও মধ্য চাষীরা সঠিকভাবেই তাদের উৎপন্ন প্রবোর ন্যায্য মূল্য চায় তখন এইসব পুঞ্জিবাদী ভূস্বামী আর কুলাকরা চায় মুনাবা করতে এবং তারা সম্বোধিত বাজার দরে আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের পণ্য বিক্রয় করার অধিকার চায়। ভারতের সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথা তারা মোটেই চিন্তা করে না।

একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের অবস্থান আর সেই সংগে রাজ্যগুলিকে অধিকতর ক্ষমতা দেবার যে ন্যায্য দাবী তার বিপরীতে তারা প্রায় সার্বভৌম ক্ষমতা দাবী করে।

পাজাবে ধনী চাষী ও পুঞ্জিবাদী ভূস্বামী আর সেই সংগে দরিদ্র ও মধ্য চাষীদের বেশীর ভাগই হল ধর্ম শিখ আর বর্ণে জাতি। ক্ষেত্রে মজদুরদের একটি বড় অংশও শিখ অবশ্য তারা তফসিলি সম্প্রদায় ভুক্ত। নিজস্বের সংকীর্ণ শ্রেণী স্বার্থে এইসব পুঞ্জিবাদী ভূস্বামী আর কুলাকরা শিখদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে তাদের নেতৃত্বে সমবেত করার জন্য এই ধর্ম ও বর্ণের প্রয়োগকে ব্যবহার করে। তাদের শ্রেণী দাবীগুলিকে তারা শিখদের দাবী বলে ভুলে ধরে। এইসব ক্ষেত্রে মজদুরদের, যাদের শিখ বলে গণ্য করা হয় না, বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্যই তারা বর্ণের প্রয়োগ ব্যবহার করে।

আকালি দলের নেতৃত্বে এইসব শোষণ শ্রেণীগুলিকেই প্রতিনিধিত্ব করে। এটি একটি সাম্প্রদায়িক দল এবং ধর্মের প্রত্যেক এরা স্বতন্ত্র সম্ভব কার্য লাগায়। এদের এই তত্ত্ব যে ধর্ম ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য, যে শিখরা হ'ল একটি স্বতন্ত্র জাতি আর ভারতে শিখরা হ'ল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক—এই মিথ্যা প্রচার—এসবই শিখদের মধ্যে শোষণ শ্রেণীগুলির বিশেষ করে গ্রামীণ কাসেমী স্বার্থবাদীদের

প্রস্তাব নয়। এই প্রস্তাবে একটি দুর্বল কেন্দ্র যুক্ত ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে ধর্মভিত্তিক পাঞ্জাব গঠনের দাবী জানানো হয়েছে, প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে কেন্দ্রের হাতে শৃঙ্খল চারটি বিভাগের (পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, মূদ্রা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা) দায়িত্ব থাকবে অথচ এইগুলি পরিচালনার জন্য কোন স্বাধীন আর্থ ব্যবস্থা বা আর্থিক ক্ষমতার কথা বলা হয় নি। এই প্রস্তাব গৃহীত হলে ভারতের কোন সাধারণ আর্থ ব্যবস্থা থাকবে না এবং এইভাবে স্বাধীন খালিস্তান গঠনের জঁম তৈরী করা সহজ হবে।

আকালি দলের এই অবস্থান উগ্রপন্থীদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। অবশ্য তাই বলে আকালিদের মধ্যে যে কোন বিরোধ নেই, তা' নয়। যারা শিল্প বাণিজ্যের প্রদ্ব সমেত সর্বভারতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করে তারা নরমপন্থা গ্রহণ করেছে আবার তাদের মধ্যেই এমন অনেকে আছে যারা খালিস্তানের সমর্থক বলে পরিচিত যদিও তারা নিজেরা তা অস্বীকার করে।

৪। পাঞ্জাবে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের এবং ভাষার প্রদ্বটি ধর্মের প্রদ্বের সংগে মিশে গেছে এবং একটি সাম্প্রদায়িক চরিত্র লাভ করেছে। আকালি নেতৃত্ব মূলতঃ একটি শিখ রাজ্যের দাবী জানিয়েছিল তারপর তাদের দাবী হ'ল একটি পাঞ্জাবী ভাষাভাষি রাজ্য যেখানে জনসংখ্যার অন্ততঃ ৬০ শতাংশ হবে শিখ। এতে উদীয়মান শিখ বুদ্ধিজীবীদেরই সুবিধে হবে। অন্যদিকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা একটি মহান পাঞ্জাবের দাবী পেশ করেছিল যেখানে শিখেরা হবে একেবারেই সংখ্যালঘু।

আকালিরা পাঞ্জাবী ভাষার দাবীকে শ্রান্তভাবে উত্থাপন করেছিল যেন এটি শিখ ধর্মেরই একটি অংশ। অন্যদিকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা পাঞ্জাবী হিন্দুদের পাঞ্জাবী ভাষাকে একেবারে বর্জন করতে আহ্বান জানিয়েছিল। পাঞ্জাবে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের অবস্থানটাই গ্রহণ করেছিল। ক্যামডেনস্ট্রা সঠিক অবস্থান গ্রহণ করলেও তত বেশী প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় নি।

আকালি নেতা সন্ত ফতে সিং, যিনি ছিলেন জঁমির মালিক কৃষক শ্রমীর প্রতিনিধি, তিনি শহুরে শিখ বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতিনিধি মান্দারি তারা সিং কে সরিয়ে আকালিদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আকালিদলের নীতিতে ভালোর দিকে কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন, যদিও তাতে আন্তরিকতার

না দিয়ে একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। কিছু কিছু পাল্লানী ভাষাভাষি অঞ্চল হারিয়ানাকে দেওয়া হয়েছিল আবার কিছু ভাষাভাষি অঞ্চল পাল্লাবেই থেকে গিয়েছিল।

যখনই আকালিদের নিজেদের প্রয়োজন হ'ত তখনই তারা এই প্রকল্পটিকে সমস্ত শিখদের প্রশ্ন বলে তুলে ধরে হেঁচকি আর যখনই তাদের স্বার্থ ভিন্ন হ'ত তারা এই সমস্ত বিবরণকে খামাচাপা দিয়ে রাখতো।

ভালোর দিকে যেই অগ্রগতি শুরু হয়েছিল তা হঠাৎ থেমে গিয়েছিল এবং সবুজ বিপ্লবের একটি রাজনৈতিক পরিণতি হিসেবে বিপরীত দিকে ঘাটা শুরু হয়েছিল।

ভারত যখন বিভক্ত হল তখন ভারত সরকার কর্তৃক ১০০ কোটি টাকা দেওয়ার বিনিময়ে পাকিস্তানকে রুডি ও বিরাসের উদ্ভূত জলের ভাগ ছেড়ে দিতে আবেদন করা হ'ল। প্রধান যুক্তি হ'ল যে এই উদ্ভূত জল ভারতের প্রয়োজন শূন্য পাল্লাবের জন্য নয়, হারিয়ানাও তখন পাল্লাবের অঞ্চলভূক্ত। রাজস্থানের জন্যও এই জলের প্রয়োজন। তাদের ভাগ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হ'ল। কোন দিক থেকেই কোন আপত্তি ওঠে নি। পরে নবগঠিত পাল্লাব আর হারিয়ানার মধ্যে আগের পাল্লাবের জলের যে অংশ ছিল তার ভাগ্যভাগি নিয়েই বিরোধ বাধল। এক সময়ে পাল্লাবের প্রতি কিছু অবিচার করার চেষ্টা হয়েছিল। কলমই এর প্রতিবাদ করেছিল। ১৯৮০ সালে আকালি দল নদীর জল সংক্রান্ত প্রশ্নে হঠাৎ এমন একটি অবস্থান গ্রহণ করতে শুরু করল যেন ভারতের রাজ্যগুলি সব এক একটি স্বাধীন দেশ। তারা এখন বলতে শুরু করল যে যেহেতু নদী-তীরস্থ দেশ নয় তাই রাজস্থান ও হারিয়ানার এই জলে কোন অধিকার নেই। এতে উগ্রপন্থীদেরই লাভ হয়েছিল।

আর্থনিক ও উদ্ভূত জল সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা করতে ভারত সরকারের ব্যর্থতাও যারা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিজ্ঞানভাবাদকে শত্রুশালী করতে তৎপর, তাদের আরও সুযোগ করে দিয়েছিল।

৫। রাজনৈতিক কমতার প্রশ্নে পাল্লাবে আসল বিরোধ কংগ্রেস এবং আকালি দলের মধ্যে।

সংকীর্ণ দলীয়, নির্বাচন কেন্দ্রিক, এমন কি গোষ্ঠীগত স্বার্থে, আকালিদের দুর্বল করে দিতে কংগ্রেস সত্তা ভিত্তানওয়ালাকে রাজনীতিতে নিয়ে এসেছিল। আকালি মন্থনভাষ্যকে বেকারবার ফেলতে সিল্লান ছিল সেই খুলসা দলের পক্ষন

পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হওয়ার পরেও কংগ্রেস তাকে ব্যবহার করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। আবার আকালি নেতৃত্বও ভিত্তানওয়ালাকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে মনস্থ করছিল। পাবিত্র আকাল তখত দখল করতে এবং স্বর্ণ মন্দিরকে একটি সম্পদ দূর্গে পরিণত করতে, যেখান থেকে সংগ্রাসবাদীরা তাদের কাজ চালাচ্ছিল, তাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আসলে ভিত্তানওয়ালাই কংগ্রেস ও আকালি উভয় দলকেই ব্যবহার করেছিলেন।

অন্যান্য বৃজোয়া দলের ভূমিকাও খুব পরিচ্ছন্ন ছিল না। যখন রাজীব গান্ধী ঘোষণা করলেন যে ভিত্তানওয়ালা হলেন শুধুমাত্র একজন ধর্মীয় নেতা, এস, এম, যোশী এবং গোয়ের মত প্রভাবশালী বিরোধী নেতারা স্বর্ণ মন্দির চত্বরে কোন অস্ত্র মজুত নেই বলে তাকে মিথ্যা সার্টিফিকেট দিলেন। সমস্ত বৃজোয়া দলগুলিই তাদের পাঞ্জাব ও হারিয়ানা ইউনিটগুলিকে চণ্ডীগড় প্রভৃতি প্রশ্রে পরস্পর বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করতে অনুমতি দিলেন। তারা ভোট ব্যাংকের ওপর নজর রেখেই এমন কাজ করলেন কিন্তু তাদের এই সুবিধাবাদ পাঞ্জাব সমস্যাকে আরও শোচনীয় করে তুলতে সাহায্য করল।

রাজীব—লন্সদোয়াল চুক্তি, অত্যন্ত তাড়াহুড়ে করে, সমস্ত ফলাফল বিচার না করেই স্বাক্ষরিত হ'ল। তা সত্ত্বেও যদি এই চুক্তির সপক্ষে দল নিরপেক্ষ, আন্তরিক সঠিক প্রচার চালান হ'ত তাহলে এটি কার্যকরী করা সম্ভব হ'ত। এর পরিবর্তে একমাত্র বামপন্থীরা ছাড়া আর সকলেই তাদের নিজেদের নির্বাচনী স্বার্থে এই চুক্তিকে ব্যাখ্যা করতে লাগল। তার ফল আজ সকলেই দেখতে পাচ্ছেন।

৬। হিন্দু শিবসেনা এবং অন্যান্য হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি এই পাঞ্জাব সমস্যা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। তারা খালিস্তানী উগ্রপন্থীদের দাঙ্গা করে এবং পাঞ্জাবে ও পাঞ্জাবের বাইরে শিখদের ওপর এর প্রতিশোধ নেবার কথা প্রচার করে। ফল হয় উগ্রপন্থীরা ঠিক যা চায় তাই—হিন্দু-শিখ উত্তেজনা, এমন কি দাঙ্গা এবং উভয় সম্প্রদায়ের স্থানান্তরে গমন। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যদি একদিন প্রকাশ পায় যে শিখ উগ্রপন্থী সংগঠনগুলি ও হিন্দু শিব সেনার মত সংগঠনগুলি একই পৃষ্ঠপোষকের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। যাই হোক, বস্তুগতভাবে তারা একই ভূমিকা পালন করে থাকে। তারা এখন

দেশপ্রোহী স্বেচ্ছাসেবক সমিতির করে বিপুল চালিত হবার উর্বর জমি তৈরী করেছে।

৮। বাণীলা সরকারের একটি ইতিবাচক ও সেই সংগে একটি নেতিবাচক দিক আছে। কোন জাতিবৈষমী উদ্দেশ্যে ধর্মস্থানগুলিকে ব্যবহার করতে না দেওয়ার এক দৃঢ় অবস্থান এই সরকার গ্রহণ করেছে। জে, এফ, রিবার্ডের নেতৃত্বে পাজাব পুলিশ ও আখা সামরিক বাহিনীরও উন্নতি হয়েছে। তারা এখন সম্মানবাদীদের বিরুদ্ধে আগের চেয়ে কার্যকর ভূমিকা নিতে সমর্থ হচ্ছে। আবার এর নেতিবাচক বেশ কয়েকটি দিকও রয়েছে। এই সরকার এখনও নিজেকে একটি ধর্মপ্রতীকী সরকার বলে প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট। এদের উদ্দেশ্য হ'ল এইভাবে যারা উগ্রপন্থীদের প্রভাবে রয়েছে এবং বাদলের মত যারা তাদের সংগে হাত মিলিয়েছে তাদের আবার ফিরিয়ে আনা। বাস্তবে কিন্তু এর ফলে চাকুরী ইত্যাদির ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ আরও বেড়ে যাচ্ছে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কোনরকমেই সম্বলিত করা যাচ্ছে না। এতে উগ্রপন্থীদেরই সুবিধা হচ্ছে। পাজাব সরকার, পাজাব পুলিশ এবং পাজাব প্রশাসনে এইসব উগ্রপন্থীদের এখনও অনেক বন্ধু আছে। পাজাব পুলিশ বা কেন্দ্রীয় রিজার্ভ বাহিনী কেউই সাম্প্রদায়িক মনোভাব মুক্ত নয়।

উগ্রপন্থীরা যখন তাদের হত্যাকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে তখনও রাজীব গান্ধী তাদের সংগে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে যাচ্ছেন। একথা অনেকেই বিশ্বাস করেন যে বাদল আর জোহরাকে তাদের মতামত নিয়েই প্রেরণ করা হয়েছে এবং মধ্যস্থ ব্যক্তিদের মাধ্যমে জেলের মধ্যেই তাদের সংগে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এর ফল বিপরীত হতে পারে। 'স্বাধীনতালাভের অভিজ্ঞতা থেকে যে শিক্ষা পাওয়া গেছে তা' উপেক্ষা করা উচিত নয়।

৯। সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির পারস্পরিক আন্তরিক স্বপ্নসংগঠন—

ক) সম্মানবাদীদের বিরুদ্ধে আরও জোরদার কার্যকর ব্যবস্থা দাবী করা এবং সেই উদ্দেশ্যে পুলিশ ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনুসন্ধান ব্যবস্থা চালু রাখা ;

খ) যে কোন মূল্যে হিন্দু-লিখ ঐক্য রক্ষার জন্য জনগণকে সমবেত

ঘ) খালিস্তান ছোগানের পেছনে যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত কাজ করছে তার স্বরূপ উন্মোচিত করার জন্য জোরদার প্রচার চালানো এবং দেখানো যে এই ছোগান শুধু জাতীয়তা বিরোধী নয়, শিখ বিরোধীও বটে।

ঙ) হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী ছোগানের বিরুদ্ধেও একই রকম জোরদার প্রচার চালানো। পাজাবের বাইরে শিখদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

চ) সবরকমের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ সংগঠিত করা।

ছ) ধর্ম ও রাজনীতি, ধর্ম ও ভাষা এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক করার জন্য অস্বাভাবিক প্রচার চালিয়ে যাওয়া। পাজাবী ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য পাজাবী হিন্দুদের কাছে আবেদন জানানো।

জ) জাতীয় স্বার্থের দিকে নজর রেখে আর্থিক ও উন্নত জলের সমস্যার সমাধান করা। যদিও এর ফলে সম্প্রদায় বা বিচ্ছিন্নতাবাদের অবসান হবে না তবে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সহজতর হবে। এই দায়িত্বকে অন্য কাজের তুলনায় বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। সুদূর প্রসারী জাতীয় স্বার্থের ওপরে কিছু ভাবগুরু লাতের প্রশ্নকে গুরুত্ব দেওয়ার যে সাধারণ প্রবণতা বিদ্যমান আছে তার বিরুদ্ধে জোরদার প্রচার চালিয়ে এই লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে।

ঝ) নানা প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে প্রতিদিনকার দাবী নিয়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। এই কথাটিও প্রচার করতে হবে যে খালিস্তান বা হিন্দু রাষ্ট্র নয়, একমাত্র সমাজতন্ত্রই পারে বেকার সমস্যা ইত্যাদির সমাধান করতে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বেশ কিছু কাজ করা হলেও এখনও অনেক কিছু করার প্রয়োজন রয়েছে।

৩০.৮.৮৬

আমাদের বিশেষ অনুরোধে কমরেড সত্য পাল ডাঙ পাজাবে সম্পর্কে এই লেখাটি পাঠিয়েছেন। মূল লেখার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হ'ল।

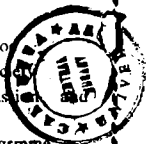
SOVIET DESH BOOKLETS IN BENGALI

Booklets already published

1. 27th CPSU Congress : Reports and Resolutions
2. Commemorating the Centenary of the Chicago Events
3. The Theory That Transforms the World
4. Employment Problem : How Is It Viewed in the USSR ?
5. USSR : In the World Economic Structure

To be Published Shortly

1. Lenin : On US Imperialism
2. USSR : 12th Five-Year Plan Period
3. Peoples Well-Being in Socialist Society
4. 27th CPSU Congress : Discussion Decisions
5. On the New Edition of CPSU Programme.



Interested persons can write to below noted

Address :

SOVIET DESH OFFICE

Booklet Section,

18, Pramathes Barua Sarani

Calcutta-700 019